সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১৩২৬

বৈশাখ—আশ্বিন

বার্ষিক মূল্য—তিন টাকা ছয় আনা
'সবুজ পত্র' কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কলিকাতা,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট
শ্রীসারদাপ্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—আশ্বিন)

১৩২৬

গান।

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥
তাই ত আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে ॥

ওগো আমার নিত্যনূতন, দাঁড়াও হেসে,
চল্‌ব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিব্‌ল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে,
শূন্যে আমার উঠ্‌ল তারা সারে সারে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৪ বৈশাখ, ১৩২৬

রবীন্দ্রনাথের পত্র।

ওঁ

শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী

কল্যাণীয়েষু

আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েচে যে, চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি সংসারের ছোট ছোট ঋণগুলোও প্রতিদিন জমে উঠ্‌চে—পরজন্মে এই পাপের যদি দণ্ড থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমি দৈনিক সংবাদপত্রের এডিটর হব। সে আশঙ্কার কথা মনে উদয় হলেই নির্ব্বাণমুক্তির জন্যে উঠে পড়ে লাগ্‌তে ইচ্ছা হয়—কিন্তু তার চেয়ে সহজ চিঠির জবাব দেওয়া। সবুজপত্রকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্ব্বে তোমার ত নিস্কৃতি নেই—প্রবীনতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী হাওয়াতেও মেরে ফেলতে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর সবুজপত্রের দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির-উৎস ধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক্। প্রাণের বৈচিত্র্য আপন বিদ্রোহের সবুজ জয়পতাকাটি শুভ্র একাকারত্বের বুকের মধ্যে গেড়ে দিয়ে অমর হয়ে দাঁড়াক। আমার এই খোলা জানালাটার কাছে বিশ্রাম শয্যায় শুয়ে আমি আমার

ঐ সামনের মাঠের দিকে অনেকটা. সময় কাটাই। ওখানে দেখতে পাই মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে, শাস্ত্র-উপদেশে-ভরা অতি পুরাতন পুঁথির পাতার মত। অনেক দিন বৃষ্টি নেই রৌদ্রও প্রখর—তা'তে শুষ্কতা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রতাপ যে কতবড় তা এই দূরবিস্তৃত শূন্যতার একটানা বিস্তার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটিমাত্র তালগাছ এতবড় সনাতন নির্জ্জীবতাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে আলোকের সঙ্গে নিত্যই আপনার পত্রব্যবহার চালাচ্চে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই কিন্তু ঐ একটু খানি মাত্র জায়গায় বাণীর উৎস কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাণ্ড দৈত্যের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি তুড়ি মারে তাহলে সে যেমন হয় এও তেমনি। যে অমর তার ত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না, মৃত্যুই আপনার আয়তনের প্রসার নিয়ে বড়াই করে। তোমাদের সবুজপত্র ঐ তালগাছটিরই মত দিগন্তবিস্তৃত বার্দ্ধক্যের মরুদরবারের মাঝখানে একলা দাঁড়াক্।

জরাসন্ধের দুর্গ ভয়ানক দুর্গ—সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালার আর অন্ত নেই। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর কড়া পাহারার মধ্যেও পাণ্ডব এসে প্রবেশ করে, তার সৈন্য নেই সামন্ত নেই; সেই নিরস্ত্র তারুণ্য কত সহজে কত অল্প সময়ে জরাসন্ধকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে তার কারাগারের দ্বার ভেঙে দেয়; সেখানে বন্দী ক্ষত্রিয়দের মুক্তিদান করে। আমাদের দেশেও জরাসন্ধের দুর্গের মধ্যে দেশের ক্ষত্রিয়েরাই বন্দী রয়েছে,

যারা ক্ষত থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরান্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের জয়ধ্বজা বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অশ্বমেধের ঘোড়ার রক্ষক হবে তা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ব্রত নিয়েচ তোমরা; তোমাদের সংখ্যা বেশি নয়, তোমাদের সমাদর কেউ করবে না, তোমাদের গাল দেবে, কিন্তু জয়ী হবে তোমরাই—জরার জয়, মৃত্যুর জয় কখনই হবে না।

তোমাদের সবুজপত্রের দরবারে আমাকে তোমরা আমন্ত্রণ করেচ। তোমাদের সাধনা যখন সবুজ পত্রের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে নি তখনো এই সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, বহন করেছি। তারুণ্য নূতন নূতন কালে, নূতন নূতন রূপে, নূতন নূতন পুষ্প-পল্লবে নিজেকে বারবার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয় বট যে অক্ষয় তার কারণ তার মজ্জার মধ্যে চিরতারুণ্যের রসধারা বইচে। তাই প্রতি বসন্তেই সে বারেবারে নূতন বেশে নবযুবক হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও জীর্ণ বটের মজ্জার মধ্যে যদি যৌবনের রস একেবারেই না থাকৃত তাহলে এর দ্বারাই দেশের চিতাকাষ্ঠই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি, মাঝে মাঝে যৌবন একটা আকস্মিক বিদ্রোহের মত কোথা হতে আবির্ভূত হয়ে কঠিন জরার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। আমাদের সময়েও সে নির্ভয়ে এসেছে, নূতন কথা বলেচে, মার খেয়েছে, পুরাতন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাকে একঘরে করে দিয়েচে। সে দিন আমি সেই ঝোড়ো দলের মধ্যেই ছিলুম। দল যে বাহিরে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু অন্তরে তার বেগ ছিল। চণ্ডীমণ্ডপ নিবাসীরা এখনো সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করে নি। আমি

তাদের ক্ষমার দাবীও করি নে, কেননা আমি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডীমণ্ডপের শান্তি ভঙ্গ করেছি, সেখানকার বৈকালিক নিদ্রার যতদূর ব্যাঘাত করবার তা করতে ত্রুটি করি নি। অর্থাৎ বিকালের নিস্তব্ধ তন্দ্রালোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেষ্টা করেচি।

আমাদের কালের সেই চাঞ্চল্য সাধনাই তোমাদের কালের নূতন পাতায় বিকশিত হয়ে নীলাকাশের উপুড়-পেয়ালা থেকে সূর্য্যালোকের তেজোরস পান করবার চেষ্টা করচে। সেই তেজ তোমাদের ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়ে দেশের প্রাণ-ভাণ্ডারকে পুনঃ পুনঃ পূর্ণ করবে।

কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলে গেছ, ইতিমধ্যে আমার পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবক মহারাজের দ্বারের প্রহরী এখন শিশু-মহারাজের সভায় সখার পদ পেয়েচি। অর্থাৎ নবজন্মের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি—মৃত্যুর পূর্ব্বে এই চৌকাঠটি পেরোনোই বাকি আছে। এই যে এগোবার দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছু ডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বর দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মরব না। সেই জন্যে যৌবন-মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আমার আয়ু চিরশ্যামল শিশু দিগন্তের দিকে নেমেচে। আমার জীবনের শেষ কাজ এবং শেষ আনন্দ ঐখানেই রেখে যাবার জন্যে আমার ডাক পড়েচে। যৌবনের জয়যাত্রায় আমার জীবনের অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিন্দার কাছে হার মানি নি, আমি অশান্তির অভিঘাতের ভয়ে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যাই নি। কিন্তু এখন দিন শেষে আমার মনিবের হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় হয়েচে। আমার মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুরস্কারও পাচ্চি। তাঁর কাজে শাস্তি অল্প, শান্তি যথেষ্ট,

কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেই জন্যে এখান থেকে আমি তোমাদের জয়কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের অভিযানে চল্‌ব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে যারা যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাবী যৌবন নির্ম্মল হবে, নির্ভয় হবে, জড়তা, স্বার্থ বা অনাদরের প্রবলতা বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করবে এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও সিদ্ধ হয় তাহলেই আমার জীবন চরিতার্থ হবে। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩২৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খোলা চিঠি।
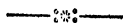
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু।

আপনার চিঠি ঠিক সেই সময়ে আমার হাতে এসেছে, যখন আমার অবসন্ন মনকে চাগিয়ে তোলবার জন্য, আপনার মুখের উৎসাহের বাণী আমার মনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আপনি সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন যে, আমি কিছুদিন থেকে আমার লেখার হাত ক্রমে গুটিয়ে নিচ্ছি। লেখবার প্রবৃত্তি সকলের পক্ষে অদম্য ত নয়ই—স্বাভাবিকও নয়। অতএব অবলীলাক্রমে লেখা সকলের সাধ্য নয়। আমাদের মত লেখকদের পক্ষে যা স্বাভাবিক সে হচ্ছে লেখবার অপ্রবৃত্তি, এবং এই আসুরিক অপ্রবৃত্তির সঙ্গে যোঝাযুঝি করে' তার উপর জয়ী হওয়া যে কত কঠিন, কত আয়াসসাধ্য, তা লেখকমাত্রেরই অন্তর্যামী জানেন। তার উপর দুঃখের বিষয় এই যে, আর পাঁচ রকম হাতের কাজের মত, লেখার অভ্যাসটা কালক্রমে দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় না। একবার হাত তৈরি হয়ে গেলে, বাজনা লোকে অন্যমনস্ক হয়েও বাজাতে পারে, কিন্তু লেখা, মন না দিয়ে, শুধু হাত দিয়ে কেউই লিখতে পারে না, সম্ভবত এক সংবাদ পত্রের সম্পাদক ছাড়া।

আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরে, আমার প্রকৃতির এই ধাতুগত অপ্রবৃত্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করে আসছি, ফলে আমার অন্তরাত্মা বর্ত্তমানে, একসঙ্গে শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আমার দেহ ও মন, তাদের বিশ্রামের হাল-বকেয়া সমস্ত পাওনা, একযোগে সুদসুদ্ধ আদায় করে নেবার চেষ্টায় আছে। আলস্য যখন দেহকে এবং অবসাদ যখন মনকে একসঙ্গে পেয়ে বসে, তখন লেখক-মাত্রেরই পক্ষে, অন্তত কিছুদিনের জন্য সাহিত্যের কারখানা থেকে ছুটি নেওয়া দরকার। তাতে শুধু লেখকের নয়, সাহিত্যেরও উপকার হয়। কেননা মনের এ অবস্থায় আমাদের সকল লেখাপড়া একান্ত নিরর্থক, আদ্যোপান্ত বৃথা বলে মনে হয়।

"Of making many books there is no end and much study is a weariness to the flesh"—বাইবেলের সেই অতি পুরোণো কথা এ বিষয়ের শেষকথা বলে বিশ্বাস করতে সহজেই ইচ্ছা যায়।

আপনার চিঠি যখন আমার কাছে এসে পৌঁছয়, তখন আমি মনে মনে Vanity of vanities all is vanity—এই মন্ত্র জপ করছিলুম; কেননা এ মন্ত্র মনের সনাতন ঔষধ, হৃদয়ের সকল ক্ষতের অব্যর্থ মলম। এ সংসারে আমাদের কাছে যা সব চেয়ে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে মানুষের লাঞ্ছনা—একদিকে প্রকৃতির হাতে, আর একদিকে মানুষের হাতে। মানুষ যেমন অশেষ দুঃখ নিজে পায়, তেমনি অশেষ দুঃখ, পরকে দেয়। মানুষের এই দুঃখ আর এই পাপকেই যদি সার সত্য বলে স্বীকার করতে হয়, তাহলে ভেবে দেখুন ত, মনের অবস্থা কতটা আরামের হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় "জীবন মিথ্যা

আর মৃত্যুই সত্য"—এই বিশ্বাস মানুষের মনে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা এনে দেয়। জীবনের বিরাট ট্রাজেডিকে farce স্বরূপে দেখতে শিখলেই, আমরা যথার্থ মায়ামুক্ত হই। তবে মুস্কিল এই যে, এ সব কথা যত সহজে মুখে আনা যায়, তত সহজে মনে বসানো যায় না। দুনিয়াকে ফাঁকি বলে, আমরা কেউ আর নিজের দুঃখকে ফাঁকি দিতে পারি নে।

সে যাই হোক, একথা নিশ্চিত যে, এ রকম পীড়িত মনোভাব যে-কথার পিছনে আছে, সে কথা নিছক নৈরাশ্যের উক্তি হতে বাধ্য; সুতরাং সে কথার মূল্য বিকারের প্রলাপের চাইতে বড় বেশি নয়। তা ছাড়া মনের কৃষ্ণপক্ষ অপরকে দেখাবার মত বস্তুও নয়। নিজের মনের মেঘের ছায়া সমাজের মনের উপর ফেলবার কোনও সার্থকতাও নেই; বিশেষত এদেশে। এমনিই আমরা কর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞানসম্বন্ধে যথেষ্ট নিরুদ্যম যথেষ্ট নিশ্চেষ্ট। জীবনের উপর আমাদের শ্রদ্ধা নেই, শ্রদ্ধা ত দূরের কথা বিশ্বাস পর্য্যন্ত নেই, এবং তার কারণ আমাদের নিজের উপর নিজের ভক্তি নেই, আস্থা নেই। সুতরাং আমাদের জাতীয় মনের মজ্জাগত অবসাদকে প্রশ্রয় দেবার অধিকার আমাদের কারও নেই। "ততঃ কিম্" ভর্তৃহরির এই প্রশ্ন সেই জাতিই করতে পারে, যে জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের কৃতিত্বের বলে জয়যুক্ত হয়েছে। এ প্রশ্ন আজকের দিনে জিজ্ঞাসা না করা ইউরোপের পক্ষে যেমন ছেলেমি, জিজ্ঞাসা করা আমাদের পক্ষে তেমনি জ্যাঠামি। মানসিক রক্তহীনতাকে আমি কখনই আধ্যাত্মিকতা বলে ভুল করিনি। আধ্যাত্মিকতা অর্থে আমি বুঝি আমাদের জীবাত্মাকে, আমাদের জ্ঞানের বলে কর্ম্মের বলে ভক্তির বলে শতদলে ফুটিয়ে তোলা, বুঁজিয়ে দেওয়া নয়; আমাদের প্রচ্ছন্ন আত্মশক্তিকে ব্যক্ত করে

ভোলা, চেপে দেওয়া নয়। আত্মশক্তিকে অস্বীকার করাই ত মানুষের সকল দুর্গতির মূল। ভগবান মানুষকে একমাত্র ঐ শক্তিই দান করেছেন, ভগবানের দানকে অগ্রাহ্য করে, কেউ আর মানুষ হতে পারে না। অতএব ঔদাস্যের ও নৈরাশ্যের বাণী প্রচার করতে আমি কখনই ব্রতী হব না। "Vanity of vanities all is vanity" এ কথার বিরুদ্ধে আমাদের সকল মনপ্রাণ নিত্য প্রতিবাদ করে।

আর এক কথা। আমার বিশ্বাস দেশের লোককে আশার কথা, আনন্দের কথা শোনানই এ যুগের লেখকদের পক্ষে কর্ত্তব্য, নৈরাশ্যের কথা, ঔদাস্যের কথা নয়। আনন্দই হচ্ছে একমাত্র প্রকাশ করবার, দশদিক ছড়িয়ে দেবার, দশের মনে চারিয়ে দেবার বস্তু; অপর পক্ষে বেদনা দশের মন থেকে ছাড়িয়ে, দশদিক থেকে কুড়িয়ে নিজের অন্তরে সঞ্চিত ও ঘনীভূত করাই সকলের পক্ষে না হোক, অন্তত লেখকদের পক্ষে কর্ত্তব্য; কেননা যে পরের ব্যথায় ব্যথী নয়, সে পরকে কখন আনন্দ দিতে পারে না। নব্য-আলঙ্কারিকদের আদি-গুরু আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলে গিয়েছেন যে, ক্রৌঞ্চমিথুন বধে বাল্মীকির মনের শোক যদি তাঁর মুখে শ্লোকের আকার ধারণ না করত, অর্থাৎ তিনি যদি নিজের অন্তরের বেদনা পরের আনন্দের সামগ্রী করে তুলতে না পারতেন, তাহলে তিনি মানব-সমাজে শাশ্বতী সমা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না।

এর থেকে ধরে নিচ্ছি মানুষের দুঃখ দূর করবার শক্তি যখন আমাদের নেই, তখন নিজের অন্তরের বেদনা, অপরের আনন্দের সামগ্রী করে তোলাই সকলের জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। কে বলতে পারে যে, কবির সৃষ্টি প্রকৃতির সৃষ্টির চাইতে কম সত্য। এ

ব্রত কিন্তু এদেশে উদ্‌যাপন করবার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই আছে। সুতরাং আশা করি আপনার মুখ থেকে আমরা নিত্য নব আনন্দের বাণী শুনতে পাব।

আমরা চেষ্টাচরিত্তির করে বড়জোর আশার বাণী প্রচার করতে পারি, তার বেশি কিছু করতে পারি নে, কেননা আনন্দ সৃষ্টি করবার শক্তি ভগবান আমাদের দেন নি। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

২০ বৈশাখ, ১৩২৬

সম্পাদকের নিবেদন।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি যে, জনৈক অতি কৌতূহলী এবং সেই সঙ্গে অতি কৌশলী লোক কোন এক রোগের সুযোগে মিছে করে নিজের মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেন, তাঁর মৃত্যুতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধদের মধ্যে "কে কাঁদে আর কে বলে যাকগে," বেঁচে থাক্‌তেই সেটা জেনে যাবার জন্য।

দেশময় যখন "সবুজ পত্রে"র মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে গিয়েছে তখন ও পত্রের আবার সাক্ষাৎ পেলে, লোকের মনে সহজেই এ সন্দেহ হতে পারে যে আমি ঐরূপ কোনও মতলবে উক্তরূপ কৌশল অবলম্বন করেছি।

"সবুজ পত্র" বন্ধ করবার প্রস্তাবের ভিতর অবশ্য কোনরূপ চাপা উদ্দেশ্য ছিল না। আমি একজন সাহিত্যিক-পলিটিসিয়ান নই; সুতরাং আমার কথার ভিতর কোনরূপ গূঢ় মতলব থাকবার কথা নয়, কেন না তা থাকলে সে কথা সাহিত্য হয় না। আর আমি পারি না পারি সাহিত্যই রচনা করতে চেষ্টা করি। তবে সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে "সবুজ পত্রে"র মৃত্যুর জনরবের প্রসাদে ও-পত্র সম্বন্ধে লোকমতের কিঞ্চিৎ আভাস পেয়েছি। উপরোক্ত মতলবী ব্যক্তি তাঁর চতুরতার ফলে কি জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব। সম্ভবত সে জ্ঞান তাঁর তেমন মুখরোচক হয় নি। এ

সত্য সকলে না জানলেও সকলের জানা উচিত যে আসলে ভুল ধারণার উপরেই সকলে সুখে জীবন ধারণ করে। সে যাইহোক "সবুজ-পত্রে"র মৃত্যুসংবাদে বাঙলার একদল লোক দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, বিশেষত যখন "ও বালাই গেছে বাঁচা গেছে" এমন কথা কোনও দৈনিক সাপ্তাহিক, কিম্বা মাসিক পত্রে অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। "সবুজ পত্রে"র মতামতে যাঁরা সায় দিতে পারেন না, দেখতে পাচ্ছি, তাঁরাও এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নন যে, ও-পত্রের একটা নিজস্ব চেহারা আছে, এবং সেই সঙ্গে তার প্রাণও আছে। কেন না যার প্রাণ নেই অর্থাৎ যা মৃত, তার আর অকাল মৃত্যু কি করে ঘটতে পারে।

(২)

যখন দেশের অন্তত জনকতক লেখকও চান যে "সবুজপত্র" "বেঁচে থাক্ চিরজীবি হয়ে," তখন যতদিন পারি ও-পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছা হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তি যে অতঃপর সংকল্পে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছি, তার কারণ অনেকের মতে আপাতত ও-পত্রের প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্যও বটে।

কেন কর্ত্তব্য সে কথাটা একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিজয়ী জর্ম্মাণ সেনা যখন প্যারিস নগরীকে ঘিরে বসেন, তখন প্যারিসের আবালবৃদ্ধ-

বনিতা সকলে একবাক্যে বলে উঠেছিল, "il faut etre là"—অর্থাৎ "এখানে আমাদের থাকা চাই"। অথচ কেন যে থাকা চাই, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে শতকরা নিরনব্বই জন তার কোনও উত্তর দিতে পারত না। কেননা তাদের দ্বারা প্যারিস রক্ষার কোনরূপ সাহায্য হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। অথচ এক প্রাণীও প্যারিস ত্যাগ করলে না, এমন কি অতি নিরীহ স্থূলকায় মুদি-পশারীরাও নয়। কারণ এ বিষয়ে প্যারিসের কোনও নাগরিকের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে, "il faut etre là"—নাগরিক-দের পক্ষে স্বেচ্ছায় প্যারিসে অবরুদ্ধ হয়ে থাকাটা ফলের দিক থেকে দেখলে একটা মস্ত অকাজ কিন্তু আত্মার দিক থেকে দেখলে যে একটা বড় কাজ, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। যখন একটা বড় গোছের দায় জাতির ঘাড়ে এসে পড়ে তখন নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তার ভারবহন করবার অধিকার যে সকলেরই আছে, এই মহা সত্যের সন্ধান প্যারিসিয়ান মাত্রেই নিজ অন্তরে লাভ করেছিল, এর প্রমাণের জন্য তারা কোনও যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে নি।

আজকের দিনেও আমরাও একটা যুগসন্ধির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি, সুতরাং যাঁদের স্বদেশের প্রতি স্বজাতির প্রতি মমতা আছে, তাঁদের প্রতিজনের পক্ষেই যে যেখানে আছেন, তাঁর পক্ষে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকা কর্ত্তব্য, কেননা নানারকম ভীষণ সমস্যা আমাদের চারদিক থেকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। সংক্ষেপে "il faut etre là" যদিচ আমরা ঠিক জানিনে যে এইরূপ দাঁড়িয়ে থাকবার কোনও সার্থকতা আছে, কি নেই।

(৩)

বর্ত্তমান ভারতে যে সমস্যাটা সব চাইতে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে আমাদের পলিটিকাল সমস্যা পলিটিকাল হিসাবে আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নগণ্য জাত, এ হীনতা আমরা কেউ প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। ফলে এই অসন্তোষ দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর শুধু বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে এসেছে। তার পর এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব্বে যা ছিল অসন্তোষ তা এখন দাঁড়িয়েছে অশান্তিতে। এ অশান্তির ভোগ পৃথিবীর সকল দেশের রাজা প্রজাকে কিছুদিন ধরে কিছু না কিছু ভুগতেই হবে, তার জন্য কোন পক্ষেরই হা হুতাশ করবার প্রয়োজন নেই। এ অশান্তির মূলে আছে বিশ্বমানবের সেই মুক্তির আশা, সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সেই মুক্তির প্রয়াস, এক কথায় মানুষের সেই আত্মজ্ঞান, যা এই যুদ্ধের ক্রোড়ে বৃদ্ধিলাভ করেছে। মানুষ তার মনশ্চক্ষে আজ যে সভ্যতার সাক্ষাৎ পেয়েছে, কাল হোক্ পরশু হোক্ মানব সমাজে সে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবেই হবে, কেউ তা চিরদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হতে পারে যে আমার এ বিশ্বাস ভুল। তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা ভুল ধারণার উপরেই সকলে যে জীবন ধারণ করে, আমার এ মত ত আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছি।

এই নব আশায় আমাদের বুক বাঁধতে হবে, এবং এই নব-সভ্যতা গড়বার দায়িত্ব আর পাঁচজনের মত আমাদেরও ঘাড় পেতে নিতে হবে; এই কথাটা স্মরণ রেখো যে, এই মুক্তির পথে অশেষ বাধা, অসংখ্য বিঘ্ন আছে। কোন বিষয়ে বাধা পেলে হতাশ হয়ে পড়াটা

আমাদের জাতিগত স্বভাব, আমরা যদি সত্য সত্যই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চাই, তাহলে আমাদের চিরাগত স্বভাবকে পদে পদে অতিক্রম করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এ সত্য আমরা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ কোনও কাম্যবস্তু একমাত্র কামনার বলে লাভ করতে পারে না, যদি না তার পিছনে সাধনার বল থাকে,—আর সাধনার অর্থ হচ্ছে বাধা অতিক্রম করবার ইচ্ছা ও জ্ঞান শিক্ষা ও শক্তি। সিদ্ধিলাভের পক্ষে মানুষের দ্বিবিধ বাধা আছে, এক বাইরের আর ভিতরের। এই বাইরের বাধা গুলিই বেশি করে আমাদের চোখে পড়ে, কেননা চর্ম্মচক্ষুর সম্পর্কই হচ্ছে বহির্জগতের সঙ্গে। অথচ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে নিজের ভিতরকার বাধাই হচ্ছে মানুষের সব চাইতে বড় বাধা, এবং এই বাধা অতিক্রম করতে না পারলে মুক্তিলাভ করতে কেউ পারে না, কোন ব্যক্তিও নয় কোন জাতিও নয়। আমাদের নিজের প্রকৃতিই যে আসলে আমাদের দীন করে রাখে, এ সত্য সকলের নিকট প্রত্যক্ষ নয়, তারপর যাঁর কাছে প্রত্যক্ষ তাঁর কাছেও সে সত্য প্রিয় নয়। নিজের প্রকৃতির উপর জয়লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, এ যুদ্ধে হৃদয়াবেগের সাহায্য পাওয়া যায় না, অপর পক্ষে বাহিরের বাধা দূর করতে যখন আমরা অগ্রসর হই, তখন রোষ ও ক্ষোভ আবেগ ও আক্রোশ প্রভৃতি মনোবৃত্তি আমাদের প্রবল সহায় হয়। এদের সহায়তায় অবশ্য আমরা সব সময়ে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারি নে। এ জাতীয় মনোবৃত্তি মানুষকে উত্তেজিত করে কিন্তু তার পথ নির্দ্দেশ করতে পারে না, এরা যে জন্মান্ধ। সুতরাং আমরা

যদি জীবনে মুক্তপুরুষ হতে চাই তাহলে আমাদের মনকে মুক্ত করতে হবে, জ্ঞানকে আয়ত্ব করতে হবে। যে জাতি-গঠনের কথায় দেশ আজ মুখরিত, তার গোড়ার কথা এবং শেষ কথাও হচ্ছে স্বজাতীর মন গড়ে তোলা।

(৪)

বাইরের অবস্থার যে বদল দরকার এ কথা আমি অস্বীকার করিনে, কেননা আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য নই। প্রতিকূল অবস্থার ভিতর মানুষ হয়ে ওঠা যে কতদূর কঠিন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। ম্যালেরিয়ার ভিতর বাস করে' অনশনক্লিষ্ট লোকে কেবল মনের জোরে যে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারে, মনের এতাদৃশ অলৌকিক শক্তির উপর আমার কোন প্রকার ভরসা নেই। বাইরের অবস্থা যত অনুকূল হবে, দেহ ও মনে আমরা মানুষ হয়ে ওঠবার যে তত সুযোগ পাব, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমাদের দুরবস্থা দূর করবার জন্য ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা যে দেশের মহা উপকার সাধন করছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, কেবল মাত্র কল কারখানার সাহায্যে আমরা যথার্থ মুক্তিলাভ করতে পারব না; কল তা—সে বসনেরই হোক আর শাসনেরই হোক, মানুষ গড়তে পারে না, কেননা ঘটনা এই যে মানুষেই কল গড়ে। বাহিরের অবস্থা যতই অনুকূল হোক না কেন, সে অবস্থা মানুষকে তার মনুষ্যত্ব লাভের

সুযোগ দেয় মাত্র, তার বেশি কিছু করতে পারে না। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা আর না করা, করতে পারা আর না পারা, নির্ভর করে তার মন আর চরিত্রের প্রবৃত্তি ও শক্তির উপর।

মানুষের মন যে তার দেহের চাইতে বড়, তার আত্মশক্তিই যে সব চাইতে বড় শক্তি, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের যথার্থ কাম্যবস্তু হচ্ছে মনের স্বরাজ্য, এবং এই স্বরাজ্য লাভের প্রধান সহায় হচ্ছে সাহিত্য। বাঙালীর মন বাঙলা ভাষার ভিতর দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে, এই বিশ্বাস এই আশাই হচ্ছে "সবুজ পত্রে"র আন্তরিক কথা। এ কথা শুনে অনেকে বলতে পারেন—"সবুজ-পত্র' ত কিছুই গড়ে না, শুধু অনেক জিনিষ ভাঙ্গে। এর উত্তর যে মনের দেশেও কারাগারের দেয়াল ভাঙ্গার নামই গড়া।

(৫)

পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছে, যারা যে কাজ করতে পারে তাকে ছোঁয় না, আর যে কাজ করতে পারে না তাতেই গিয়ে হাত লাগায়। এইরূপ অনধিকার চর্চ্চার ফলে মানুষের ঢের চেষ্টা বিফল হয়, ঢের কাজ বিগড়ে যায়। আশা করি এ রকম ভুল আমরা করে বসব না। ভারতবর্ষকে এ যুগে বাঙালী যা দিতে পারবে, এবং বিশেষ করে বাঙলাই তা দিতে পারবে,—সে হচ্ছে তার হাতের কাজ নয় মনের কাজ। স্বদেশকে আমাদের প্রধান দানই হবে সাহিত্যদান। এ দান যে কি আকার ধারণ করবে তার পরিচয় নেওয়া এবং সেই

সঙ্গে তার মূল্য নির্দ্ধারণ করাটাও আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ পরের কথায় আমরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতে উদ্যত হতে পারি, এবং তাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি ত হবেই এবং ভারতবর্ষের কোনও লাভ হবে না। বৈষ্ণবকূল ত্যাগ করলেই যে তাঁতিকূল লাভ করা যায় না, এ সত্য এদেশে ইতর সাধারণেও জানে। যাঁরা সাহিত্য চর্চ্চা করেন তাঁদের চিরদিনই কাজের লোকদের কাছ থেকে নানারূপ বাজে কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এ সব কথায় অবশ্য কর্ণপাত করতে হবে কিন্তু মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই।

(৬)

আমরা সকলেই এখন দেশের পূজায় রত হয়েছি। এ পূজায় কেউ বা দান করবেন বস্ত্র, কেউ বা অন্ন, কেউ বা সুবর্ণ কিন্তু আমরা দান করতে পারব শুধু ধূপ দীপ আর পুষ্প। এই তিন দানের মূল্য যে কি সে বিষয়ে, একটি প্রাচীন ইতিহাস এখানে কীর্ত্তণ করি। পুরাকালে এই ভারতবর্ষে সুবর্ণ নামক জনৈক ঋষি সায়ম্ভুব মনুকে প্রশ্ন করেন যে ধূপ দীপ পুষ্পের দ্বারা পূজা করবার সার্থকতা কি। ভগবান মনু পুষ্পদানের এইরূপ গুণকীর্ত্তণ করেন—

* * * "দেবগণ কুসুমগন্ধ দ্বারা তুষ্ট হন, যক্ষ ও রাক্ষসগণ কুসুম দর্শনে সন্তুষ্ট হন, নাগগণ সম্যকরূপে পুষ্প উপভোগ করিলে তুষ্টি লাভ করে, আর মানবগণ আঘ্রাণ দর্শন ও উপভোগ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।"

সায়ম্ভুব মনুর এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি ভারতীর পায়ে যে

পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন, তার আঘ্রাণে ও দর্শনে বিশ্বের লোক মোহিত হয়ে গিয়েছে এবং তা উপভোগ করবার জন্য দেব দানব যক্ষ রক্ষ সকলেই লালায়িত হয়ে উঠেছে। মনু আরও বলেন যে—

"কুসুমগণ দেবগণকে তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন করে; তাঁহারা সংকল্প সিদ্ধ অতএব প্রীত হইয়া মানবগণের মনোরথ ইপ্সিত দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করেন" * * *

এ অবশ্য মস্ত আশার কথা, তবে তা এযুগে কতদূর ফলবে, সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

এ দান করবার সাধ্য অবশ্য আমাদের নেই, কেন না প্রতিভার স্পর্শ ব্যতীত কোন ভাষাতেই কাব্যের ফুল ফুটে ওঠে না। তারপর আসে ধূপদানের মাহাত্ম্যের কথা, এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে মনুর বচন উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। ধূপদান করাও আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত, আমরা বড়জোর কালেভদ্রে ধূনো দিতে পারি, কিন্তু সে শুধু মশা তাড়াবার জন্য।

এখন দীপদানের সুফল শুনুন—

"দীপজ্যোতি ঊর্দ্ধগ ও অন্ধকার বিনাশক। এই নিমিত্ত ঊর্দ্ধগতি দান করে, এ বিষয়ে এই নিশ্চয় আছে। দীপদান হেতু দেবগণ তেজস্বী প্রভাসম্পন্ন ও প্রকাশমান হইয়াছেন, এবং দীপদান না করিয়া রাক্ষসগণ তামসভাবে লাভ করিয়াছে, অতএব দীপদান করা বিধেয় হইয়াছে। মানব আলোকদান হেতু চক্ষুষ্মান ও প্রভাযুক্ত হয়, অতএব দীপদান করিয়া হিংসা করিবে না, এবং তাহা হরণ করিবে না ও নষ্ট করিবে না" * * *

আমরা "সবুজ পত্রে"র অন্তরে মনের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে চেষ্টা করব এবং স্বদেশকে যদি কিঞ্চিত-মাত্র আলোকদানে সমর্থ হই, তাহলেই আমরা কৃতার্থ হব, কারণ আমরা চাই যে সকলে চক্ষুষ্মান ও

প্রভাযুক্ত হন। যাঁরা আলোকে ভাল বাসেন না তাঁদের নিকট আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমরা যে দীপদান করতে যত্নবান হয়েছি সে দীপকে, "হিংসা করিবে না, তাহা হরণ করিবে না ও নষ্ট করিবে না"। বলা বাহুল্য অন্ধকারেই মানুষ ভয় পায়।

পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের সপ্তনবতিতম অধ্যায়' হতে অনূদিত, কিন্তু এ অনুবাদ আমার কৃত নয় বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এর জন্ম; সুতরাং এর ভাষার জন্য আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

নব-বর্ষ।

—:*:—
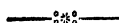
শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু—

নববর্ষ আর নবহর্ষ, এদেশে এ দুই বস্তু এক কবিতা ছাড়া আর কোথাও মেলে না। আর আমাদের জীবনটা আর যাই হোক কবিতা নয়, যদি কিছু হয় ত সে এক মহা হ য ব র ল। তাই নতুন বছর প্রতি বৎসর আমাদের শুধু নতুন করে জ্বালাতে আসে, কিন্তু তাতে বেশি কিছু যায় আসে না। অভ্যাসের গুণে ও-জ্বালা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এবার বৈশাখ একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে দেখা দিয়েছেন। আকাশ এক সঙ্গে এমন লাল ও করাল হয়ে উঠেছে আর বাতাস এতটা উত্তপ্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটেছে যে, মনে হয় যেন কাছে-কোলে কোথাও আগুন লেগেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে উপর থেকে অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে, আর পশ্চিম থেকে একটানা একরোখা হাওয়া বইছে, যার স্পর্শে মুখ পুড়ে যায়, বুক পুড়ে যায়; আর দিনভর কানে আসছে তার হা হাঁ হো হো শব্দ আর নাকে ঢুকছে তার চন্দনের নয়, গন্ধকের গন্ধ। এ আকাশ এ বাতাস আমাদের বাঙলা দেশের নয়, এমন কোনও পোড়া দেশের, যার উপর রুদ্রের রোষ-কষায়িত নেত্রের দৃষ্টি পড়েছে।

সিন্ধুদেশে একটি সহর আছে যার তুল্য গরম জায়গা, থারমমেটরের মতে ভূ-ভারতে আর নেই, যতদূর মনে পড়ছে, সে সহরটির নাম হচ্ছে শক্কর। শুনতে পাই সে দেশের অধিবাসীরা বলে যে, ভগবান যখন শক্কর তৈরি করেছেন তখন নরক সৃষ্টি করবার আর কি প্রয়োজন ছিল। নরকের এক প্রদেশের দান্তের চোখে-দেখা বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে দেখতে পাবে যে, শক্কর বাসীদের এ প্রশ্ন মোটেই অসঙ্গত নয়।

"E già venia su per le torbid' onde
un fracasso d´ un suon pien di spavento,
per cui tremavano ambedue le sponde.

non atrimenti fatto che d´ un vento
impetuoso per li avversi ardori,
che fier la selva senza alcun rattento ;

li rami schianta, abbatte e porta fuori ;
dinanzi polveroso va-superbo,
e fa fuggir le fiere, e li pastori"

অস্যার্থ—

"নদীর অপর-পার থেকে একলম্ফে তার ঘোলাজল ডিঙিয়ে এমন একটি বিকট শব্দ আমাদের কানে এসে পৌছল, যা শুনে আমাদের মন আতঙ্কে ভরে উঠল, আর মুর ধাকায় নদীর উভয়কূল থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এ শব্দ সেই বাতাসের চীৎকারধ্বনি, যে বাতাস আগুনের তাড়নায় ছুটে পালিয়ে আসছে এবং সুমুখে গাছপালা যা-পড়ে তাকেই অবিরাম প্রহার করছে।

এই রুক্ষ-বায়ু গাছের সব ডালপালা ভেঙে মাটির উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে, আবার সে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাতাস সুমুখে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে মহাদর্পে তেড়ে আসছে, আর কি পশু কি মানুষ সকলকেই মারের চোটে খেদিয়ে দিচ্ছে।"

এ বৎসর বৈশাখের রোষে আমরা দান্তের নরকের নবমচক্রে যে পড়ে গিয়েছি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জানো কি পাপে মানুষের এ নরক বাস হয়?—দান্তে বলেন সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস না করায়। আমরা যে এ অপরাধে অপরাধী সে জ্ঞান আমার ছিল না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে নানা রকমের orthodoxy আছে, সম্ভবত আমরা তার ভিতর কোন একটার প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছি। সেই পাপেই আমাদের এই শাস্তি।

আসলে সত্য কথা এই যে শুধু শঙ্কর কেন, ভগবান যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন আর নরক তৈরি করবার কি প্রয়োজন ছিল? আগুন এদেশে চিরকালই জ্বলেছে—তাই না বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনার ধন হচ্ছে নির্ব্বান, আর সনাতন ধর্ম্মের কাম্য ও গম্যস্থান, স্বর্গ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বর্গে যাবার জন্য তেমনি লালায়িত হতেন, যেমন আমরা হই, সিমলে দারজিলিং যাবার জন্যে এবং দুই-ই এক কারণে অর্থাৎ হাওয়া বদলাবার জন্যে। এর প্রমাণ তাঁদের সঞ্চিত পূণ্য ক্ষয় হলে তাঁরা স্বর্গ ছেড়ে আবার দেশে ফিরে আসতেন, যেমন আমাদের পুঁজি-পাটা খরচ হয়ে গেলে আমরা সিমলে দারজিলিং থেকে আবার দেশে নেমে পড়ি। আমার বিশ্বাস আমাদের কাব্যে দর্শনে পুঁথিতে পাঁজিতে যে "ভবসাগর" উত্তীর্ণ হওয়া জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলে উল্লিখিত হয়েছে, সে ভবসাগর

হচ্ছে কালাপানী। এবার মরে আমরা কে না আবার বিলেতে জন্মাতে চাই!

দেখতে পাচ্ছ গরমে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নইলে এত বেফাঁস বকি! আসল কথা এই যে, নববর্ষ আমাদের প্রাণে নব হর্ষ না আনুক, আমাদের মনে নব-আশা এনে দেয়। বাইরে ঝড় বইলেও মানুষ তার অন্তরে "ন মুঞ্চতি আশা বায়ু" এ হচ্ছে শাস্ত্র বচন, তারপর ভাষাতেও বলে, "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"। অতএব সকলে মিলে, আশা করা যাক যে এবার বর্ষশেষে আমাদের হর্ষের কারণ ঘটবে।

(২)

গরম দেশে বাস করার ভিতর সুখ না থাক স্বস্তি আছে। সে দেশে মানুষ জীবনের বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে, আর বাদবাকী অংশটা ঝিমিয়ে কাটাতে পারে। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে বেদ উত্তরমেরুতে রচিত হয়েছিল, এ কথা সত্য কি মিথ্যা শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের প্রথমত বেদের এবং দ্বিতীয়ত উত্তর-মেরুর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, আমার নেই, অতএব উক্ত মন্ত্র প্রথমে উত্তরমেরুতে কিম্বা দক্ষিনমেরুতে উচ্চারিত হয়েছিল সে কথা বলতে আমি অপারগ। তবে বেদ যে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের বাণী নয়, তার প্রমাণ "মা দিবাং সাপ্সি" এই বৈদিক নিষেধ-বাক্য। আজও দেখতে পাচ্ছি শীতপ্রধান দেশের সভ্যতার মূলকথা ঐ একই। ইউরোপের দেবতারা যে জাগ্রত এ কথা কে অস্বীকার করবে? সে কালের আর্য্যেরা এদেশে এসে আমাদের দিবানিদ্রা ভাঙাতে একবার চেষ্টা

করেছিলেন, তারপর জলবায়ুর গুণে তাঁরা নিজেরাই তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন, এবং দিবানিদ্রার নাম যোগনিদ্রা দিয়ে বেদের অবিরোধে সেই নিদ্রাসুখ অনুভব করতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে নানারকম পার-লৌকিক সুখস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তারপর ফাঁক পেয়ে আমরা বহুদিন ধরে দিব্যি আরামে ঘুম দিচ্ছিলুম, ইতিমধ্যে ইউরোপ থেকে আর এক দল আর্য্য এসে আমাদের সে নিদ্রা আবার ভঙ্গ করেছে। ইতিমধ্যে অবশ্য নানা দেশ থেকে নানা জাতি এসে আমাদের যথেষ্ট হয়রান পরিশান করেছে, কিন্তু "মা দিবাং সপ্সি"—এ হুকুম আমাদের উপর তারা কেউ জারি করে নি। মোগল-পাঠান আমাদের দেহ নিয়ে অনেক টানাটানি করেছে কিন্তু তারা আমাদের মনের উপর হস্তক্ষেপ করেনি, অর্থাৎ তারা আমাদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়নি। বলা বাহুল্য ঘুমোয় আসলে শরীর, মন শুধু শুয়ে পড়ে।

এই নব ইউরোপীয় সভ্যতাই আমাদের মনকে এমনি জাগিয়ে তুলেছে যে, সে মনে ওঠবার এবং ছোটবার প্রবৃত্তি এক রকম অদম্য হয়ে উঠেছে। অথচ আমরা উঠতে গেলেই আমাদের বাসগৃহের ছাদ আমাদের মাথায় চড় মারে আর ছুটতে গেলেই তার দেয়াল আমাদের বুকে ঘুঁষো মারে। আর অমনি আমরা বাঁ হাত মাথায় দিয়ে বসে পড়ে ডান হাত বুকে দিয়ে কান্না জুড়ে দিই। সে কান্নার সুর ললিত আর তার বুলি হচ্ছে এই যে, যে মাথার মত চরম মাথা আর যে বুকের মত নরম বুক পৃথিবীতে আর কোথায়ও নেই, ছিল না, এবং থাকতে পারে না; সেই মাথা ও সেই বুকে এত চোট লাগে। এই ব্যাপারটারই নাম হচ্ছে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তি। এ অশান্তির ফল ভালই হোক আর মন্দই হোক, এর জন্য দায়ী ইউরোপের সাদা মানুষ, ভারতবর্ষের

কালা আদমি নয়। প্রথমত ইংরাজি শিক্ষা ঠুকঠাক করে আমাদের শুধু জনকতকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছিল, তারপরে এই যুদ্ধ একঘায়ে দেশশুদ্ধ লোকের মনের নিদ্রাভঙ্গ করেছে। আজকের দিনে দেশের লোক কি চায় তা তারা ঠিক না জানলেও, যা আছে তাতে তারা যে সন্তুষ্ট নয় এ ত চোখে আঙুল-দেওয়া সত্য। আমাদের এ অশান্তির পরিচয় পেয়ে যাঁরা অতিমাত্রায় বিচলিত হয়েছেন, তাঁরা বলেন, তোমরা যা চাও সে হচ্ছে আকাশের চাঁদ। তথাস্তু। কিন্তু চাঁদ চেয়ে তার পরিবর্তে অর্দ্ধচন্দ্র পেলে মানুষের বুক ত জুড়িয়ে যায়ই না, উপরন্তু মাথা গরম হয়। দেশের কথা এইখানেই খতম করা যাক। ও-কথা বলতে গেলেই হা হুতাশ করতে হয় এবং আমার বিশ্বাস আমরা সাহিত্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের যথেষ্ট অপব্যয় করেছি, এখন অন্তত কিছু দিনের জন্য, আমাদের পক্ষে প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য,-মনের বলাধানের জন্য।

(৩)

দেশের অশান্তির কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বিদেশের শান্তির কথা পাড়া যাক। এ বিষয়ের বিচার আমরা খুব দূর থেকে খুব একটা উঁচু জায়গায় বসে করতে পারব, অতএব এ ক্ষেত্রে আমাদের রায় যথেষ্ট উদার, যথেষ্ট নিরপেক্ষ হবে; বিশেষত সে রায়ের যখন কোনও ফয়সালা নেই। পরের সমস্যার সহজ মীমাংসা কে না করতে পারে? তা ছাড়া এ বিষয়ে মতামত দেবারও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে। ভারতবর্ষ হচ্ছে League of Nations, একটি Original member অর্থাৎ এই যুদ্ধের ফলে আমাদের আর

কিছু লাভ হোক আর না হোক আমরা গাছে না উঠতেই এক কাঁধি নামাবার-অধিকার পেয়েছি। "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!"

ইংরাজিতে একটি প্রবচন আছে যে, "মন্দের ভিতর থেকে ভাল বেরয়"। এই যুদ্ধটা যতই আসুরিক, যতই পাশবিক হোক না কেন, এর ভীষণ আর্ত্তনাদের ভিতর থেকে একটা আকাশ বাণী শোনা গিয়েছে। এর দিগন্তব্যাপী তোপের আওয়াজ ভেদ করে এই কথাটা বেরিয়ে এসেছিল যে, এ হচ্ছে প্রভুত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ। এই আকাশ বাণীতে আমিও বিশ্বাস করেছিলুম, কেননা এ হচ্ছে আশার বাণী। জানই ত মানুষে যাকে বিশ্বাস বলে সে শুধু আশারই বেনামদার, সুতরাং ইউরোপের শান্তি-বচনে বিশ্বাস স্থাপন করে' আমি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিই নি, পরিচয় দিয়েছি শুধু এই সত্যের যে, আমিও মানুষ অর্থাৎ মূলত আশাজীবি।

তবে আমার প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, আশাই বলো আর বিশ্বাসই বলো, যতক্ষণ না তা স্পষ্ট একটা আকার ধারণ করে, ততক্ষণ তা মনের ভিতর দিয়ে শুধু আনাগোনা করে, সেখানে আসন পায় না। এই সংহার-নাটকের যখন দম ফুরিয়ে আসবে তখন তা যে মিলনান্ত হবে আমার এ বিশ্বাস থাকলেও উপসংহারটা যে ঠিক কি রকম হবে, সে-সম্বন্ধে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অতঃপর উইল্‌সন সাহেবের কল্পিত সাঙ্গোপাঙ্গ শান্তির প্রস্তাব যখন মূর্ত্তিমান হয়ে বিশ্বমানবের চোখের সুমুখে খাড়া হল তখন মহা উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম, কেননা শুধু যে ধরাছোঁয়ার মত একটা জিনিষ পেলুম তাই নয়, দেখা গেল তাঁর মনগড়া শান্তির চোদ্দটি পদ আছে। বাঙলার জনৈক রসিক লেখক বলে গিয়েছেন যে, "রচনটা গদ্য কি পদ্য তা

চেনা যায় শুধু চোদ্দয়"। এই সূত্রের উপর নির্ভর করে, সহজেই বিশ্বাস করেছিলুম যে এই সংহার নাটকটি অতি বিজিগিচ্ছি গদ্য হলেও এর উপসংহার হবে পদ্য, শুধু পদ্য নয়, একেবারে চতুর্দ্দশপদী কবিতা, ইংরাজিতে যাকে বলে 'সনেট'। এতে মনে একটু অহঙ্কারও হলো এই ভেবে যে শেষটা জয় আমাদেরই হলো কেননা উইল্‌সন সাহেব আমাদেরই দলের লোক অর্থাৎ তিনি একাধারে অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। ভাল কথা উইল্‌সন সাহেবের Essays পড়েছে? চমৎকার লেখা। যে হাত থেকে State নামক হাজার দুয়েক শুকনো পাতার গ্রন্থ বেরিয়েছে, সেই হাত থেকে যে অমন সব সরস প্রবন্ধ বেরতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। মধ্যে থেকে একটি অবান্তর কথা বলে নিলুম, এই প্রমাণ করবার জন্য যে আইনের অধ্যাপক হলেও মানুষে অবসর মত রসালাপ করতে পারে। যাক ও সব কথা, এখন আবার শান্তির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমরা ত আশা করেছিলুম মস্ত কিন্তু ফলে দাঁড়াল কি?—

দেখা যাচ্ছে যে এই কুরুক্ষেত্রে জয়যুক্ত পঞ্চপাণ্ডবের হাড়গড়া সন্ধিপত্রে যা আছে, সে হচ্ছে শুধু দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ, আর পৃথিবীর জমির ভাগ বাঁটোয়ারা, এক কথায়, শুধু জ্যামিতি আর পাটিগণিত। "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়"— কবিতার বদলে অঙ্ক! আমরা চেয়েছিলুম দেখতে সভ্যতার একটা নতুন প্রাণ চিত্র কিন্তু দেখতে পাচ্ছি শুধু পৃথিবীর একটি নতুন মানচিত্র।

(৪)

এই প্রস্তুত শান্তির গুণাগুণ তিনিই বুঝতে পারেন যিনি

আজীবন রেখা ও সংখ্যা নিয়ে কারবার করেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক পাওয়া দুর্ল্লভ যিনি একাধারে পাকা জরিপ-আমিন ও পাকা সুমোর-নবিশ, কেননা মানব সমাজে কেউ পারে মাপতে আর কেউ পারে গুণতে। মহামান্য কলিকাতা উচ্চ আদালতে একদল উকিল আছেন যারা নাকি ম্যাপ বোঝেন ভাল, আর উক্ত আদালতে একদল ব্যারিষ্টার আছেন যাঁরা নাকি হিসেব বোঝেন ভাল। এ কথা আমি বিশ্বাস করি। মোটামুটি মানুষ ঐ দুই ধাতেরই হয়ে থাকে। লোকে বলে আমাদের দেশে পলিটিক্সের যে দু'-দল হয়েছে, তার কারণ এরা দু'দল দু'জাতের লোক, মডারেটরা বোঝে ভাল হিসেব, আর Extremists-রা নক্সা! আমি যে এ দু'দলের কোন দলেরই নই, তার কারণ আমার কলমের মুখ দিয়ে যা বেরয় তা রেখাও নয় সংখ্যাও নয়, ছেরেপ অক্ষর। সীমার জ্ঞান ও অর্থের জ্ঞান আমারও আছে, কিন্তু সে অন্য ক্ষেত্রে। তবে পৃথিবীতে থাকতে হলে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সঙ্গে একটা মোটামুটি রকমের পরিচয় সকলেরই হয়, আমারও হয়েছে। সেই পরিচয়ের বলে আমি বলি, পৃথিবীর একটা নতুন নক্সা পাঁচজনে সহজেই তৈরি করতে পারে কিন্তু বিশ্বমানবকে সেই সঙ্গে পঞ্চীকৃত করা তাদৃশ্য সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। মাটিকে আমরা যেমন ইচ্ছে ভাগ করতে পারি, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ-বিয়োগ করা নিয়েই ত যত মুস্কিল। যুদ্ধ মাটি নিয়েই হয়, শান্তি কিন্তু মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমেই দেখনা কেন, পাঁচজনে মিলে যত সহজে পৃথিবীর কালী করেছেন তত সহজে তার নক্সা তৈরি করতে পারছেন না। গোল

বেধেছে তার রঙ দেওয়া নিয়ে। এ মানচিত্রে রেখার সঙ্গে বর্ণের মহা দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছে, বর্ণ কোথাও বা সীমারেখাকে অতিক্রম করতে চাচ্ছে কোথাও বা বিভক্ত হতে আপত্তি করছে। জর্ম্মাণী বলছে, এ সন্ধি ত আসলে বিচ্ছেদ। অপর পক্ষে ইতালি বলছে, এ সন্ধিতে ত সমাস হল না। এই দুই আপত্তিই উঠছে বর্ণের দিক থেকে। এ দুই আপত্তির এমন কোনও সদুত্তর নেই যা সকলে বিনা বাক্যব্যায়ে গ্রাহ্য করে নিতে বাধ্য, তার কারণ ইউরেপের এই নূতন ভাগ বাটোয়ারার গোড়ায় একটা গলদ আছে।

এই নূতন বন্দোবস্তের গোড়ার কথা হচ্ছে Self-determinations of Nations অথচ nation যে কাকে বলে সে বিষয়ে এই বন্দোবস্তকারীদের মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। Nation-এর মূল কোথায়, জমিতে না জাতিতে? যারা একদেশে বাস করে তারা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে তাদের জমি ভাগ করে নিলে তাদের nationality রক্ষা হয় না। এই হচ্ছে জর্ম্মানীর কথা। অপর পক্ষে যারা এক জাতের লোক তারা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে বিদেশকে আত্মসাৎ না করলে তাদের nationality-ও পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই হচ্ছে ইতালির কথা। Nation শব্দের এই দুটি বিরোধী অর্থের সমন্বয় করতে গিয়েই যত গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে। আসল কথা ও-দুয়ের কোন অর্থই পরীক্ষায় টেঁকে না, কেননা এক চৌহদ্দির ভিতর যেমন নানা জাত বাস করে তেমনি এক জাতের লোক নানা দেশে বাস করে। তা ছাড়া ইউরোপের কোন প্রদেশই একদেশ নয়; কেননা তার প্রতি দেশের চৌহদ্দি ক্রমান্বয়ে বদলাচ্ছে; ইউরোপের কোন জাতিই একজাতি

নয় কেননা তার প্রতি জাতির শরীরে নানা জাতির রক্ত আছে। এক কথায় ইউরোপের সব বর্ণই সঙ্কীর্ণ বর্ণ এবং এ বর্ণের ধর্ম্ম হচ্ছে চারিয়ে যাওয়া, কতকগুলি সরল রেখার ভিতর তাকে আটক রাখবার যো নেই।

কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে, nation শব্দের যে অর্থই হোক পলিটিক্‌সে ও-শব্দের অর্থ হচ্ছে সেই জনসমূহ যারা এক রাজ্যভুক্ত এবং যাদের ভিতর সর্ব্ব প্রধান বন্ধনসূত্র হচ্ছে চিরাগত একশাসন, একপালন। প্রতি nation নিজের মনে নিজের nationality-র ভিত্তি যাই ভাবুক, প্রতি nation অপর সকল nation-কে শুধু পলিটিকাল nation হিসাবেই মানে এবং তার সঙ্গে কারবার করে। রাজনীতির দরবারে এই হিসেবটাই সব চাইতে বড় হিসেব বলেই রেখার সঙ্গে শুধু বর্ণের নয় সংখ্যারও বিবাদ ঘটে। পলিটিক্‌সে লোকবলও একটা কম বল নয়, সুতরাং ইউরোপের এই নতুন বন্দোবস্তে যে nation-এর লোক সংখ্যা বাড়ছে সেই খুসি হচ্ছে আর যে nation এর কমছে সেই ব্যাজার হচ্ছে, অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, এ ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে ইউরোপের রাজশক্তির যোগ-বিয়োগ। উইলসন সাহেব আশা করেন যে ঐ মহাদেশের রাজশক্তির ঐই বিশ্লেষণ ও আশ্লেষণের ফলে পৃথিবীতে চিরশান্তি বিরাজ করবে। কিন্তু এ আশা ফলবতী হবে কি না, সে বিষয়ে তিনিই আমার মনে একটু খট্‌কা লাগিয়েছন। মানুষ যে কত নির্ব্বোধ তার একটি উদাহরণ তাঁর New Freedom গ্রন্থেই পড়েছি। উইলসন সাহেব বলেন যে Newton যখন এই জড়-জগতের laws of motion আবিষ্কার করলেন, তখন ইউরোপ ধরে নিলে যে ঐ একই law রাজনীতিতে প্রযুজ্য, অমনি সে দেশের রাজমন্ত্রীরা

balance of power-এর সৃষ্টি করতে বসে গেলেন। এ balance টিকলে না, কেননা জড়জগৎ আর মনোজগৎ এক নিয়মের অধীন নয়। এখন জিজ্ঞাসা করি আজকের দিনে বড় বড় রাজমন্ত্রীরা সেই পুরোণো balance of power ছাড়া আর কি রচনা করতে বসেছেন? নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, এবার নাকি এ balance তার গড়নের হিকমতে মানবসমাজকে stable equilibriun দান করবে। মানবজীবন কিন্তু ঘড়ির পেণ্ডুলমের মত। ঘড়ির দম বন্ধ না হলে ওর দোল বন্ধ হয় না। অতএব এ পৃথিবীতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে কোন একটা অবস্থায় স্থির থাকবে না। একমাত্র মৃত্যুই মানুষকে চিরশান্তি দিতে পারে। মহাভারতে দেখতে পাই স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ও শান্তি পর্ব্বের মধ্যে আরও অনেকগুলি পর্ব্ব আছে। সুতরাং এই শান্তি পর্ব্বই যে ইউরোপের ইতিহাসের শেষ পর্ব্ব, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

(৫)

ইউরোপ মায় আমেরিকা সমগ্র পৃথিবী নয় এবং ইউরোপের বাইরেও মানুষ আছে সুতরাং দেখা যাক, তাদের কি ব্যবস্থা হল।

এই শান্তির দরবারে স্থির হয়ে গিয়েছে যে সমগ্র আফ্রিকা এবং বেশির ভাগ এসিয়ার সব জাতিই নাবালক। পলিটিকাল হিসেবে যারা স্বরাট নয় পূর্ব্বেই বলেছি ইউরোপের কোন Nation-ই তাদের সাবালক বলে স্বীকার করে না। তাই এই নাবালকদের জন্য সব উছি নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং যতদিন তারা সাবালক না হয় ততদিন এই উছিরাই তাদের শাসন-সংরক্ষণ করবে। এ অতি উত্তম ব্যবস্থা।

তবে এই প্রশ্নটা মনে সহজেই উদয় হয়, এই নাবালকেরা কবে সাবালক হবে? নাবালকের উচ্ছি নিযুক্ত করা মাত্র যে তার নাবালকত্বের মেয়াদ বেড়ে যায় ইউরোপের সকল আইনের ত এই কানুন। তারপর শুনতে পাচ্ছি উক্ত উছিরা এই সব নাবালকদের শিক্ষার ভার হাতে নেবেন—তাদের মানুষ করে তোলবার জন্য। এ অবশ্য ভরসার কথা, তবে ভয়ের কথা এই যে, ইউরোপীয় মতে শিক্ষা-পদ্ধতির একটা মোটা কথা এই যে, "Spare the rod and spoil the child."

যাকগে ও সব পরের কথা। আমাদের অবস্থা যে ঠিক কি দাঁড়াল সেটা এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। League of nations-এর হিসাবে আমরা হলুম সাবালক আর nation হিসেবে থাকলুম নাবালক। একসঙ্গে সাবালক ও নাবালক দেখতে পাচ্ছ পৃথিবীতে আমরা ছাড়া কেউ হতে পারে না, আমরাই হচ্ছি মানবসমাজে এক-মাত্র living contradiction, এবং সম্ভবত এই contradiction-টা আবহমান কাল living থাকবে।

এত লম্বা বক্তৃতা করবার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, পৃথিবীর ভাবনা ভেবে কোনও লাভ নেই। ও-বস্তুটা যখন গোল তখন ওকে চৌকোস করবার চেষ্টা বৃথা; বিশেষত তাদের পক্ষে যাদের হাতে হাতুড়ি নেই। তার চেয়ে Voltaire-এর উপদেশ শিরোধার্য্য করা ঢের ভাল। মানুষের কাছে তাঁর শেষ কথা এই—

"Cultivate your garden"—অতএব এসো তুমি আমি সাহিত্যের চর্চ্চা করি, কেন না আমরা ঐ সাহিত্যের চাষ ছাড়া আর কিছু করতে পারব না।

(৬)

আর এক কথা, কোমর বেঁধে সাহিত্যের চাস করাও আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য। ভারতবাসীর মন গড়ে তোলবার দায় বর্ত্তমানে বিশেষ করে বাঙালীর ঘাড়েই পড়েছে, এবং সে দায় এড়াবার আমাদের অধিকার নেই, কেননা এ দায় আর কেউ বহন করতে পারবে না।

এ যুগে সমগ্র ভারতবর্ষকে আমরা একটি বিরাট পুরুষরূপে দেখতে শিখেছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশগুলি যার শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। কোন্ প্রদেশ তার কোন্ অঙ্গ তাও একরকম ঠিক হয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাব যে এই বিরাট পুরুষের বাহু আর বোম্বাই যে তার উদর এ বিষয়ে দেশশুদ্ধ লোক এক মত। পূর্ব্বে আমরা দাবী করতুম যে বাঙলাই হচ্ছে বর্ত্তমান ভারতের হৃদয়, অতএব মাদ্রাজ তার পদ। মাদ্রাজ অবশ্য এতে আপত্তি করত এবং সে আপত্তি হালে হোমরুল দলে গ্রাহ্য হয়েছে। এই দলের পলিটিসিয়ানদের মতে, ভারতবর্ষের হৃদয় এখন তার বাঁ-দিক থেকে বদলি হয়ে ডানদিকে, এক কথায় বাঙলা থেকে সরে গিয়ে মাদ্রাজে স্থিতিলাভ করেছে। এ কথার প্রতিবাদ করবার আমাদের প্রয়োজন নেই, কেননা আমাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের হৃদয় কেড়ে নিলেও তার পা আমাদের ঘাড়ে অদ্যাবধি কেউ চাপিয়ে দেয় নি। কেন দেয় নি, তার ভিতর একটু রহস্য আছে। আমাদের নব-পেট্রিয়টরা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছেন যে, এ বিরাট পুরুষের পা বলে কোন অঙ্গই নেই, এ যে চলে না, এই হচ্ছে এর বিশেষত্ব ও মহত্ব। এ কথা আমরা সকলেই মানতে বাধ্য, কেননা

জনরব যে এই নব-পেট্রিয়টরাই হচ্ছেন দেশের আগামী শাসনকর্ত্তা। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে বাকী থাকল শুধু একটি অঙ্গ—মস্তক। তাই আজ আমরা দাবী করতে পারি যে, বাঙলাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মস্তক, আমাদের এই দাবীর বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার নেই, কেননা ও-অঙ্গের ভার নিজস্কন্ধে নিতে আমরা ছাড়া আর কেউ রাজি হবে না। ওর অন্তরে মস্তিস্ক নামক যে পারার মত পদার্থটি আছে তা মানুষের মনকে শেখায়-পড়ায়, তার বাহুকে শাসন করে, তার উদরকে অতি মাত্রায় স্ফীত হতে দেয় না, তার হৃদয়ের রক্তকে পরিষ্কার করে, তার পরে তা এমন সব ন্যায়ের বিধান দেয় যা মেনে চলা রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। এ ছাড়া ঐ মস্তিষ্ক নামক পদার্থটি "আইডিয়া" নামক এক অবস্তুর সৃষ্টি করে যাকে অন্তরে স্থান দিয়ে মানুষের সোয়াস্তি থাকে না, অথচ যার কাছ থেকে একদম পালানও মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এ অবস্তুর চর্চ্চা কাজের লোকেরা একেবারেই করতে নারাজ; অতএব এর চর্চ্চা এ যুগে আমাদেরই করতে হবে, কেননা আমরা যে জাতকে-জাত যে unpractical, এ সত্য ত সর্ব্বলোক-বিদিত। এই খানেই মনে করিয়ে দিই যে মানুষে যাকে সাহিত্য বলে—তার জন্মস্থান হচ্ছে ঐ মস্তিষ্ক। সুতরাং আমরা যখন প্র্যাকটিকাল নই তখন আমাদের পক্ষে একমনে সাহিত্য রচনা করাই শ্রেয়, বিশেষত যখন আমরা না করলে ও-কাজ ভারতবর্ষে আর কেউ করবে না। ভাববার-চিন্তোবার আর কারও সময় নেই তারা সব বড় কাজে ব্যস্ত।

বীরবল।

ভবভূতি।

——:০:——

কি মেঘ গম্ভীর শ্লোক উঠিলে উচ্চারি,
নির্ভয় প্রবল কণ্ঠে কি মহা ঝঙ্কার!
সহস্র বর্ষেরো পরে প্রতিধ্বনি তারি,
আছে ভরি ভারতের প্রান্তর কান্তার।
তবু কি করুণ গীতি, তবু কি মধুর!
ক্রন্দনে লুটায়ে পড় এমন কাতর!
বীরের বিরহ-গাথা অপরূপ সুর;
কুসুম-কোমল তুমি হে বজ্র-কঠোর!
এত প্রেম কে শিখালে তরুণ ব্রাহ্মণ?
এত গর্ব্ব? তবু তুমি কর নাই ভুল;
শোভিল তোমারি ভালে বিজয়-চন্দন;
—কাল নিরবধি আর পৃথিবী বিপুল।
আজি যে সহস্র কণ্ঠে উঠে তব স্তুতি
হে কঠিনে সুকুমার কবি ভবভূতি!

৪ঠা মাঘ ১৩২৫।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

প্রতিধ্বনি।

—:০:—

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনি, চারিদিকে শুধু
প্রতিধ্বনি। কে আছ নির্ভীক বীর হেথা ?
এই বদ্ধ, অন্ধ কারাগৃহ ভাঙ্গি, বঁধু,
ধ্বনিরাজ্যে নিয়ে যাও ; দূর কর ব্যথা।
যুগযুগান্তর পূর্ব্বে কোন্ কথা কবে
উচ্চারিত হ'য়েছিল প্রতিশব্দ তার
প্রাচীর প্রহত হ'য়ে, বার বার, বার,
ফিরে আসে দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত রবে।
যদি এর আবেষ্টনী ভেঙে ফেলা যেত !
আকাশের তলে শব্দ যদি প্রাণ পেত !
কি আনন্দে মাতিয়া উঠিত দশদিক,
মানুষ কি চোখে ধরা দেখিত চাহিয়া,
জীবন কি গান জানি, উঠিত গাহিয়া !
ধ্বনিরাজ্যে নিয়ে যাবে কে মোরে, নির্ভীক ?

২২শে মাঘ ১৩২৫।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

প্রেম।

—:০:—

দার্শনিক-বিজ্ঞ কহে—তারে বল প্রেম ?
অবিদ্যার মোহ সেতো মানব অন্তরে।
বিদেশী পিত্তল সেও স্বর্ণরূপ ধরে,
তারে বল আর কিছু—সে তো নহে হেম।

বৈজ্ঞানিক হেসে কহে—সৃজনের ধারে
বৃত্তি এক প'ড়ে আছে প্রকৃতিরচন,
অভাবে স্বভাব সৃষ্টি—জনমে জীবন
যৌন-নির্ব্বাচন বৃত্তি—প্রেম বল তারে ?

কবি কহে—পণ্ডিতের বন্ধ্যাহিয়া মাঝে
প্রেমের জনম কভু সম্ভবে না সাজে!

সেতো কভু দেখে নাই রাধিকার সনে
কুঞ্জে বসি—সারা বিশ্ব শুধু শ্যামময়,
বাঁশীটি বাজেনি যার হৃদি-বৃন্দাবনে
সে কভু বুঝিতে পারে—প্রেম কারে কয়!

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

রূপ।

——:❋:——

নিমেষে নিমেষের প্রাণ
হাসিয়া পলক,
ফুলের এলান বুকে উষার আলোকে খুলিয়া ঝলক,
কোথায় মিলায়!
কাটে,—সে পরশটুকু ভাবিয়া ফুলের, আকুল দিবস
তার অজানায়!

মিলাইয়া গিয়াছে নিমেষে,
তাই সে—অমিয়-গলা শিশিরের কণা;
কুসুমের সকল জীবন
ঘিরিয়া থাকিত যদি হ'ত সে—বেদনা।

এলে তুমি যৌবনের
শ্রাবণ উষায়,
ঢালিয়া হৃদয় মনে অযুত সাধনে আকাঙ্খা আশায়
যে রূপ-প্লাবন,
প্রাণের গোপনে সে যে ঘুমায়ে পড়েছে, তারি স্বপনেতে
বিভোর জীবন!

রূপ সে যে বাঁশরীর সুর,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে উড়ে চলে যায়;
স্তব্ধতার নিবিড় অন্তর
পরশে শিহরি দিয়া নিভৃতে ঘুমায়।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

উড়ো-চিঠি।

—:*:—

এপ্রিল ২২, ১৯১৯।

জীবনকুমার

তোমার উপরে আমি যে মনে মনে একটু বিরক্ত ছিলুম সেটা তোমার কাছে আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কেননা তোমার শেষ চিঠি পড়ে' একেবারে ডবল খুসি হয়েছি। তুমি হয়ত মনে মনে ভাববে যে, সে চিঠিখানার মধ্যে এমন কি অপরকে খুসি করবার মত পরমাশ্চর্য্য খবর ছিল! তা যে-খবর ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, তুমি একটা কিছু করবে বলে' মনস্থ করেছ।

আমার দ্বিতীয় দফা খুসি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি সাহিত্য-সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছ। আমার বিশ্বাস যে, "Pen is mightier than the sword," এ-কথাটা একটুকু অতি-রঞ্জিতও নয়, অতি-মণ্ডিতও নয়। লেখনী অসির চাইতে mightier ত বটেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে তা subtler-ও। ব্রাহ্মণের স্থান যে ক্ষত্রিয়ের চাইতে উঁচুতে ধরা হয়েছে সেটা খামখেয়ালেও নয়, বা খোসখেয়ালীতেও নয়। অসি দান করে—মৃত্যু, আর লেখনী—অমৃত। অসি জীবন নিতেই পারে—লেখনী জীবন দিতেও পারে। তাই ত এ দেশে আজ লেখনীর এত প্রয়োজন, অবশ্য যদি সেই লেখনীর পিছনে এমন একটা মস্তিষ্ক থাকে যে-

মস্তিষ্কের চিন্তাশীলতা অধর্ম্ম নয় অকর্ম্মও নয়। তবে তুমি সাহিত্য-মন্দিরের পূজারি হয়ে কেবলই পুরোনো মন্ত্র আওড়াবে, না নিজে উদ্যোগ করে' সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু ধ্যান ধারণাও করবে তা শুধু তোমার উপরেই নির্ভর করে। তবে তোমাকে এইখানে এই কথাটা বলে' রাখছি যে, মন্ত্রের যে গুণ তা মানুষের জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ কণ্ঠ তালু ইত্যাদি Vocal instruments-গুলোর মধ্যেই নেই, আছে তা তার অন্তরে, যেখানে মানুষ বচনশীলতায় মুখর সেখানে নেই, আছে তা যেখানে সে আত্মোপলব্ধিতে প্রখর। মন্ত্র হয়ে ওঠে কেবল বাক্য, যখন সেই মন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। বাক্যের জোর তখনই, যখন তা হ'য়ে ওঠে মন্ত্র, মন্ত্রের গুণ তখনই যখন তা সেই মানুষের আত্মার সত্যে ও শক্তিতে অভিষিক্ত।

কিন্তু সাহিত্য-সেবায় তুমি জীবন উৎসর্গ করবে জেনে সুখী হলেও আমি তোমার একটা প্রশ্ন শুনে একটু দমে গিয়েছি—সাহিত্য-জগতে তোমার সাফল্য সম্বন্ধে। তুমি যে জিজ্ঞেস করেছ, আজ যে বাঙলা দেশের সাহিত্য-সভায় দুটো দল গড়ে' উঠল, যার এক দলকে পুরাতন ও অন্য দলকে নূতন-পন্থী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এই দু' পন্থীর মধ্যে কোন্ পন্থা পান্থজনের শ্রেয়? এ প্রশ্নে তোমার কৃতার্থতা সম্বন্ধে আমি স্বভাবতই একটু দমে' গিয়েছি এই জন্যে যে, ও-প্রশ্নের অর্থই হচ্ছে সন্দেহ ও সংশয়। আর সন্দেহ ও সংশয়ের মানে হচ্ছে নিজের অন্তর থেকে সেই বিষয়ে একটা কোন স্পষ্ট তাগিদ না আসা। অন্তরের এই তাগিদই হচ্ছে মানুষের সত্য; সুতরাং সেই পন্থাই তার পন্থা। মানুষ যতক্ষণ না এই রকম তাগিদ তার অন্তর থেকে পায় ততক্ষণই তার প্রশ্ন—এটা করি না ওটা

ধরি ? এ রকম দু' নৌকোয় পা রাখলে আর যাই হোক, নৌকো চলে না। কিন্তু যা হোক এ সম্বন্ধে তোমায় আমি একটা ব্যক্তিগত মত দিতে পারি। আমার দৃঢ় ধারণা যে বাঙলা-সাহিত্যে আজ আমরা যে পন্থাই অবলম্বন করি না কেন, আজ আমরা সেখানে বৌদ্ধ দোঁহার সুর ভাঁজতে গেলে যতখানি ঠকব, বৈষ্ণব পদাবলীর তান সাধতে গেলেও ঠিক ততখানিই ঠকব। কেননা আজ আমরা বৌদ্ধও নই বৈষ্ণবও নই—অর্থাৎ অন্তরে।

আসলে পুরাতন পন্থা ও নূতন পন্থা কতকটা সত্যি হলেও ও-সম্বন্ধে তর্কটার অনেকখানিই বাজে। বাঙলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আসল খাঁটি কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, তা প্রথমে বাঙলা হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত তা সাহিত্য হওয়া চাই। এই হলেই আর কোন সংজ্ঞাই সেটাকে বাঙলা-সাহিত্যের ফলাহারে অপাংক্তেয় করে' রাখতে পারবে না।

এত বড় একটা কথার মুখে তর্কের খাতিরে তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে, যদি কোন বাঙালী ঔপন্যাসিক কামস্কাট্কাবাসী এক জোড়া যুবক-যুবতীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করে' একখানা উপন্যাস লেখেন তবে সে গ্রন্থকে বাঙলা-সাহিত্যের জাতে তুলে নিতে হবে কি না ? তা বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসবে না কি ?—নিশ্চয় তাকে জাতে তুলে নিতে হবে। সাহিত্য-বৃক্ষের নানা শাখা, যেমন কাব্য উপন্যাস ইতিহাস ইত্যাদি। এখন যদি বাঙালী-ঐতিহাসিক বাঙলা-ভাষায় একখানি মেক্সিকোর ইতিহাস লেখেন তবে তা বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ হবে কি না ? মেক্সিকোর ইতিহাস যদি বাঙলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে তবে কামস্কাট্কার প্রণয়-

কাহিনীই বা কেন করবে না ? বাঙলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসনের কথা, সেটা নির্ভর করবে তার দোষ গুণের উপরে—তা সাহিত্যের খাঁটি জিনিস, না মেকি মাল—তার উপরে।

এই ধর না কেন, কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাস যেমন রামায়ণ মহাভারতের গল্প নিয়ে বাঙলা রামায়ণ মহাভারত রচনা করলেন তেমনি যদি কোন কবি ইলিয়ড ও অডেসির গল্প নিয়ে বাঙলা মহা-কাব্য রচনা করেন, তুমি কি মনে কর তাহলে তা বাঙলা-সাহিত্যে ফেলা হ'য়ে থাকবে। বাঙালী-মনের এমন সংকীর্ণতা হবে না বলে' আমাদের সবারই প্রাণপণে আশা করা উচিত। তা যদি হয় তবে ইংরেজি-সাহিত্যে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেট, রোমিও-জুলিয়েত, ওথেলো ইত্যাদি নাকচ, বায়রনের ডনজুয়ান, চাইল্ড-হ্যারল্ড ইত্যাদি কাব্যগুলো নাকচ—ফরাসী-সাহিত্যেরও ঐ রকম অবস্থা দাঁড়াবে। তোমার সূত্র অনুসারে দেখতে পাচ্ছ জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি রকম একটা হুলুস্থূল বেধে যাবে। এর উত্তরে যদি বল যে, অন্য দেশের সঙ্গে বাঙলা দেশের তুলনা ! বাঙলা দেশ গড়ে' উঠেছে divine dispensation-এ। তবে অবশ্য নিরুত্তর হয়ে থাকা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। তবে এইখানে তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে—

"এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন !

*   *   *   *

থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোলে আম্রবন ছায়ে"

এ মনের ভাব মানুষের একটা চিরন্তন ভাব। "আম্রবন ছায়ে"র "ক্ষুদ্র কোণ" যতই গভীর কোণ হোক না কেন যতই মধুর কোণ

হোক না কেন, সেই খানেই মানুষের মন চিরকাল আঁটবে না, আঁটবে না। মানুষের জীবন-তারে গুণ গুণ করে একটা সুর চিরদিন, গুঞ্জিত হচ্ছে যদি কান পাততে জান তবে কান পেতে শোন, সে সুর হচ্ছে ঐ—

"এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেদুইন
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

এই সুর যে থামাতে চায় সে বৃহৎকেই থামাতে চায়, মহৎকেই অস্বীকার করতে চায়—এ যেন সান্ধ্য-আকাশের একটা মাত্র তারার পানে চেয়ে সমস্ত আকাশটাকেই ভুলে যাওয়া—সমস্ত আকাশটাকেই অস্বীকার করা।

সে যা হোক আমাদের সাহিত্যে নূতন ও পুরাতন এই শুক-শারীর দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আমার যা মনে হয় তা তোমায় স্পষ্ট করে' বলছি।

প্রথমে দু'দলের দু'জনা চরম পন্থীকে নেওয়া যাক। একজন বলছেন—আমাদের অতীতের অনুকরণ কর। আর একজন বলছেন—ইয়োরোপের অনুকরণ কর। আমার মনে হয় এ দু'জনের কেউই বর্ত্তমানে বাঙলা-সাহিত্যে কোন স্থায়ী সম্পদ দিতে পারবেন না। কেননা অনুকরণ কথাটার অর্থ হচ্ছে মানুষ যা নয় তারই খেলা করা—যে ভঙ্গীটা আত্মার নয় সেই ভঙ্গীটা তার মনের ভিতরে কল্পনা করে' তাই কালি কলমের সাহায্যে কাগজের উপরে আঁকা। কিন্তু সৎ-সাহিত্য, স্থায়ী-সাহিত্য হচ্ছে তাই যাতে ফুটেছে আত্মার চেহারা। কেননা এক আত্মাই হচ্ছে সৎ—আত্মাই হচ্ছে অজর, অমর, অক্ষয়, কাল তাকে ধ্বংস করতে পারে না, আগুন তাকে পোড়াতে পারে না। এ হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথা—যাঁকে আমরা পূর্ণ অবতার বলে মানি।

আসলে যে অতীতের ভিতর দিয়ে আমরা চলে' এসেছি সে অতীতকে আজ আমরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারব না, আর আজ যে বর্ত্তমানটা আমাদের সামনে এসে পড়েছে সেটাকে আমরা খুড়ি দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে পারব না। আর এতে অপমান বোধ করবারও কোন প্রয়োজন নেই বা এতে প্রাচীন ঋষিদের গৌরব ক্ষুন্ন হ'ল কল্পনা করে' চোখের জল ফেলবারও কোন কারণ নেই।

আমাদের অতীতকে যে আমরা খুলতে পারব না আর আমাদের বর্ত্তমানকে যে আমরা ভুলতে পারব না—ইচ্ছা করলেও নয়—এটা বিশেষ করে প্রমাণিত হয়েছে আমাদেরি সাহিত্য-সাধারণ-তন্ত্রের দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবন দিয়ে। একজন হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর একজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি মাইকেলের জীবনী জান। ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা এদেশে আমদানী হবার পর বিলিতি সভ্যতার ঢেউয়ে মধুসূদন যেমন নাকানি-চুবোনি খেয়ে ছিলেন বাঙলা দেশের কিম্বা সমস্ত ভারতবর্ষের আর কেউ তেমন খান নি। তাঁর আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছদ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছিল বিলিতি। কিন্তু তাঁর কলম থেকে স্থায়ী যা বেরুল তা হচ্ছে "মেঘনাদ-বধ"। আর এই "মেঘনাদ-বধ" কেউ যদি ইংরাজিতে অনুবাদ করে' বিলেতে ছাপান তবে তা পড়ে' এ কথা কেউ বলবে না যে তা একজন ইংরেজ কবির রচনা। মাইকেলের সার্ট-ওয়েষ্টকোট ফুঁড়ে যে আত্মা বেরিয়েছিল তা আর যাই হোক ইংলিশ-ম্যানের আত্মা নয়।

অন্যদিকে আবার আছেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলায় তাঁর যা ইংরেজি শিক্ষা হয়েছিল সেটা চাটনি হিসেবে। এ-দেশে ত তিনি

ইংরেজি শিক্ষার "পিল" বরদাস্ত করতে পারলেনই না, বিলেতে গিয়েও যে তিনি সে শিক্ষাকে মটন চপের মতো কাঁটা চামচের সাহায্যে নির্ব্বিবাদে উদরস্ত করতে পেরেছিলেন তা অন্তত তাঁর "জীবন স্মৃতি" পড়ে' মনে হয় না। তবুও আজ যদি কেউ তাঁর "গীতাঞ্জলি" মৈথিলি ভাষায় রূপান্তরিত করে তবে সেটা বিদ্যাপতির রচনা বলে' কেউ ভুল করতেন না নিশ্চয়।

রবীন্দ্রনাথ যে একজন বড় কবি এ কথা তুমি মান। তাঁর প্রতিভা অমানুষী এটাও তুমি স্বীকার কর। এই রবীন্দ্রনাথই একদিন বৈষ্ণব কবিতার রূপে গুণে মুগ্ধ হ'য়ে সেই সুর আপনার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজীয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তারই ফল হচ্ছে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"। এই "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়েসে যে মত প্রকাশ করেছেন তা তোমাকে এখানে শুনিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর "জীবন-স্মৃতি" তে লিখেছেন, "ভানুসিংহ যিনিই হৌন তাঁহার লেখা যদি বর্ত্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয় ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। * * * *। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা অর্গেনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।" এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ যে নিজের রচনা সম্বন্ধে কেবল বিনয়ই প্রকাশ করেছেন তা মনে করবার কোন কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণের গানে আজ আমরা "দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা সুর" দিতে পারি নে, কারণ এ যুগের আমরা রাধাকৃষ্ণকে ঠিক তেমনি সত্য করে'

পেতে পারিনে, যেমন করে' সে যুগের তাঁরা পেতেন। এই দেখছ না আজকাল আমরা রাধাকৃষ্ণের লম্বা-চওড়া আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে সুরু করেছি। আর এইটাই প্রমাণ যে আজকার আমাদের রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রেম বা ভক্তির জমাখরচের ফাজিল দাঁড়িয়েছে। আসলে ভক্তির চাইতে আমাদের জ্ঞানের দিকটা বেড়েই চলেছে। তাই আজ গাঁয়ের যমুনার কুলুকুলু রবই আমাদের দু' কান জুড়ে বসে' নেই, আজ ধরণীর সপ্তসিন্ধুর কলকল ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত ভরে' উঠেছে। ভক্তির দোষ সংকীর্ণতা—জ্ঞানের গুণ উদারতা। ভক্তির, সে হচ্ছে কূপ; জ্ঞানের সে হচ্ছে বারিধি। ভক্তির কূপ বলেই হয়ত তা শান্ত ও শীতল, কিন্তু শান্ত ও শীতলতাকে বড় করে বিশালতাকে কে অস্বীকার করবে?

এইখানে তুমি নিশ্চয় তর্ক তুলবে। তুমি বলবে যে রবীন্দ্রনাথের ছেলে বয়েসের কাঁচা রচনায় পাকা রঙের ও রসের আশা করা অন্যায়। এবং সেই আশা করে' এবং তাই না পেয়ে তারই উপরে সমস্ত বাঙালী কবির, তথা সমস্ত বাঙালী জাতির, mental Psychology-র ব্যাখ্যা দাঁড় করান কেবল তর্কে জয়লাভ করবার জন্যেই। তুমি হয়ত বলবে যে রবীন্দ্রনাথ যদি ঐ পথ প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতেন তবে হাত পাকবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কলমের মুখ থেকে এমনি সব পদাবলী ফুটে বেরুত যা "খেয়া"র সুর বা "গীতাঞ্জলি"র গানকে ছাড়িয়ে উঠত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা গোপবালাদের মতো সে যমুনা-পুলিনের পথ ধরে' চলল না এইটেই মস্ত প্রমাণ যে রবীন্দ্রনাথের তা সত্য নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথই কেন?—নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল থেকে আরম্ভ করে' সত্যেন দত্ত করুণানিধান

পর্য্যন্ত কারো কবি-আত্মাই যমুনা-পুলিনে কদম্ব-তরু ছায়ায় কলম নিয়ে বসে' গেল না। বসবে কি? যমুনা যে আজ শুকিয়ে উঠেছে— আর কদম্বের শাখা প্রশাখা দিয়ে হয়ত মালগাড়ীর "ওয়াগন" তৈরী হচ্ছে। তুমি কি মনে কর যে বাঙলার কবিরা সব যোট বেঁধে জোর করে' বাঙালীর শ্রেষ্ঠ ও গভীরতর সত্যটাকে অস্বীকার করে' আসছেন? আমি কিন্তু তা মনে করি নে।

মানুষের মধ্যে এক কবির জীবনেই কবি-আত্মার সঙ্গে তার বুদ্ধির সংগ্রাম সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হয় তবে কবি অ-কবিই হয়ে উঠতে পারেন, সু-কবি হন না। যা হোক মধুসূদন "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" লিখেছেন। কিন্তু শোন "ব্রজাঙ্গনা"য় তিনি লিখেছেন—

নাচিছে কদম্ব-মূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকা-রমণ।
চল সখি! ত্বরা করি দেখি গে প্রাণের হরি
ব্রজের রতন।

চাতকী আমি স্বজনি! শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক কুল, মন-তরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও-চরণ!

কিম্বা—

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে?

কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাকে এ বিরলে, সতি!
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে?
অভয়-হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না জানে বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে?

কিম্বা—

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি?
গোকুলের গাভীকুল দেখ, সখি, শোকাকুল,
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি।
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,
আইল গো-ধূলি, কোথায় রহিল মাধব?

কিন্তু আবার এর পরেই "বীরাঙ্গনা-কাব্য" থেকে শোন—

এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচ-কুলোদ্ভবা;
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুল-রাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল—কুসুম—ফল—পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বারে,—মহোৎসব যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে

রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট ; গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণাধ্বনি ?

আর বেশি শোনাবার দরকার নেই। একদিকে "ব্রজাঙ্গনা" আর একদিকে "বীরাঙ্গনা"। এ দুয়ের সুরে কোন প্রভেদ অনুভব করতে পারো ? কোন প্রভেদ দেখতে পাও ? এ দুই সুরে ঠিক সেই প্রভেদ, যে প্রভেদ মিথ্যা কথায় ও সত্যের বাণীতে। আসলে মধুসূদন যে ব্রজের গান গেয়েছেন সে গানে সুরও জমে নি আর তালও কেটেছে। তাতে আমাদের "দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা সুর" ফোটে নি। "ব্রজাঙ্গনা-কাব্য" বাস্তবিক পক্ষে ব্রজাঙ্গনাবধ কাব্য হয়ে উঠেছে।

আসলে আমাদের সাহিত্য সৎ হয়ে উঠবে সেইখানে, যেখানে আমরা সত্য। অতীতের বীজ আমাদের ধমনীতে ধমনীতে রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছেই, আর আজ আমাদের বাহিরে যে আলোক যে বাতাস রয়েছে, সেই আলোক সেই বাতাসে সেই বীজ যে আকারে ফুটে বেরুবে সেইটেই হবে আমাদের আসল সত্য। এই আজকার আলোকের পাত যদি আমরা আমাদের চোখে পড়তে না দিই, আজকার বাতাস যদি আমরা আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতে না দিই তবে আমাদের রক্তে সেই অতীতের বীজ পচে' উঠে আমাদের শরীর মনকেই দূষিত করবে, তাতে করে' সত্যই বল আর সমাজই বল দুয়েরই মরণের পথ ফলাও হ'তে থাকবে। ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের সনাতনত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধত্বই পাকা হয়ে উঠবে, যৌবন

তাকে কোন দিনই আক্রমণ করতে পারবে না। এটা অনেকের পক্ষে আরামের অবস্থা হলেও সকলের পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়।

মানুষ চলতে চলতে তার আপনার পরিচয় লাভ করে। মানুষের সাহিত্য হচ্ছে তার মনের চলার নিরিখ। ওই মনের চলা বন্ধ করবার ক্ষমতা কারোই নেই, কোন শাস্ত্রের পাতেও নেই, কোন অস্ত্রের হাতেও নেই। কেননা মানুষের চলাই হচ্ছে তার প্রথম সত্য। কারণ চলারই অর্থ হচ্ছে জীবনকে পাওয়া। আর এ সত্য মানুষের নিজের গড়া নয়—এ সত্য ভগবানের। এই জন্যে হাজার শাস্ত্রও আজ আমাদের বেঁধে রাখতে পারছে না—লক্ষ্য অস্ত্রও পারবে না।

"অতীত" যতই উৎকৃষ্ট, যতই মহান, যতই যা-কিছু হোক না কেন তার একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, তা "বর্ত্তমান" নয়। আর "বর্ত্তমানের" একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তা "ভবিষ্যতকে" গড়ে তুলতে পারে। "বর্ত্তমানের" এই সুবিধাকে আঁকড়ে ধরে' যদি আজ আমরা কাজে না লাগাই তবে হয়ত আবার আর একদিন আসবে যখন আবার "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলাধার পাত্র" এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যে আমাদের তর্ক করতে বসে' যেতে হবে। বর্ত্তমান যে অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ভবিষ্যতই কে গড়ে' তুলতে পারে এর জন্যে দোষী কাল। কাল জিনিসটার পিছনে ফেলে-আসা জিনিসের মধ্যে কিছুমাত্র মায়া নেই, তার সমস্ত অনুরাগ অনাগত যে তার জন্যে। মানুষের জগতের এই সব নিয়মকে যত দিন না এক নতুন বিশ্বামিত্র এসে উল্‌টে দিতে পারছেন ততদিন আমাদের সাহিত্যেও এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম কেউ করতে পারবে না। ব্যষ্টির জীবনে যাই হোক না কেন সমষ্টি-জীবনের দিক থেকে

এই কালের প্রভাবকে আমরা জানি বলেই 'কাল-মাহাত্ম্য' 'যুগ-ধর্ম্ম' ইত্যাদি কথাগুলো আমরা মানি।

তুমি হয়ত এখানে বলে' বসবে যে কালকেই কি বড় করে তুলতে হবে? মানুষের will বলে কি কোন পদার্থই নেই, পুরুষকার বলে' কি কোন বস্তুই নেই? কালকে পরম করে' দেখাও যা, দৈবকে চরম করে' মানাও তাই। আর খেতে শুতে উঠতে বসতে যেতে দৈবকে মেনে মেনেই ত এ জাতটা গেছে। জীবনকুমার, তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস ভুল পাঠ করেছ। দৈবকে মেনে মেনে এ জাতটা যায় নি, এ জাতটা গিয়েছে পুরুষকারকে না মেনে মেনে। তুমি নিশ্চয় বলবে যে আমি হেঁয়ালি আওড়াচ্ছি। কিন্তু তা নয়। আর ও-কথার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে: দৈবও সত্য, পুরুষকারও সত্য। কেন না ভগবানও আছেন আর মানুষও আছে। কেবল দৈবকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে জড়, আর খালি পুরুষকারকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে দানব। তাই বড় মঙ্গল সেইখানে যেখানে মানুষ ভগবানের সঙ্গে মিলেছে, মঙ্গলে জয় ও জয়ে মঙ্গল সেইখানে, যেখানে মানুষের পুরুষকারের দ্বারা দৈবই সার্থক হয়ে উঠছে, যেখানে ভগবানের গুপ্ত-বাণীকে মানুষ আপনার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পেরেছে। ওইখানেই মানুষের পরাজয় নেই, তার জয়ে অমঙ্গল নেই'। তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে সবার পক্ষে ভগবানের বাণী পাওয়া কি সম্ভব? তা সম্ভব নয় বলেই আমাদের সব সময় পুরুষকারকে জাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে করে আমাদের সে পুরুষকার আমাদের অজ্ঞাতসারেও ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হতে একটা সুযোগ পায়।

কিন্তু কোথায় বৈষ্ণবপদাবলী আর কোথায় পুরুষকার। হয়ত আরও কিছুক্ষণ কলম চালালে তার মুখে ভাষাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নেহাৎ পক্ষে প্রত্নতত্ত্ব কি ঐ রকমের একটা কিছু এসে যাবে। কাজেই আজ এই খানেই কসে' দাঁড়ি টানলুম। ইতি

তোমার সেকালের

মৃত্যুঞ্জয়।

মুক্তির ইতিহাস।

স্থষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে বলে', হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাণ্ডারীকে ডেকে বল্লেন, "ওহে ভাণ্ডারী, আমার কারখানা ঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের জোগাড় করে আন, আর একটা নতুন প্রাণী স্থষ্টি করব।"

ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বল্লে, "পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে' হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্ তেজ তলায় এসে ঠেকেচে। থাক্‌বার মধ্যে আছে মরুৎ-ব্যোম, তা' সে যত চাই।"

চতুর্ম্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চার জোড়া গোঁফে তা' দিয়ে বল্লেন, "আচ্ছা ভাল, ভাণ্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এস, দেখা যাক্!"

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি অপ্ তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিং, না দিলেন নখ, আর দাঁত যা দিলেন তা'তে চিবোনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগ্‌বার মত হল, কিন্তু তার লড়াইয়ের সখ

রইল না। এই প্রাণীটি হচ্চে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই এ'কে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাইহোক্, সৃষ্টিকর্ত্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুট্‌তে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী, কারণ উপস্থিত হলে, দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত সখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলি পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম্ হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি অপ্ তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এই রকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড় খুসি হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখ্‌তে ভাল বাসেন বলে এ'কে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুট্‌তে দেখে, মনে মনে ভাবে এটাকে কোনগতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাটকরার বড় সুবিধে!

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁখে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখ্‌লে হাতছাড়া হবে তাই ঘোড়াটার চারদিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, তার গুহা কেউ কাড়ল না। কিন্তু ঘোড়ার ছিল খোলা-মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মরুৎব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উস্কে দিলে কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

অত্যন্ত যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার পরে লাথি চালাতে লাগল। তার পা যতটা যখম হল দেয়াল ততটা হল না তবু চূণ বালি খসে' দেয়ালের সৌন্দর্য্য নষ্ট হতে লাগ্‌ল।

এতে মানুষের মনে বড় রাগ হল। বল্‌লে, "একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আটপ্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে!"

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এমনি উঠেপড়ে ডাণ্ডা চালালে যে ওর আর লাথি চল্‌ল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বল্‌লে, "আমার এই বাহনটির মত এমন ভক্ত বাহন আর নেই।"

তারা তারিফ করে বল্‌লে, "তাইত একেবারে জলের মত ঠাণ্ডা! তোমারই ধর্ম্মের মত ঠাণ্ডা!"

একে ত গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্যে লাথি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়া-পড়শিরাও ভাবে আওয়াজটা ত ঠিক ভক্তি-গদ্‌গদ শোনাচ্চে না।

মুখ বন্ধ করবার অনেক রকম যন্ত্র বেরল। কিন্তু দম বন্ধ না করলে মুখ ত একেবারে বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমূর্ষুর খাবির মত মাঝে মাঝে বেরতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বল্‌লেন, "নিশ্চয় তোমারি কীর্ত্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েচ!"

যম বল্‌লেন, "সৃষ্টিকর্ত্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ! একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ!"

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোট জায়গা, চারদিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করচে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বল্‌লেন, "আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মত ওর নখ দন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগ্‌বে না।"

মানুষ বল্‌লে, "ছিছি তাতে হিংস্রতার বড় প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েচি। খাসা আস্তাবল!"

ব্রহ্মা জেদ করে বল্‌লেন "ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।"

মানুষ বল্‌লে, আচ্ছা ছেড়ে দেব। কিন্তু সাত দিনের মেয়াদে, তার পরে যদি বল তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভাল নয় তাহলে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।"

মানুষ করলে কি, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু তার সামনের দুটো পায়ে কসে রসি বাঁধল। তখন ঘোড়া এমনি চল্‌তে লাগ্‌ল যে ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখ্‌তে পান, তার হাঁটুর বাধন দেখ্‌তে পান না। তিনি নিজের কীর্ত্তির এই ভাঁড়ের মত চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, "ভুল করেচি ত!"

মানুষ হাত জোড় করে বল্‌লে, "এখন এটাকে নিয়ে করি কি? আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে ত বরঞ্চ সেই খানে রওনা করে দিই।"

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বল্‌লেন, "যাও, যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে!"

মানুষ বল্‌লে, "আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা!"

ব্রহ্মা বল্‌লেন, "সেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

—— —:০:——

(১)

বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে সেনেট হলে পঠিত পাঁচটি প্রবন্ধই বোধ হয় ত্রিবেদী মহাশয়ের শেষ রচনা। এর সর্ব্বশেষ প্রবন্ধটি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বেদ ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী, তাঁর জন্মভূমির একটি বন্দনা দিয়ে শেষ করেন। এবং আমরা, তাঁর শ্রোতারা সমস্ত স্থানোচিত গাম্ভীর্য্য বিস্মৃত হয়ে' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে সভা ভঙ্গ করি। শুনেছি এই ঘটনাটি আমাদের দেশের দু'একজন যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ করেছে। যে ভাব ও যে ভাষা সেনেট হলের ভিতরকে তার বাহিরের দিঘির পার বলে' বিভ্রম জন্মায়, তা বিশ্ব-বিদ্যার আলয়ের উপযুক্ত কি না এ বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ উঠেছে। সে সন্দেহের নিরাসন কামনায় কোনও তর্ক তুলছি নে। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ খর্ব্ব করুক আর না-ই করুক এই ব্যাপারটি রামেন্দ্র-সুন্দরের সাহিত্য সৃষ্টির একটি মর্ম্ম কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন পণ্ডিত। সে পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা কোনও দেশেই সুলভ নয়। আধুনিক য়ুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদ ও বেদাঙ্গ—এদু'য়ের সঙ্গে কেবল তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নয়, মনের নাড়ীরও নিগূঢ় যোগ

ছিল। কিন্তু এ পাণ্ডিত্য তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে নি। এঃ বিদ্যাকে তিনি অতি সহজ লঘুভাবেই বহন করতেন। কারণ এই জ্ঞান বিজ্ঞান, বেদ বেদাঙ্গ সবই ছিল তাঁর সতেজ ও সবল মনের খাদ্য-পানীয়, সঞ্চিত ধনের বোঝা নয়। এই জন্য তার লেখার কোনও জায়গায় পাণ্ডিত্যের ছাপ ঠেলে ওঠে নি। তাঁর সজীব ও সরস মন পাণ্ডিত্যকে বাহন মাত্র করে' নিজেকেই প্রকাশ করেছে। তাই তাঁর সমস্ত রচনা তাঁর 'সুন্দর হাস্যে' উদ্ভাসিত, তাঁর চিরনবীন 'সুন্দর হৃদয়ের' 'মাধুর্য্য-ধারায় অভিষিক্ত'। তাঁর বৈজ্ঞানিক-নিবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান সমস্তই পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে সাহিত্য হয়ে' বিকশিত হয়ে' উঠেছে।

কলেজের পাঠ্যাবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ পাঠ্য ছিল জড়-বিজ্ঞান। এবং তাঁর প্রথমকার প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। আধুনিক বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রকৃতির কোন কোন মহলের দরজা খুলেছে, এবং কোন প্রাসাদে রাজ-কন্যারা জেগে উঠেছেন, কোথায় বা দৈত্য-দানবের ঘুম ভাঙছে; সেই বিচিত্র কাহিনী যুবক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সত্য-নিষ্ঠার কঠোরতায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরসতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য্য হাক্সলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়া এ গুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান-কাণ্ড এবং তাঁর আচার্য্যেরা ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের মনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি কতটা অধিকার করেছিল হেল্‌মহোৎসের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনী-প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় রেখে গেছেন। এই বিজ্ঞান চর্চ্চা ও বিজ্ঞান প্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের সমস্ত চিন্তা ও রচনাকে অনন্য

সাধারণ যুক্তির দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা দান করেছে। মতামতের সমর্থনে ও সমালোচনায় তাঁকে সমস্ত রকম অনুদরতা ও আতিশয্যের স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছে।

আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞান রামেন্দ্রসুন্দরের অতি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল। ডারুইন থেকে আরম্ভ করে' বাইস্‌ম্যান, ডিভ্রিস্, ও নব-মেণ্ডেলীয় পণ্ডিতেরা প্রাণের যে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচার করেছেন রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবুক মন তাতে গভীরভাবে সাড়া দিয়েছে। তাঁর সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা এই নবীন জীববিদ্যার প্রভাবে পরিপূর্ণ। প্রাণের বিকাশ ও বিকারের তত্ত্বের আলোতে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার উত্থান পতনের অন্ধকার পথ কতটা আলোকিত হয় তিনি পরম কৌতূহলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে সেটা পরীক্ষা করে' দেখেছেন। এই আলোচনাগুলি রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে সেতুর মতন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল-কুয়াশাহীন দ্বীপ থেকে যাত্রা আরম্ভ করে' তিনি এইখানে মানুষের অদৃষ্ট ভবিষ্যতের তমসাবৃত মহাদেশের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এ আলোচনাগুলি বিজ্ঞানের মাটিতে শিকড় গেড়ে দর্শনের আকাশে পাতা মেলেছে, এবং সাহিত্যের অমৃতরস এদের অক্ষয় নবীনতা দান করেছে।

অদীর্ঘায়ু জীবনের শেষভাগে ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর এই বিজ্ঞানের জ্ঞান, দার্শনিক-চিন্তা ও সাহিত্যের রস প্রতিভার রসায়নে একত্র মিশিয়ে বাঙলা-সাহিত্যকে এক অপূর্ব্ব সম্পদ দান করে' গেছেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপক সম্মিলনীতে অধ্যক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর অনেকগুলিই 'ভারতবর্ষ'

পত্রিকায় পরে ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল আমাদের নিত্য ঘরকন্নার ব্যবহারিক জগৎ, বিজ্ঞানের কল্পিত প্রাতিভাসিক জগৎ, এবং আধ্যাত্ম জ্ঞানের পারমার্থিক জগতের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক লোকে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতের যে মূর্ত্তি কল্পনা করে বা করতে বাধ্য হয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই একটু কেটে ছেঁটে, অল্প-বিস্তর মেজে ঘসে' নিজের কাজ আরম্ভ করেন। কেননা সে কাজই হল এই ব্যবহারিক জগতের বস্তু ও ঘটনার, স্থিতি ও গতির ব্যাখ্যা দেওয়া। কিন্তু এই ব্যাখ্যার পথে চলতে চলতে আধুনিক বিজ্ঞান এমন সব তত্ত্বের পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে যে তাদের সমাবেশে জগতের যে মূর্ত্তিটি গড়ে' ওঠে সেটি মোটেই আমাদের পরিচিত ব্যবহারিক জগতের মূর্ত্তি নয়। যে মূলের টীকা আরম্ভ হল, টীকা শেষ হলে দেখা গেল সে মূলই নেই। ফলে ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক জগতের ঠিক সম্বন্ধটা কি, এবং এই দুই কল্পিত জগতের কোন অংশটা কি অর্থে সত্য, এ সমস্যাটি দাঁড়িয়েছে যেমন কঠিন, তেমনি কৌতূহল-কর। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে পরমার্থিক সত্যের সম্বন্ধ অবশ্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রাচীন ও আদিম প্রশ্ন। কিন্তু বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগতটি মাঝে পড়ে' প্রশ্নটিকে আরও ঘোরাল করে' তুলেছে। অভিজ্ঞ লোকে জানেন, এই সমস্যা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের বোধ হয় সর্ব্ব-প্রধান আলোচ্য বিষয়। এবং পশ্চিমের বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনীষা এর আলোচনায় নিযুক্ত আছে। কিন্তু আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই কয়টি বাঙলা প্রবন্ধের চেয়ে এ সমস্যার অধিক সূক্ষ্ম, অধিক গভীর ও অধিক সরস আলোচনা য়ুরোপেরও কোনও

দেশের ভাষা দেখাতে পারবে কিনা সন্দেহ করা চলে। কেননা অধুনিক জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে যে নিকট পরিচয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চর্চ্চায় যে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ভাবপ্রকাশে সাহিত্যিকের যে শক্তি ও রস রামেন্দ্রসুন্দরে একত্র সমবেত হয়েছে বর্ত্তমান য়ুরোপের সারস্বত-সমাজেও তা সুদুর্লভ। আমাদের দুর্ভাগ্য রামেন্দ্র-সুন্দর এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ পরিণত গড়ন দিয়ে যেতে সময় পান নি। এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে একটা দেবার মত দানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

(২)

৺রামেন্দ্রসুন্দরের সব স্মৃতি সভাতেই বক্তারা তাঁর স্বদেশ-প্রীতির কথা তুলেছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান এখন আমাদের মনে কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে। অনুভবের শক্তি যার একেবারে লোপ হয় নি তার পক্ষেই বেশিক্ষণের জন্য দেশকে ভুলে থাকা অসম্ভব। এই বেদনার নিত্য অনুভূতি আমাদের স্বদেশ-প্রীতির প্রথম লক্ষণ। এ ব্যাথা রামেন্দ্রসুন্দরের মনে কত মর্ম্মান্তিক ছিল, তাঁর লেখার সঙ্গে অল্পমাত্রও যার পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন।

দেশের যাঁরা কর্ম্মী তাঁদের স্বভাবতই চেষ্টা হবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হীন বর্ত্তমানকে মহৎ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া। রামেন্দ্রসুন্দর লোকে যাকে কাজের লোক বলে ঠিক তা ছিলেন না। যে রজোগুণের প্রাচুর্য্য মানুষকে ক্ষণমাত্রও অকর্ম্মকৃৎ থাকতে ও কাজ ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পেতে দেয় না তাঁর প্রকৃতিতে সে রজোগুণের অভাব ছিল। ভাব ও চিন্তার

জগৎ ছাড়া কাজের জগতের চলাফেরা তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত না। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশপ্রীতি এক জায়গায় তাঁর এই প্রকৃতিকে জয় করেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-এর কাজে তিনি অক্লান্ত কর্ম্মী ছিলেন। তিনি এর জন্য অকাতরে নিজের সময় ও স্বাস্থ্য, দান করে' গেছেন। মনে হয় এ না হলে তিনি হয়ত জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে আমাদের আরও অনেক বেশি দিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু স্বদেশের যে ভাষা ও সাহিত্যের বিগ্রহকে তিনি বিশেষ ভাবে পূজা করতেন, তার কাজের আহ্বান রামেন্দ্রসুন্দর কোনও মতেই উপেক্ষা করতে পারেন নাই।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার উপর শ্রদ্ধা বোধ হয় আধুনিক হিন্দুর স্বদেশপ্রীতির একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। আমাদের দেশে এমন সব স্বদেশহিতৈষী আছেন যাঁদের অন্তরে এই সভ্যতার প্রতি বিন্দু-মাত্রও শ্রদ্ধা ও প্রীতি নেই। তাঁরা যে কথায় বা বক্তৃতায় এই সভ্যতায় গৌরব করেন না এমন নয়। কিন্তু যদি কোনও আলাদীন একরাত্রের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপকে (প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইংলণ্ডকে কেননা ইংলণ্ডের বাইরের য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় নেই) একবারে গোটা দেশের উপরে বসিয়ে দিয়ে যায়, তাতে তাঁরা হর্ষোৎফুল্লই হয়ে উঠবেন। এর অবশ্য এক কারণ—রুচির প্রভেদ, মানুষের সকল বিষয়েই যখন রুচির তফাৎ রয়েছে, তখন কেবল সভ্যতার বেলাতেই দেশের সকলের রুচি এক হবে এমন আশা করা চলে না। কিন্তু এর নিঃসন্দেহ প্রধান কারণ আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের একান্ত অভাব। যে

একমাত্র সজীব ও সবল সভ্যতাকে আমরা জানি সে হ'ল আধুনিক য়ুরোপের হালের সভ্যতা। এবং সে সভ্যতা যখন বর্ত্তমানে সাংসারিক হিসাবে অতি প্রবল তখন তাতে যে আমাদের মনকে মুগ্ধ এবং বাসনাকে প্রলুব্ধ করবে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টি কেবল হালের য়ুরোপেই একান্ত নিবদ্ধ ছিল না। এ সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল তার আস্বাদ তিনি বিশেষ ভাবেই পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতাগুলিরও তাঁর নিকট পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে তিনি জেনেছিলেন মানুষের সভ্যতার বিশালতা ও তার ইতিহাসের বৈচিত্র্য। সেইজন্য চোখের সামনে আছে বলেই বর্ত্তমান তাঁর কাছে অসঙ্গত রকম বড় হয়ে উঠতে পারে নি। প্রাচীন ও নবীন নানা সভ্যতার তুলনার ফলে তিনি প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার প্রতি অশেষ প্রীতিমান ও গভীর শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। অথচ সে প্রীতিতে কোনও মোহ ছিল না, সে শ্রদ্ধায় কোনও গোঁড়ামি ছিল না। এ হিন্দু-সভ্যতা যে বিশাল মানব-সভ্যতার একটা অংশমাত্র সে কথা তিনি কখনও ভোলেন নি। সেইজন্য ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে বৈদিক মতের অনুষ্ঠান ও তার আদর্শের সঙ্গে খৃষ্টির ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আদর্শের তুলনা করে' এ দুয়ের মধ্যে গভীর মিল দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিশ্বাসও তাঁর খুব দৃঢ় ছিল যে অভিজ্ঞের বিচারে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কোনও সভ্যতার কাছেই মাথা হেঁট করে' দাঁড়াতে হবে না। কেন না তিনি সেই ভারতবর্ষকে জেনেছিলেন যে ভারতবর্ষ বেদ ও উপনিষদ্ সৃষ্টি করেছে, কপিল ও শাক্যমুনিকে জন্ম দিয়েছে, যার কবি মহাভারত রচনা করেছে, যার

ঋষি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কোনও বিদ্যাকেই উপেক্ষা করে নাই; যে ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় দিগ্বিজয়ে গৌরব খুঁজেছে, যার রাজপুত্র রাজ্য ত্যাগ করে' প্রব্রজ্যা নিয়েছে। হিন্দুর এই প্রাচীন সভ্যতা রামেন্দ্রসুন্দরকে মুগ্ধ করেছিল, এবং তিনি তাঁর স্বদেশবাসিকে এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তার ফল তাঁর 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর বাঙলা অনুবাদ, তাঁর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ,' তাঁর বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ ও ব্যাখ্যা। তিনি বেঁচে থাকলে যে এই কাজেই তাঁর শক্তিকে বিশেষ করে' নিয়োজিত করতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ঋত বা নিয়মের তিনি উপাসক ছিলেন তাতে ব্যবস্থা অন্যরূপ। রামেন্দ্রসুন্দরের অকাল মৃত্যুতে দেশের এই ক্ষতিই বোধ হয় সব চেয়ে গুরুতর। ভাবহীন ও শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিত্যের হাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা কেমন মূর্ত্তি ধারণ করে তা আমরা জানি; এবং রুদ্ধচক্ষু শ্রদ্ধার কাছে তার কি লাঞ্ছনা তাও আমাদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু ভাবুক ও শ্রদ্ধাশীল চক্ষুষ্মান ও পণ্ডিতের মনে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার কি মূর্ত্তি বিরাজ করে রামেন্দ্রসুন্দর তার পরিচয় আমাদের দিতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবনাতেই তার যবনিকা পড়েছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে তার অপসারণেরও কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

১২ই জুলাই, ১৯১৯

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

ওমর-খৈয়াম।*

—ঃ*ঃ—

ফার্সি আমরা জানি নে, কিন্তু ও-ভাষার বড় বড় কবিদের নাম আমাদের সকলেরই নিকট সুপরিচিত। হাফেজ ও সাদীর নাম ভদ্রসমাজে কে না জানে? ওমর-খৈয়ামের নাম কিন্তু দু'দিন আগে এদেশে কেউ শোনে নি, এমন কি ফার্সি-নবিশেরাও নয়। যদিচ এযুগের সমজদারদের মতে তিনিই হচ্ছেন ইরাণদেশের সব চাইতে বড় কবি।

আজকের দিনে ওমর যে আমাদের একজন অতিপ্রিয় কবি হয়ে উঠেছেন, সে ইউরোপের প্রসাদে। ওমর প্রায় হাজার বছর আগে পারস্যদেশের নৈশাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তাঁর কবিত্বের খ্যাতি কালক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক্—সাহিত্যসমাজে তাঁর নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে এসেছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ-কবি ওমরকে আবিষ্কার করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর কবিতা ইংরাজিতে অনুবাদ করে' ইউরোপের চোখের সুমুখে ধরে দেন।

আকাশ-রাজ্যে একটি নূতন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কৃত হলে বৈজ্ঞানিক-সমাজ যেমন চঞ্চল ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, মনোরাজ্যে' এই নব-নক্ষত্রের আবিষ্কারে ইউরোপের কবি-সমাজ তেমনি চঞ্চল ও উৎফুল্ল

---

* শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত ওমর-খৈয়ামের "রুবেইয়াৎ" নামক কবিতা-গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ লিখিত। সঃ সঃ

হয়ে উঠলেন। ফলে এযুগে ইউরোপের এমন নগর নেই যেখানে এই নব কাব্যরসের ঐকান্তিক চর্চ্চার জন্য একাধিক কাব্যগোষ্ঠী গঠিত হয় নি। এই নব নক্ষত্রের একটি নব উপাসক-সম্প্রদায়ও সে দেশে গড়ে উঠেছিল, শুনতে পাই গত যুদ্ধে সে সম্প্রদায় মারা গেছে। সে যাইহোক, সেকালের এসিয়ার কবিতা একালের ইউরোপের হাতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং আমরাও তার অপূর্ব্ব রূপ দেখে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

(২)

এ কবিতার জন্ম হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। ওমর-খৈয়াম ছিলেন একজন মহা পণ্ডিত। তিনি সারা জীবন চর্চ্চা করেছিলেন শুধু বিজ্ঞানের, কাব্যের নয়। অঙ্কশাস্ত্রে ও জ্যোতিষে তিনি সেকালের সর্ব্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই জ্ঞান-চর্চ্চার অবসরে গুটি-কয়েক চতুষ্পদী রচনা করেন, এবং সেই চতুষ্পদীক'টিই তাঁর সমগ্র কাব্যগ্রন্থ। এত কম লিখে এত বড় কবি সম্ভবত এক ভর্ত্তৃহরি ছাড়া আর কেউ কখন হন নি। ভর্ত্তৃহরির সঙ্গে ওমরের আরও এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল আছে। উভয়েই জ্ঞানমার্গের কবি, ভক্তিমার্গের নন।

ওমরের সকল কবিতার ভিতর দিয়ে যা ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে মানুষের মনের চিরন্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন—

"কোথায় ছিলাম, কেনই আসা, এই কথাটা জানতে চাই

* * * *

যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে ?— * *

এ প্রশ্নের জবাবে ওমর-খৈয়াম বলেন—
"সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি, সত্যমিথ্যা কিছুই নাই"।

ওমর যে সেকালের মুসলমান সমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন, এবং একালের ইউরোপীয় সমাজে আদৃত হয়েছেন, তার কারণ তাঁর এই জবাব। যাঁরা মুসলমান ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে এ মত শুধু অগ্রাহ্য নয়—একেবারে অসহ্য; কেননা এ কথা ধর্ম্মমাত্রেরই মূলে কুঠারাঘাত করে। অপরপক্ষে এ বাণী মেনে নেবার জন্য এ যুগের ইউরোপের মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ইউরোপের মন একান্ত বিজ্ঞান-চর্চ্চার ফলে, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর তার প্রাচীন বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কোনও নূতন বিশ্বাস খুঁজে পায় নি। সুতরাং ওমরের কবিতায় বর্ত্তমান ইউরোপ তার নিজের মনের ছবিই দেখতে পেয়েছিল। এই হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুণ ওমরের বাণী ইউরোপের মনকে এতটা চঞ্চল করে তুলেছিল।

(৩)

এস্থলে কেউ বলতে পারেন যে "Vanity of vanities—all is vanity" এসিয়ার এই প্রাচীন বাণী ত দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের কানে পৌঁচেছিল। বাইবেলের একটা পুরো অধ্যায়ে (Ecclesiastes) ত ঐ কথাটারই বিস্তার করা হয়েছে, প্রচার করা হয়েছে; অতএব ওমরের বাণীর ভিতর কি এমন নূতনত্ব আছে যাতে-করে সে বাণী ইউরোপের মনকে এতটা পেয়ে বসেছে ?—

নূতনত্ব এই যে—ওমরের মতে, যে প্রশ্ন মানুষে চিরদিন করে' আসছে, বিশ্ব কোনদিনই তার উত্তর দেয় না, কেননা দিতে পারে না। তাঁর চোখে এই সত্য ধরা পড়েছিল যে, এ বিশ্বের অন্তরে হৃদয় নেই, মন নেই, এ জগৎ অন্ধ নিয়তির অধীন, সুতরাং তার ভিতর-বাহির দুই-ই সমান অর্থহীন, সমান মিছা। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে—

"ঊর্দ্ধে অধে, ভিতর বাহির, দেখ্‌ছ যা সব মিথ্যা ফাঁক,
ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী, পুতুল-নাচের ব্যর্থ জাঁক।"

* * * *

সত্য ফলের আশায় মোরা মরছি খেটে রাত্রিদিন
মরণ-পারের ভাবনা ভেবে আঁখির পাতা পলকহীন।
মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়েজ্জিনের কণ্ঠ পাই—
মূর্খ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই।"

অপরপক্ষে আমাদের দেশের রাজকবি ভর্ত্তৃহরির মত জেরুজিলামের রাজকবিরও মুখে, "Vanity of vanities—all is vanity" এ বাক্যের অর্থ "জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য"। অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইহুদী কবি দুজনেই এই বিশ্বের অন্তরে "এমন একটি সার সত্য, এমন একটি নিত্য বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন, যেখানে মানুষের মন দাঁড়াবার স্থান পায়, এবং যার সাক্ষাৎকার লাভ করলে মানুষ চিরশান্তি, চির আনন্দ লাভ করে"। ওমার খৈয়ামের মতে, ও হচ্ছে শুধু মানুষের মন-ভোলানো কথা—আসল সত্য এই যে, জগৎও মিথ্যা ব্রহ্মও মিথ্যা। পূর্ব্বোক্ত রাজকবিরা মানুষের চোখের সুমুখে একটি অসীম আশার মূর্ত্তি খাড়া করেছিলেন, ওমর-খৈয়াম করেছেন অনন্ত

নৈরাশ্যের। ওমরের বাণী আমাদের মনকে জাগিয়ে তোলে, কেননা এ যুগে আমরা কেউ জোর করে বলতে পারি নে যে, আমরা সৃষ্টির গোড়ার কথা আর শেষ কথা জানিই জানি।

(৪)

এতক্ষণ ধরে ওমরের দর্শনের পরিচয় দিলুম এই কারণে যে, এই দর্শনের জমির উপরই তাঁর কবিতার ফুল ফুটে উঠেছে। যাঁদের মতে "জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য", তাঁরা আমাদের উপদেশ দেন—

"মায়াময়মিদং অখিলং হিত্বা
প্রবিশাশু ব্রহ্মপদং বিদিত্বা।"

ওমরের মতে কিন্তু "মায়াময়মিদং অখিলং" হচ্ছে একমাত্র সত্য—অবশ্য সার সত্য নয়, অসার সত্য। তিনি তাই উপদেশ দিয়েছেন—

"এক লহমা সময় আছে সর্ব্বনাশের মধ্যে তোর,
ভোগ-সাগরে ডুব দিয়ে কর্ একটা নিমেষ নেশায় ভোর।"

বলা বাহুল্য ওমরের মুখে এ কথা হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী। এ জীবনের যখন কোনও অর্থ নেই, তখন যা ইন্দ্রিয়গোচর আর যা অনিত্য তাকেই বুকে টেনে নিয়ে আসা যাক্, তাকেই উপভোগ করা যাক্। ওমরের পূর্ব্বেও অনেকে মানুষকে এই উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কথার সঙ্গে ওমরের কথার অনেকটা প্রভেদ আছে। যাঁরা বলতেন "eat, drink and be merry, for to-morrow we die," তাঁরা বিশ্ব-সমস্যার দিকে

একেবারেই পিঠ ফিরিয়েছিলেন। আর প্রাচীন গ্রীসের Epicurean-রা যা-কিছু ইন্দ্রিয়-গোচর তাকেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিয়ে ইন্দ্রিয়-সুখের চর্চ্চাটা একটি সুকুমার বিদ্যা করে' তুলেছিলেন; এস্থলে বলা আবশ্যক যে, তাঁরা ইন্দ্রিয় অর্থে বহিরিন্দ্রিয় ও মানসেন্দ্রিয় দুই-ই বুঝতেন।—তাঁরা ছিলেন শান্তিতে, কিন্তু ওমরের হৃদয়মন চির অশান্ত। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যে ব্যর্থ—এ সত্য ওমর সন্তুষ্টমনে মেনে নিতে পারেন নি, এর বিরুদ্ধে তাঁর সকল মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে বিশ্বের বিরুদ্ধে মানবাত্মার বিদ্রোহ, উপহাস ও বিদ্রূপের আকারে ফুটে বেরিয়েছে, কিন্তু তাঁর সকল হাসিঠাট্টার অন্তরে একটি প্রচ্ছন্ন কাতরতা আছে,—এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। ওমর-খৈয়ামের কবিতা যে আমাদের এতটা মুগ্ধ করে তার প্রধান কারণ, তিনি দার্শনিক হলেও কবি, এবং চমৎকার কবি। দর্শন তাঁর হাতে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার আকার ধারণ করে নি, ফুলের মত ফুটে উঠেছে। এবং সে ফুল যেমন হাল্‌কা, যেমন ফুরফুরে, তেমনি সুন্দর, তেমনি রঙীণ। এর প্রতিটি হচ্ছে ইরাণদেশের গোলাপ,—এ গোলাপের রঙের সম্বন্ধে ওমর জিজ্ঞাসা করেছেন—

"কার্ দেওয়া সে লাল্‌চে আভা, হৃদয়-ছ্যাঁচা শোণিত-ছাপ"—

এর উত্তর অবশ্য—ওমর! তোমার। অথচ এই রক্তে-নাওয়া গোলাপগুলির মুখে একটি সহাস্য don't-care ভাব আছে। আর তাদের বুকে আছে একাধারে অমৃত ও হলাহলের মিশ্রগন্ধ—এক কথায় মদিরগন্ধ। ওমরের কবিতার রস ফুলের আসব, সে রস পান করলে মানুষের মনে গোলাপী নেশা ধরে এবং সে অবস্থায় আমাদের

মন থেকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের ভাবনাচিন্তা আপনা হতে ঝরে পড়ে।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ এই মন-মাতানো কাজ-ভোলানো কবিতাগুলি বাঙলা করে' বাঙালী পাঠক-সমাজের হাতে ধরে দিচ্ছেন; আশা করি সেগুলো সকলের আদরের ও আনন্দের সামগ্রী হবে, কেননা এ অনুবাদের ভিতর যত্ন আছে, পরিশ্রম আছে, নৈপুণ্য আছে, প্রাণ আছে। ওমর-খৈয়ামের এত স্বচ্ছন্দ ও স-লীল অনুবাদ আমি বাঙলা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখি নি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

উপকথা।

—ঃ*ঃ—

(ফরাসী হইতে অনুদিত)

ট্রাম।

একজন মজুর ছিল, খাট্‌তে যার জুড়ি আর কেউ ছিল না। আর তার স্ত্রী ছিল যেমন ভাল, তার ছোট্ট মেয়েটি ছিল তেমনি সুশ্রী। তারা বাস করত একটা মস্ত সহরের একটুখানি জায়গায়।

একবার একটি পরবের দিনে, তারা একটি কবুতর কিনে নিয়ে এল, তার কাবাব করবার জন্যে—এবং সেই সঙ্গে অল্পস্বল্প ভাল ভাল শাক-সবজিও। সে রবিবারে তাদের ক'জনের আনন্দের আর সীমা ছিল না, এমন কি বাড়ীর বিড়ালটি পর্য্যন্ত আড়চোখে সেই কবুতরের দিকে চেয়ে মনে মনে হেসে বল্‌লে যে, "আজ এমন হাড় চুষতে পাব, যার ভিতর রস আছে"!

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর বাপ বললে—

—"আজ যা'হোক কিছু পয়সা খরচ করে একটিবার আমরা ট্রামে চড়বই—এবং সহরের শেষ পর্য্যন্ত যাব।"

তারপর তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তারা চিরদিনই দেখে আসছে যে, ভাল ভাল পোষাক-পরা সাহেব মেমরা আঙুল তুলে ইসারা করবামাত্র কণ্ডাক্টর অমনি ঘোড়া রুখে ট্রাম থামায়—তাদের তুলে নেবার জন্য।

সেই বারোমাস খেটে-খাওয়া মজুরটি তার মেয়ের হাত ধরে আর তার স্ত্রীকে পাশে নিয়ে, একটি বড় রাস্তার একধারে গিয়ে দাঁড়ালে।

একটু পরেই তারা দেখতে পেলে যে একটি বার্নিসকরা চক্‌চকে ট্রামগাড়ি তাদের দিকে আসছে, তার ভিতর লোক প্রায় ছিল না বল্‌লেই হয়। তাই দেখে তাদের মহা আহ্লাদ হল—এই ভেবে যে, প্রতিজনে চার চার পয়সা খরচ করে' তারা আজ ট্রামে চড়ে সহর ঘুরে আসবে। অমনি তারা আঙুল তুলে ইসারা করলে—ট্রাম থামাবার জন্যে। কণ্ডাক্টর কিন্তু তাদের কাপড় চোপড় দেখে বুঝতে পারল যে তারা নেহাৎ গরীব, তাই সে অবজ্ঞাভরে তাদের দিকে চেয়ে ট্রাম আর বাঁধ্‌লে না, সটান চলে গেল।

মনীষা।

মানুষের মনের ঐশ্বর্য্য যে সব বইয়ে সঞ্চিত ছিল, সে-সব বই একদিন এক যাদুমন্ত্রে পৃথিবী থেকে উড়ে গেল।

তখন বিদ্বজ্জনের এক মহা সম্মিলনী হল। যাঁরা গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি শাস্ত্রের পারদর্শী, তাঁরা সকলে পরামর্শ করে একমত হয়ে বল্‌লেন—

মানব-প্রতিভার যা-কিছু শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি, সে-সকল আমাদের কাছে গচ্ছিত রয়েছে, আমরাই সে-সবের রক্ষক; অতএব আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সে-গুলো উদ্ধার করে, মার্বেল পাথরে খুদে রাখবো, যাতে করে সেগুলো আর লোপ না পায়;—অবশ্য মানব-প্রতিভার সেই সেই কীর্ত্তি, যার প্রতিটি হচ্ছে গগন-স্পর্শী। এ প্রস্তর-ফলকে জায়গা

হবে শুধু Pascal-এর একটি চিন্তার, Newton-এর একটি তারার, Darwin-এর একটি পতঙ্গের, Galileo-র একটি ধূলিকণার, Tolstoy-এর একটু করুণার, Henri Heine-র একটি শ্লোকের, Shakespeare-এর একটি মর্ম্মোচ্ছ্বাসের, Wagner-এর একটি সুরের।

অতঃপর তাঁরা যখন একাগ্রমনে তাঁদের স্মরণপথে আনবার চেষ্টা করলেন মানুষের মনের কেবল কোন্ কোন্ সৃষ্টি মানবজাতির মাহাত্ম্য-রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তখন তাঁরা সভয়ে আবিষ্কার করলেন যে, তাঁদের মাথার ভিতর কিছুই নেই,—সব খালি।

পশুর স্বর্গলোক।

একটা বন্ধ-গাড়ীতে যোতা বুড়ো-হাবড়া ঘোড়া, রাতদুপুরে একটি আমোদের আড্ডার দরজার সামনে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছিল আর ঝিমচ্ছিল। ভিতরে মেয়েপুরুষের হাসিতামাসা চল্‌ছিল।

সেই মড়া-খেকো হাড়-বের-করা কৃষ্ণের জীবটি, কতক্ষণে এদের আমোদ শেষ হবে, এবং সে আবার তার ভাঙাচোরা অতি নোংরা আস্তাবলে ঢুকতে পাবে, সেই অপেক্ষায় অতি ম্রিয়মান ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল,—কেননা তার পা আর তার শরীরের ভার বইতে পারছিল না।

আজ তার মনে তার ছোটবেলার স্মৃতি সব অস্পষ্ট স্বপ্নের মত ভেসে বেড়াচ্ছিল। তার মনে পড়ে গেল যে এক সময় সে ছিল লাল রঙের একটি বাচ্ছা, আর তখন সে সবুজ মাঠের উপর ছুটোছুটি

লাফালাফি করে বেড়াত, আর তার মা তার গা খালি ময়লা করে দিত, নিজের গায়ের ঘেঁস দিয়ে।

হঠাৎ সে সেই কাদায়-প্যাচ্‌পেচে রাস্তার উপর সটান শুয়ে পড়ে মরে গেল।

তারপর সে স্বর্গের দুয়োরে গিয়ে হাজির হল। একজন মস্ত পণ্ডিত, কতক্ষণে Saint Peter তাঁর জন্য দুয়োর খুলে দেন, তারি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সেই ঘোড়া বেচারাকে বললেন—

"তুই বেটা এখানে কি করতে এসেছিস?—স্বর্গে প্রবেশ করবার অধিকার তোর নেই—আছে আমার, কেননা আমি মানবীর গর্ভে জন্মেছি।

উত্তরে সেই হাড়-বের-করা ঘোড়া বেচারা বল্লে—

"আমার মা'র মন বড় নরম ছিল। সে পৃথিবীতে বুড়ী হয়ে যখন মারা গেল, তখন যত জোঁকে মিলে তার রক্ত শুযে খেলে। আমি ভগবানের কাছে শুধু জানতে এসেছি, সে এখানে আছে কি না"

তখন স্বর্গের দরজার দুই-পাল্লা একসঙ্গে খুলে গেল, এবং সুমুখে দেখা গেল রয়েছে পশুর স্বর্গলোক। ঘোড়াটি দেখলে যে তার মা সেখানে আছে। দেখবামাত্র তার মাও তাকে চিনতে পারলে, অমনি চিঁহি রবে দু'জনে দু'জনকে সাদর সম্ভাষণ করলে। তারপর তারা স্বর্গের প্রকাণ্ড ময়দানে বেড়াতে গেল। সেখানে গিয়ে এই দেখে তার মহা আহ্লাদ হ'ল যে, তার মর্ত্ত্যের কষ্ট-জীবনের পুরোনো সঙ্গীরা সবাই সেখানে মহাসুখে বাস করছে। পৃথিবীতে যারা সহরের সান-বাঁধানো রাস্তায় পাথর-বোঝাই গাড়ী টেনে বেড়াত, আর পা পিছ্‌লে ক্রমান্বয় হাঁটুর উপর বসে পড়ত, তারপর মারের চোটে আধমরা হয়ে গাড়ী ঘাড়ে

করে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ত; আর যারা চোখে ঠুলি পরে' দিন দশঘণ্টা করে ঘানি ঘোরাত; আর যে ঘোড়িগুলোর পিঠে চড়ে মানুষে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে যেত, আর ষাঁড়ের শিংয়ের ঘায়ে যাদের চেরাপেট থেকে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আখ্ড়ার তপ্তবালি ঝোঁটিয়ে যেত, আর তাই দেখে ভদ্র-মহিলাদের মুখ আনন্দে রাঙা হয়ে উঠত,—সেই সব ঘোড়া সেখানে ছিল। স্বর্গের সেই প্রকাণ্ড ময়দানে তারা চির শান্তির মধ্যে মনের সুখে চরে' বেড়াচ্ছিল।

তা ছাড়া সেখানে অপর সকল জন্তুরাও মহা স্ফূর্ত্তিতে ছিল। দিব্যি চিকন বেড়ালগুলো আপনভাবে বিভোর হয়ে খোসমেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা ভগবানের কথাও মানছিল না, আর তিনি তাদের এই অবাধ্যতা দেখে শুধু হাসছিলেন। তারা কটায় মিলে এক টুক্রো দড়ি নিয়ে এমন ধীরভাবে লঘু পদাঘাতে সেটিকে ঠেলছিল, যেন সে কাজের ভিতর এমন একটা মহা অর্থ আছে, যা তারা খুলে বলতে চায় না।

আর কুকুরগুলো সব বড় ভাল মা। তাদের সময় ত বাচ্ছা-গুলোকে দুধ দিতে দিতেই কেটে যাচ্ছিল। মাছগুলো সব সাঁতরে বেড়াচ্ছিল—ছিপের ভয় ত আর তাদের নেই। পাখীরা যার যেদিকে মন চায় সে সেদিকে উড়ে যাচ্ছিল,—ব্যাধের ভাবনা ত আর তাদের ভাবতে হয় না।

এই স্বর্গলোকে কোন মানুষ ছিল না।

জীবনের পথ।

একজন কবি একদিন কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন একটি গল্প লেখবার জন্য। তাঁর মাথায় সেদিন কোন আইডিয়াই এল না।

সেদিন কিন্তু তাঁর মন খুব প্রফুল্ল ছিল, কেননা জানলার ধারে একরাশ লাল ফুলের উপর সূর্য্যের আলো পড়েছিল, আর সেই খোলা জানলার নীল ফাঁকের ভিতর একটি সোনালি মাছি উড়ে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ তাঁর সমগ্র জীবনের ছবিটে তাঁর চোখের সুমুখে এসে দাঁড়াল। তিনি দেখলেন যে, সে একটি লম্বা সাদা পথ। সে পথ সুরু হয়েছে একটি অন্ধকার বনের গা থেকে, যার পায়ের কাছে জল খল্‌খল্ করে হাসছে; আর শেষ হয়েছে, শান্তিতে ঘেরা একটি ছোট্ট কবরে, যে কবরকে কাঁটাগাছ আর গাছের শিকড়ে চারধার থেকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে, জড়িয়ে ধরেছে।—

এইখানে তিনি সেই দেবতার সাক্ষাৎ পেলেন, জন্ম থেকে তাঁর জীবনের ভার যে দেবতার হাতে ছিল। সে দেবতার কাঁধে বোল্‌তার পাখার মত সোণালি রঙের একজোড়া পাখা ছিল। তাঁর মাথার চুল একেবারে সাদা, আর তাঁর মুখটি গ্রীষ্মকালের চৌবাচ্চার জলের মত স্বচ্ছ ও প্রশান্ত।

দেবতা কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"তুমি যখন ছোট ছিলে, তখনকার কথা কি তোমার মনে পড়ে?—তোমার বাবা নদীতে ছিপে মাছ ধরতে যেতেন, আর তোমার মা ও তুমি তাঁর সঙ্গে যেতে। আর এই জলের ধারে মাঠের উপর কত চমৎকার ফুল ফুটে থাকৃত, আর ফড়িঙরা সব লাফিয়ে বেড়াত, দেখে মনে হত যেন এখানে ওখানে ঘাসের ছেঁড়া পাতা সব চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।"

কবি উত্তর করলেন—"হাঁ, পড়ে"।

তারপর দুজনে একসঙ্গে গিয়ে সেই নীল নদীর ধারে দাঁড়ালেন। তার উপরে ছিল নীল আকাশ আর পাড়ে ঘোরনীল বাদামের গাছ।

—"তাকিয়ে দেখো, এই হচ্ছে তোমার শৈশব"।

কবি জলের দিকে চাইলেন আর অমনি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়্তে লাগল।

—"কৈ, আমি ত এ জলের ভিতর আমার বাপ-মার সস্নেহ মুখচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি নে? তাঁরা দুজনে এইখানে বসে থাকতেন। তাঁদের মনে কোনও পাপ ছিল না, ছিল শুধু শান্তি আর সুখ। আমার পরনের ধোপ কাপড় আমি কেবলি ময়লা করতুম, আর আমার মা বারবার তাঁর রুমাল দিয়ে তা' পরিষ্কার করে দিতেন।

"হে দেব আমাকে বলো, এই জলের উপর আমার বাপ-মার মুখের যে সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়ত, সে প্রতিবিম্ব কোথায় গেল? আমি তা দেখতে পাচ্ছি নে, গোটেই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।"

এই সময় খাসা এক থোকা বাদাম পাড়ের একটা গাছ থেকে খসে' জলের উপরে পড়ে' স্রোতের মুখে ভেসে যেতে লাগ্‌ল।

দেবতা তখন বল্‌লেন—

—"এই জলের উপরে-পড়া তোমার বাপ-মার মুখের ছবি, ঐ সুন্দর ফলগুলোর মতই স্রোতের মুখে ভেসে চলে গিয়েছে। কেননা সবই স্রোতে ভেসে চলে যায়, যার কায়া আছে তাও, আর যা ছায়ামাত্র তাও।' তোমার বাপ-মার ছবি জলে মিশেছে, যা অবশিষ্ট আছে তার নাম স্মৃতি।' তুমি ততটা অধীর হয়ো না, যাদের তুমি এত ভালবাসতে তাদের স্মরণ-চিহ্ন সব আবার দেখতে পাবে।"

একটা নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে এসে শরবনের উপর বস্‌ল। অমনি কবি বলে উঠ্‌লেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি এই পাখা দুটির উপরে আমার মায়ের চোখের রঙ চারিয়ে গিয়েছে"।

দেবতা বল্‌লেন—"ঠিক কথা, আর একটু ভাল করে চেয়ে দেখো।"

একটি গাছের আগ্‌ডালে একটি সাদা ঘুঘু তার বাসা বেঁধেছিল, সেখান থেকে সাদা রঙের একটি হালকা পালক উড়ে এসে জলের উপর পড়ে' পাক খেতে লাগ্‌ল।

কবি অমনি বলে উঠ্‌লেন—

—"এই পালকটির গায়ের এই শুভ্রতা, একি আমার মা'র অন্তঃকরণের নির্ম্মলতা নয়?"

দেবতা বললেন—"ঠিক বলেছ।"

তারপর একটু হাওয়া উঠ্‌ল, তার স্পর্শে জলের গায়ে কাঁটা দিলে, পাতার মুখে মর্ম্মর-ধ্বনি ফুটল।

কবি অমনি জিজ্ঞাসা করলেন—

—"এই যে মধুর ও গম্ভীর শব্দ আমার কানে আসছে, এ কি আমার বাবার কণ্ঠস্বর নয়?"

দেবতা উত্তর করলেন—"ঠিক বলেছ"।

* * * *

বেলা দুপুর হলো। নদীর একধারে কতকগুলো সরল গাছ ধীরে ধীরে হেল্‌ছিল আর দুল্‌ছিল। তাদের মধ্যে যেটি মাঠের একটেরে একা দাঁড়িয়েছিল, সেটিকে দূর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে যুবতীর মত দেখাচ্ছিল। তখন আকাশের আলো এমন সুন্দর হয়ে উঠেছিল

যে, মনে হচ্ছিল সে আকাশ যেন যুবতীর গণ্ডস্থলের রঙে রাঙানো হয়েছে।

তখন জীবনে সবপ্রথম যে তরুণীকে তিনি ভালবাসেন তার কথা কবির মনে পড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তাঁর বুকটি ব্যথায় ভরে' উঠ্‌ল।

দেবতা বল্‌লেন—

—"তোমার ঐ ভালবাসা ছিল এত নিরাবিল এবং এতে তুমি এত দুঃখ পেয়েছ যে, এর জন্য আমি তোমার উপর রাগ করি নি।"—

তাঁরা দু'জনে ধীরে ধীরে আবার অগ্রসর হতে লাগলেন, ক্রমে বেলা পড়ে এল; আকাশের আলো এত নরম, এত কোমল হয়ে এল যে, মনে হল সে আলো যেন ছায়া হয়ে উঠেছে। কবির কাতরতা দেখে দেবতা ঈষৎ হাস্য করলেন, রুগ্ন মাতার মুখের হাসির মতই তা সকাতর ও করুণ।

একটু পরে চারিদিকের নিস্তব্ধতার ভিতর তারাগুলো সব ফুটে উঠ্‌ল। আকাশ তখন সেই মৃত্যুশয্যার মত দেখাতে লাগল, যার চারদিকে বড় বড় মোমবাতি জ্বলেছে, আর যাকে ঘিরে রয়েছে শুধু শব্দহীন বুক-ভাঙা শোক। আর রাত্রি যেন শোকাভিভূতা বিধবার মত মাটিতে হাঁটুপেতে নতমুখে অবস্থিতি করছে।

দেবতা জিজ্ঞাসা করলেন—

—"এ দৃশ্য চিনতে পারছ?"

কবি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে মাটীতে হাঁটুপেতে নতমুখ হয়ে রইলেন।

অবশেষে তাঁরা যেখানে রাস্তার শেষ, সেই কবরটির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, যে কবরটিকে কাঁটা গাছ চারধার থেকে ঘিরে ফেলেছে আর গাছের শিকড় চারধার থেকে জড়িয়ে ধরেছে।

দেবতা তখন বললেন—

"আমি এসেছিলুম তোমাকে জীবনের পথ দেখিয়ে দিতে। এইখানে এই জলের ধারে তুমি চিরদিন ঘুমবে। আর এই জল প্রতিদিন তোমার কাছে বয়ে নিয়ে আসবে তোমার সব স্মৃতির ছবি—নীলকণ্ঠ-পাখীর সেই পাখা, যার রঙ তোমার মা'র চোখের মত; ঘুঘুর সেই সাদা পালক, যা তোমার মা'র অন্তঃকরণের মত নির্ম্মল; পাতার সেই মর্ম্মরধ্বনি, যা তোমার বাবার কণ্ঠস্বরের মত মধুর ও গম্ভীর; আর সেই সরল গাছ, যা তোমার প্রিয়ার মত লম্বা ও ছিপ্‌ছিপে।"

সর্ব্বশেষে আস্‌বে তারায় আলো-করা চিররাত্রি।

* * * *

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অতীতের বোঝা।

——ঃ০ঃ——
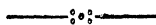
পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দের মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন। ইংরাজদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন নানা রকম রং মেখে সং সেজে উলঙ্গ শরীরে বন্য পশুর ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন তখন নাকি এদেশে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের আলোচনা হত। এই প্রাচীন সভ্যতার গৌরব নিয়ে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বেড়াই। কেউ কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পাড়্‌লে তখনই কোন না কোন বিদ্যা-দিগ্‌গজ চোখ রাঙিয়ে উত্তর দেন, "ও-সব আর বিলেত থেকে আমদানী কর্‌তে হবে না। ও-সব এবং আরও অনেক রকম জিনিস এ দেশে ছিল। পরের কাছে শোন্‌বার আর আমাদের কিছুই নেই। যা-কিছু থাকা উচিত বৈদিক-যুগে সবই ছিল। গোলযোগ ঘটেচে কেবল পৌরাণিক যুগে আর মুসলমান যুগে। তাই বলি আমাদের নূতন কিছু কর্‌তে হবে না, পুরোণো জিনিসগুলোর পুনরুদ্ধার কর্‌লেই সব চুকে যাবে।" বক্তৃতার সাথে কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোকের বাদাম-কিস্‌মিস্ মিশিয়ে পণ্ডিত ম'শায় নিরীহ শ্রোতার মানসিক ভোজনের মুখরোচক ব্যবস্থা করেন। শ্রোতা সাদা-সিধা লোক, এত বক্তৃতা, এত শ্লোক আওড়ান, হাত পা নাড়া এবং মুখ ভেংচানো দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়, ভাবে এর ভিতর কিছু সার না থাক্‌লে পণ্ডিতপ্রবর এতটা বাচালতা আর এতটা আত্ম-তুষ্টি

কখনই দেখাতে পারতেন না। শ্রোতার অত-শত ভাব্‌বার সময় নেই, পড়্‌বারও সময় নেই, আর আলোচনা কর্‌বার সময় তো নেই-ই। তা ছাড়া বেচারা সংসারি লোক, রুটিনের বাইরে যাবার ইচ্ছাও কম, আর সাহসও অল্প। পণ্ডিতের কথা তার মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক অলসতার অনুকূল হওয়ায় সে মাছের টোপ গেলার মত টপ করে সেটাকে গিলে ফেল্‌লে। ফলে পণ্ডিতের মর্য্যাদা বাড়্‌ল, নব্য-তান্ত্রিকদের যথেষ্ট নির্য্যাতন হল, এবং জন-সাধারণের পক্ষে নিরুদ্বেগে নিদ্রা দেবীর সুযোগ ঘটল।

(২)

ক্ষতি হল কিন্তু দেশের। প্রকৃতির একটা এই মহা দোষ যে, সে বক্তৃতা শোনে না। প্রকৃতি কোন দয়াময় সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হয়েচে কি অণু-পরমাণুগুলোর উদ্দেশ্য বিহীন আকস্মিক সংযোগে ঘটেচে, সে বিষয় দার্শনিকদের মধ্যে মস্ত মতভেদ আছে। আমার কিন্তু ধারণা যে বঙ্গদেশীয়দের মতে প্রকৃতির এই বক্তৃতার প্রতি বিরাগই তার অনৈশ্বরিক উদ্দেশ্যহীনতার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতির যদি মাথামুণ্ডু থাক্‌ত তাহলে আমাদের এত বড় বড় বক্তৃতা সত্ত্বেও আমাদের দেশের এত দুরবস্থা হবে কেন?

সত্য কথা এই যে, আমাদের এত জ্ঞান গরিমা সত্ত্বেও, সত্যের সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ অতি অল্প। এই সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাই আমাদের দুরবস্থার প্রধান কারণ। আমরা বক্তৃতা কর্‌তে শিখেচি, বিকট মুখভঙ্গি করে' ইংরাজি শব্দরাজির অপূর্ব্ব সমাবেশ

কর্‌তে শিখেছি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধান কর্‌তে, তাকে নতশিরে মেনে নিতে এবং তার প্রচারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হতে শিখি নি। সে শিক্ষা যদি আমাদের থাক্‌ত তাহলে ঐতিহাসিক কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রাচীন-কাল হতে আমরা খুঁজে খুঁজে কতকগুলো অসম্ভব তথ্য আমাদের আত্মশ্লাঘা চরিতার্থ কর্‌বার জন্যে বার কর্‌বার ভাণ কর্‌তাম না এবং সেই-গুলো নিয়েই অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে আধুনিক সমস্যা সকলকে উপেক্ষা করে "তাইরে-নারে-না" গেয়ে ঘুরে বেড়াতুম না। এরূপ ব্যবহার ব্যক্তি-গত কিম্বা জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নয়। যদি কিছুর পরিচায়ক হয় ত' সে জাতীয় দুর্ব্বলতার ও নিস্তেজতার।

(৩)

শুন্‌তে পাই, উঠ পাখি বিপদ দেখ্‌লে বালিতে মুখ লুকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনে করে চোখে দেখ্‌তে না পেলেই, আপদ দূর হল। আমরাও মনে করি চোখ বুজে থাক্‌লেই আমরা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে বেঁচে যাব। প্রকৃতিকে কিন্তু অত সহজে বোকা বানান যায় না। ভগবানের যাঁতা আস্তে আস্তে ঘোরে বটে কিন্তু শেষে গুঁড়ো করেই ছাড়ে।

পাঠক জিজ্ঞাসা কর্‌বেন যে, প্রাচীনদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ কর্‌লেই কি স্বভাবের নিয়ম ভাঙ্গা হল? আমার উত্তর এই যে, প্রাচীন কালের নজীরকে উপরোক্ত রূপ ভয় ভক্তি বিহ্বলনেত্রে দেখা এবং তার বিধানের পায়ে সসম্ভ্রমে আত্ম-সমর্পণ করা উন্নতির স্বাভাবিক নিয়মের লঙ্ঘন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল, দুই মুহূর্ত্তের

অবস্থা কখনো এক হয় না। আজিকার দিন কালিকার দিনের অবিকল নকল হতে পারে না, কারণ, আজ এবং কালের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘট্‌চে তার সমষ্টি আজকে কাল হতে বিচ্ছিন্ন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন করে' ফেলেচে; তার দরুণই আজ হচ্চে আজ, আর কাল হচ্চে কাল। কোন পার্থক্য না থাক্‌লে আমরা আজ আর কালের মধ্যে কোন মতেই প্রভেদ করতে পার্‌তাম না। বৈজ্ঞানিকের নজরে পৃথিবীর এক পলের অবস্থা আর এক পলের অবস্থা হতে বিভিন্ন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে মহাভারতের কিম্বা বৈদিক যুগের অবস্থার সঙ্গে আজিকার অবস্থার যে প্রভেদ আছে তাতে তো কোন সন্দেহই হতে পারে না। এ সব সূক্ষ্ম তর্ক ছেড়ে যদি ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করে' বিচার করা যায়, তাহলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে, ভারতের দুই যুগের অবস্থাতে প্রভেদ বিস্তর ও বিরাট। প্রাচীন কালে (যথা—মনুর যুগে) ভারতে এক হিন্দুজাতিরই বাস ছিল। মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেরা এখানে ছিল না। তখনকার নীতি-প্রবর্ত্তকদের কেবল এক হিন্দু-সমাজের কথা ভাব্‌তে হয়েচে। এখন কিন্তু দেশের অবস্থা একেবারে বদ্‌লে গেচে। এখন এদেশে হিন্দু ছাড়া মুসলমান পার্শী প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা বাস কর্‌চে। বিদেশীরা এখন এদেশের রাজা হয়েচেন। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এখন এদেশের লোকের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেচে। এই সব নূতন ঘটনা ঘটাতে দেশে নূতন নূতন জীবন সমস্যা এসে জুটেচে। এ সব সমস্যার কিরূপ মীমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু এবং তাঁহার সমসাময়িক লোকদের ভাব্‌বার সুযোগ হয় নি; সুতরাং এ সব বিষয় তাঁরা কিছুই লিখে যান নি। এখন হিন্দুদের নিজের বুদ্ধির

সাহায্যেই এ সব সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। মনু যখন হিন্দুর সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের প্রবর্ত্তন করেন, তখন ইয়োরোপের democratic হাওয়া এদেশেও আসে নি, এখন কিন্তু এসেচে এবং তেড়েই এসেচে। এখন হিন্দু যদি জাতিভেদের বাসি মড়া নিয়ে বসে থাকে তাহলে তার ভারতবর্ষ থেকে লোপ পাবারই সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ সকল সত্য হতে কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং সেটা এই যে, নূতন যুগের নূতন সমস্যার নূতন মীমাংসার দরকার।

(৬)

Experience একটি অমূল্য জিনিস। আমরা শিশু হতে বালককে, বালক হতে যুবককে এবং যুবক হতে বৃদ্ধকে অধিক জ্ঞানী এবং অধিক বিজ্ঞ বলে' মনে করি। এরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে, বালক অনেক জিনিস দেখেচে যা শিশু দেখে নি, যুবক অনেক জিনিস দেখেচে যা বালক দেখে নি এবং বৃদ্ধ অনেক জিনিস দেখেচে যা যুবক দেখে নি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বেড়ে যায়। এ হিসাবে প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান বেশি, অন্তত হওয়া উচিত। বেকন বলেচেন যাদের আমরা প্রাচীন বলি তাঁরা প্রকৃত পক্ষে শিশু ছিলেন। যেটাকে আমরা প্রাচীনকাল বলি সেটাকে পৃথিবীর বাল্যকাল বলা উচিত এবং সেই হিসাবে যাদের আমরা নবীন বলি তাদের প্রবীন বলা উচিত এবং যে যুগকে আমরা নব্য-যুগ বলি সেটাকে প্রাচীন যুগ বলা উচিত। প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের

অন্যূন তিন হাজার বৎসরের বেশি অভিজ্ঞতা আছে; সুতরাং আমাদের জ্ঞানও তাঁদের অপেক্ষা সেই হিসাবে বেশি হওয়া উচিত। অতীত হচ্চে মানব সভ্যতার শৈশব। শিশু স্নেহের পাত্র, ভক্তির পাত্র নয়। অতীতকে অবশ্য ভালবাসা উচিত, কিন্তু তাই বলে তার কাছে পদানত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(৪)

শক্তির চর্চ্চার ফলেই শক্তি বাড়ে। প্রাণী-জগতে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রাণী যখন কোন বিশেষ শক্তি বাড়াবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা কর্‌তে থাকে, তখন সেই শক্তিও তার আশ্চর্য্য রকমেই বেড়ে যায়। এই স্বাভাবিক নিয়মের বলেই হরিণ দৌড়তে শিখেছে, পাখী উড়্‌তে শিখেচে, আর মানুষ কথা কইতে শিখেচে। পক্ষান্তরে চর্চ্চা চলে' গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্ফুটিত শক্তিও ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হয়ে যায়, এমন কি শেষে সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েও যায়। এই সত্যের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাণী-জগতে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সমুদ্রে অনেক প্রকার জন্তু বাস করে, যাদের চোখ আছে অথচ তারা দেখ্‌তে পায় না। এক সময় তারা স্থলচর জন্তু ছিল এবং স্থলচরের জীবনোপযোগী ইন্দ্রিয় সকল তাদের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। তাদের বর্ত্তমান environment-য়ে ঐ সব পূর্ব্বার্জ্জিত শক্তি সমূহের ব্যবহার তাদের জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক হয় না, এর ফল এই হয়েচে যে, তাদের ঐ সকল অনাবশ্যকীয় ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল হয়ে হয়ে শেষে একেবারে বিকল হয়ে গেচে। এখন এ সবের দ্বারা কোন কাজ হয়

না, ও-গুলো যেন প্রাণীর পূর্ব্ব-জীবনের ইতিহাস, আমাদের জানাবার জন্য এখনও বর্ত্তমান রয়েছে।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যা বলা গেল তা মানসিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও সমান খাটে। মানুষের এই আত্ম-শক্তির চর্চ্চার পক্ষে তার অতীত হচ্চে একটা মস্ত বাধা। অতীতের প্রতি অতিভক্তি আর বর্ত্তমানের প্রতি অতি অভক্তি এদুই-ই হচ্চে একই মনোভাবের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। যে-জাতির বর্ত্তমানের উপর কোন বিশ্বাস নেই তার ভবিষ্যতেরও কোনো আশা নেই। আর বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানের উপর বিশ্বাস আর নিজের উপর বিশ্বাস একই বস্তু। আমরাই ত বর্ত্তমান। যে জাতি আমাদের মত অতীতকে আঁকড়ে ধরে' পড়ে' থাকে এবং পৈতৃক প্রথা নামক ঠাকুরের মন্দিরে সকাল সন্ধ্যে পূজো দেয়, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব সম্যক চর্চ্চার অভাবে নিস্তেজ হয়ে যায় এবং তারা অবনতির নিম্ন হতে নিম্নতর স্তরে স্বাভাবিক নিয়মে নামতে থাকে। এই জন্য দেখা যায় উন্নতিশীল জাতিরা প্রাচীন প্রথার কিম্বা প্রাচীন authority-র বিশেষ সম্মান করে না, করলে তাদের উন্নতিশীলতাই চলে যেত। তারা নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কার করে', নিত্য নতুন নীতির প্রবর্ত্তন করে', নিত্য নতুন তথ্য সংগ্রহ করে', আর নিত্য নতুন experiment নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যে দিন তারা এ সব ছেড়ে পুরাণ প্রথার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হয় সেই সেই দিন থেকেই তাদের উন্নতিশীল জীবনের সমাপ্তি হয়।

(৫)

প্রাচীন গ্রীসের কথা একবার মনে করুন। প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিত সোলোণকে (Solon) বলেন "তোমাদের গ্রীকদের চরিত্র

বালকের মত। তোমাদের মধ্যে না-প্রাচীনকাল-বিষয়ক জ্ঞান আছে, না-জ্ঞানের প্রাচীনতা আছে।" মিশরী যাকে নিন্দনীয় বলে' বিদ্রূপ করেন সেই গুণেরই বলে গ্রীস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। তাদের বাল-সুলভ চঞ্চলতা ও অসন্তোষই তাদের সভ্যতাকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে তুলেছিল। যেদিন তাদের এই বালস্বভাব তাদের পরিত্যাগ করলে, যে দিন তারা জাতীয় কৃতকার্য্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে পূর্ব্ব-কীর্ত্তির চর্ব্বিত চর্ব্বনে প্রবৃত্ত হল সেই দিন থেকেই গ্রীসের অধঃপাতের সুরু হল।

যা গ্রীসে ঘটেছিল আরবেও তাই ঘটেছে। একটি মেষ-পালক বর্ব্বর জাতি এক মহাপুরুষের অপূর্ব্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে "আল্লাহো আকবর" রবে সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলে। মহাপুরুষের দত্ত মন্ত্রের ভীমনাদে সেকালের রাজ্য সাম্রাজ্যগুলো বাষ্প-নির্ম্মিত সৌধসম আকাশে বিলীন হয়ে গেল। আরব সভ্য-জগতে প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন হয়ে মৃতপ্রায় সভ্যতাকে নব-জীবন দান করলে। দেশ বিদেশ দমন করে', পাহাড় পর্ব্বত লঙ্ঘন করে', সমুদ্র মহাসমুদ্র মন্থন করে', আরব যে সভ্যতা গড়েছিল, তা অপূর্ব্ব। আরবের এই উন্নতি পৈত্রিক প্রথার অনুসরণে হয় নি। হজরৎ মোহম্মদের পূর্ব্বকালিন অবস্থাকে তারা "আইয়ামে জাহেলিয়াৎ" (অন্ধকার যুগ) বল্‌ত। হজরতের সময় থেকে আরম্ভ করে প্রায় চারশত বৎসর পর্য্যন্ত আরবেরা ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই উন্নতির যুগে তারা নিত্য-নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিল এবং নানা দিকে নূতন নূতন Experiment করেছিল। তারপর প্রাচীনতার বাঁধ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। উন্নতির প্রবাহ বন্ধ হল। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ব্যবহার

জীবী (ফকিহ) এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের (মোহাদ্দেস প্রভৃতি) ইজ্জত বেশি হল। এই খানথেকেই আরবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

(৬)

সভ্যতা দেখ্‌তে পাই কালক্রমে এক জাতির হাত থেকে আর এক জাতির হাতে যায়, এবং তা হয়, যার হাতে যায় তার গুণে, আর যার হাত থেকে যায় তার দোষে। আরবের জরা-শিথিল হাত থেকে ইউরোপীয়রা সভ্যতার পতাকা কেড়ে নিয়ে দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হল। ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল। শ্রাবণের ধারায় স্ফীত স্রোতস্বতীর ন্যায় তাদের জীবন-স্রোত প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল। সে স্রোত এখনো থামে নি। তামসিক যুগে ইউরোপও আমাদের মত authority-র উপাসক ছিল। প্রাচীনকালের উপর সেখানেও তাদের আমাদেরই মত অটল ভক্তি ছিল। Aristotle-এর উপর কথা বলবার ক্ষমতা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই ছিল না। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের খামখেয়ালির উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেচে। এখন জীবনের সঙ্গে অতীতের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইউরোপীয়রা স্বীকার করেন না; তাঁরা এখন নিত্য নতুন সত্য আবিষ্কার কর্‌চেন, নিত্য নতুন জিনিসের নিত্য নতুন জিনিস নিয়ে experiment কর্‌চেন, এক নীতি ছেড়ে অন্য নীতি ধর্‌চেন; এইরূপে তাদের আশা ও উদ্যমপূর্ণ জীবন কেটে যাচ্চে। রোজই তাদের আত্মশক্তি বাড়চে বই কমচে না।

(৭)

ভারতবর্ষ যে এই প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তা নয়। ভারতের হিন্দুজাতির মধ্যেও একসময় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল। তখনও তাদের মধ্যে বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা আসে নি। যৌবন-সুলভ চঞ্চলতার প্রসাদে তারা নানা নীতির অনুসরণ করেছিল, নানা মতের প্রবর্ত্তন করেছিল, নানাবিধ সামাজিক বিধানের সৃষ্টি করেছিল এবং নৈতিক বৈজ্ঞানিক, কাব্য ও কলাবিষয়ক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় experiment করেছিল। ক্রমে তাদেরও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হল। জীবনে জড়তা এসে পড়্‌ল। ষোড়শোপচারে প্রাচীনতার পুজো আরম্ভ হল। ফলে এই হল যে, হিন্দুজাতি নির্জ্জীবতার একটা মস্ত উদাহরণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের Nation—হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুয়ে মিলে গঠিত। এই দুই সমাজই নিজেদের জীবনের মূল্য ভুলে গিয়ে প্রাচীন প্রথার অনুকরণের বৃথা চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করচে। এর ফল যে বিষময় হচ্চে, সে বিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার কোনো কারণ নেই। চোখ খুলে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন যে, এ পৃথিবী এক অনন্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র। এখানে মানুষে মানুষে, মানুষে পশুতে এবং পশুতে পশুতে জীবন-সংগ্রাম চলেচে। এই জীবন-সংগ্রামে যে জাতি নিত্য কালোপযোগী প্রথার উদ্ভাবন করতে পারে সে জাতিই টিকে যায়, অন্যেরা লোপ পেয়ে যায়। অতীতের গুরুভার ঘাড়ে করে যার পক্ষে চলাই কঠিন, তার পক্ষে এই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার আশা কোথায়? আমারা যে ভাবে চল্‌চি সে ভাবে আর ক'

দিন চল্‌বে? অতীতের বোঝা, মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি কি আমাদের শরীরে কখনই জন্মাবে না? কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি বিশেষ করে' হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ করছি। এদেশে হিন্দু মুসলমান দুজনেই নিজ নিজ অতীতের চাপে বসে পড়েচে, দুজনের দশাই সমান, এবং সে দশার নাম হচ্ছে দুর্দ্দশা।

ওয়াজেদ আলি।

নেশার জের।

——:#:——

তার নাম ছিল মিনা।

সে ছিল বিধবা ; সে ছিল যুবতী ; এবং সে ছিল সুন্দরী। তার গায়ে থাকত লেস বিরহিত সাদা ব্লাউজ ও পরণে থাকত পাড়-বিহীন সাদা রেশমের শাড়ী। বাহ্যিক আচার ব্যবহারে তার ব্রহ্মচর্য্যের লেশমাত্র ছিল না—অর্থাৎ সে সাবান মাখত, পান খেত এবং বেশ প্রসন্ন মনেই বিকালে ছাদে বেড়াত।

তার উপর সে ছিল বড়লোকের মেয়ে।

অতএব পাশের বাড়ীর মেসের ছেলেরা যে তার বিষয়ে পাঁচরকম ভাবত, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু তাদের, অন্তত তাদের মধ্যে একজনের ভাবনাটা যদি ভাবনাতেই থেকে যেত এবং লোভটা যদি ছাদের উপরে মিনাকে দেখেই চরিতার্থ হত, তা'হলে আর কিছু হোক আর না হোক, আমার এ গল্পটার সৃষ্টি হত না।

চিন্তা এবং কাজ, এ দুটোর মধ্যে যে বেড়াটা আছে; সেটা মেসের এক যুবক হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে দিলে এবং তার ফলে মিনার হাতে একখানা চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠিটা পড়ে তার মুখে যে একটা লালিমার আভা দেখা গিছ্‌ল, সেটা রাগে কি অনুরাগে—তা' বলা

বড় কঠিন; কেননা নারীর মনের খবর তাঁরা নিজেরা না দিলে স্বর্গের রিপোর্টারদেরও তা জানবার সম্ভাবনা নেই। এটা শাস্ত্রের বচন, অতএব সত্য।

কিন্তু যখন রোজ একখানা করে চিঠি আসতে লাগল তখন মিনার গণ্ডে লালিমার সঙ্গে ভ্রূযুগলেও কুঞ্চিত-রেখা ফুটে উঠতে লাগল। এর থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তার মনে বিরক্তির ভাবটা ঘনীভূত হয়ে আসছিল, কেননা ভ্রূকুটি বিরক্তির লক্ষণ। এটাও অলঙ্কার শাস্ত্রের ন অতএব গ্রাহ্য।

স্ত্রীলোকের সংসার-জ্ঞান, বয়সের অনুপাতে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে। তার উপর মিনা আজন্ম কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজেই বর্দ্ধিত। অতএব তার বাইশ বছরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যে মেসে-পালিত পঁচিশ বছরের পাড়াগেঁয়ে যুবকের চেয়ে বেশি হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি। কল্পনা দেবীর অনুগ্রহটাও ও-পক্ষের চেয়ে এ-পক্ষে একটু বেশি পরিমাণে পড়েছিল। সেইজন্যই মিনার মনে বিরক্তির সঙ্গে ভয়ের মিশ্রন একটুও ছিল না এবং ঠিক সেই কারণেই মেসের যুবকটির অন্তরে ভয়ের ভাব যথেষ্ট থাকলেও মিনার নীরব প্রত্যাখ্যানে বিরক্তির কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি।

এমন সময়ে এলাহাবাদ থেকে বৌদিদি চিঠি লিখলেন, "ঠাকুরঝি, তুমি যে ছোকরাটার কথা লিখেছ, তাকে আর প্রশ্রয় দিওনা। তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। বড় ঠাকুরকে বলে' তার একদিন চাবুকের ব্যবস্থা কোরো।" চিঠিটা পড়ে মিনার মুখে একটুও চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গেল না। সে উত্তরে লিখলে, "তার দরকার হবে না, বৌদি। আমিই তাকে শিক্ষা দেবো।"

(২)

দু'দিন পরে মিনা বৌদিকে পুনরায় চিঠি লিখলে—

—"তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। কাল বিকালে সে এসেছিল। দক্ষিণের পড়বার ঘরটাতে তার জন্যে সত্যিকারের জলখাবার সাজিয়ে রেখেছিলুম। সে তো ঘরে ঢুকে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেছ্‌ল—বসবে কি দাঁড়াবে, নমস্কার করবে কি, না করবে—কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিল না। আমি খাবারের দিকে দেখিয়ে দিতেই সে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে ভোজন স্থুরু করে দিলে। খাবার সময়ে তার হাতটা মুখে তোলবার ভঙ্গী এবং খাওয়ার ফাঁকে আমার দিকে মাঝে মাঝে মুখ তুলে চাইবার ধরণ—এর মধ্যে কোনটা যে বেশি বিশ্রী ঠেকছিল, তা' বলা বড় শক্ত। আমি তাকে একেবারেই "তুমি" বলে সম্বোধন করে বসলুম। এতে চমকে যেওনা। ও-সম্বোধনটা প্রেমাস্পদেরই একচেটে নয়—বাড়ীর সরকার, লোকজন এবং তাদেরই সমপদস্থ বাইরের লোকেরও ও-সম্বোধনটাতে একটা দাবী আছে। সে আমাকে কিন্তু "তুমি" বলতে সাহস করে নি এবং প্রতি কথার গোড়ায় "আজ্ঞে" বলে ভণিতা করেছিল। হ'রে চাকরের চেয়ে সভ্য বটে—যে "এজ্ঞে" বলে কথা আরম্ভ করে। যাই হোক, তার কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিলুম এবং তাকেও অনেক কথা জানিয়ে দিলুম। তার নাম গোবর্দ্ধন কি জনার্দ্দন, কি ওই রকম একটা কিছু। তবে যে চিঠিতে "দিব্যেন্দুসুন্দর" বলে' সই করা ছিল—তার কারণ আর কিছুই নয়—ক'লকাতার মেয়েরা সে-কেলে নামগুলো পছন্দ করে না বলে'।

আমার সম্বন্ধে তার ইচ্ছাটা ছিল শুভ ;—অর্থাৎ ডাক্তারি কলেজের ছেলে হলেও আমার উপর অস্ত্র-প্রয়োগ করবার ইচ্ছা তার কোন কালেই ছিল না অথবা আমার গয়নাগুলো বিক্রি ক'রে ডাক্তারখানা খোলবার মৎলবও তার মনে কখনো ওঠে নি। আমাকে তার বিয়ে করবারই অভিপ্রায় ছিল। ব্যাপারটা একবার কল্পনা কর দিকিন্। একটা এঁদো গলির ভিতর একখানা ভাঙ্গা বাড়ী—তার মধ্যে এই গোবর্দ্ধন বা জনার্দ্দন-নামা স্বামী-দেবতার সঙ্গে আজীবন বাস। হাঁটুর উপর-ওঠা কাপড় পরে' প্রত্যহ তাঁর বাজারে গমন এবং বাজার থেকে ফিরে এসে' মুটের সঙ্গে এক পয়সার হিসেব নিয়ে বাকযুদ্ধ!............

তাকে তার সদভিপ্রায়ের জন্য ধন্যবাদ দিলুম। তাকে বললুম বিয়ে হয় কি ক'রে ?—বিধবার বিয়ে হতে গেলেও জাতটা তো ভিন্ন হলে' চলবে না। সে বললে—কেন, আপনারা তো আমাদের পাল্‌টি ঘর। বললুম—তা' হ'তে পারে ; কিন্তু তবুও তো একজাত নয়। কেন যে নয়, সেটা তাকে বোঝাতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। অবস্থার তফাৎটাই যে আসল জাতের তফাৎ—অন্তত আমার যে তাই ধারণা—তা' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকটির মস্তিষ্কে শেষ পর্য্যন্ত ঢোকাতে পেরেছিলুম কি না সে বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে। সে তো এক মহা বক্তৃতা জুড়ে দিলে—খুব উচ্ছ্বাসময় এবং খুব সম্ভব আগে থাকতে মুখস্থ করা। তার মোদ্দাখানা এই যে, প্রেমেতে ও-সমস্ত বৈষম্য ঢাকা পড়ে' যায়। এ হচ্ছে আসলে যেটা প্রশ্ন, সেটাকে উত্তর বলে মেনে নেওয়া। তবে এ-ক্ষেত্রে ওটা জ্ঞানের অভাব কি প্রেমের স্বভাব—সেটা বুঝতে পারলুম না। বললুম—কাল্‌-চারের বৈষম্যে প্রেম তো জন্মাতেই পারে না—অন্তত জন্মান উচিত

নয়। সে তখন একটু গরম হয়ে' বললে—"আপনারা আমাদের নিতান্তই অসভ্য বাঙাল, নয় তো পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে' মনে করেন—না? আমি বললুম—শুধু যে মনে করি তা' নয়, মুখেও বলি। তবে জ্যান্ত মানুষকে "ভূত" না ব'লে "অদ্ভুত" বলি।" সে তখন মহা রেগে উঠেছে। বললে—"আমায় এ-রকম অপমান করবার মানে কি? আমিও যদি জানিয়ে দি যে আপনি আজ আমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করেছেন, তাহলে আপনার মুখ থাকে কোথায়?" এ-ধরণের লোকেদের ভদ্রতার মুখোসটা কত সহজে খসে' পড়ে দেখছ! তার যা' প্রতীকার আমার হাতে ছিল—সেইটে তাকে জানিয়ে দিয়ে বেশ শান্তভাবেই বললুম—"প্রাণী বিশেষকে মারা বড় শক্ত নয় তবে নিজের হাতে গন্ধটা থেকে যায় এবং ও-জাতের গন্ধের উপর আমার একটা চিরকেলে বিতৃষ্ণা আছে। অতএব—।" আর কিছু শোনবার অপেক্ষা না রেখেই সে পলায়ন দিলে। ভাগ্যিস জলখাবারটা খেয়ে গিছ্‌ল—তা' নইলে বেচারার কি কষ্টই হত!"

(৩)

সেই দিনেই মেসে ফিরে এসে দিব্যেন্দুসুন্দর ওরফে গোবর্দ্ধন বা জনার্দ্দন সকলকে জানিয়ে দিলে যে, সে তার পরদিনই দেশে ফিরে যাবে কারণ এখানে তার "নোনা" লেগেছে। কলকাতার জল খারাপ, হাওয়া খারাপ, ক'লকাতাটা নরকেরই প্রতিরূপ—ইত্যাদি।

পরদিনেই দেশে ফিরে গিয়ে সকলকে জানালে যে, সে ক'লকাতা একেবারেই ত্যাগ করে এসেছে। এখানে মাইনর ইস্কুলের একটা মাষ্টারি করে খাবে তবু আর ক'লকাতায় ফিরবে না। সেখানে তার

একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আর কি? সে একরকম জোর ক'রেই পালিয়ে এসেছে। ক'লকাতার লোকেরা সব করতে পারে। আর তাদের মেয়েদের তো জান না। তারা সকলেই—ইত্যাদি।"

তার কিছুদিন পরেই ভাজ এসে ননদকে জড়িয়ে ধরে বললে, "আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছিস ভাই। লোকটার কি আস্পর্দ্ধা!" ননদ আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু হাসলে, আর সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়ল বোধ হয়।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্য-চর্চ্চা।*

—:০:—
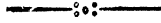
(G. Lanson-র ফরাসী হইতে)।

সেকেলে ভূমিকার সরল পন্থানুসরণ করে' আমি এই বই* "যারা পড়ে"—অর্থাৎ যারা আমাদের ফরাসী লেখকদের লেখা পড়ে, তাদের হাতে দিলুম। অল্পবয়সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য যারা সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করে, আমাদের ইস্কুলকলেজের সেই ছাত্রছাত্রীদের, আশা করি, এই বইখানি কাজে লাগবে; বিশেষ করে' এই জন্যই আরও কাজে লাগবে যে, কেবলমাত্র তাদের কাজে লাগবার জন্য, তাদের পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে মুখস্থ করবার জন্য, বা তাদের আমোদ দেবার জন্য এ বই লেখা হয় নি। যে ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস সকল শিক্ষিত বা শিক্ষাভিলাষী ব্যক্তির উদ্দেশে রচিত, যার পাঠে তাদের বিদ্যানুশীলনকে নিঃস্বার্থতর উদারতর করে' তুলবে, এমন একটি বই আমাদের ছাত্রদের হাতে দেওয়ার চেয়ে কি বেশি মহৎ উপকার আমি তাদের করতে পারি তা' ত জানি নে। পরীক্ষার পড়া তৈরি করবার সময় তারা যদি ভুলতে পারে যে তারা পরীক্ষার্থী, যদি কেবল সাহিত্য-চর্চ্চার উদ্দেশ্যেই সাহিত্য-চর্চ্চা করতে পারে, তাহলে তারা পরীক্ষার অতিরিক্ত সাফল্য লাভ করবে।

---

* ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস।

আমি কি করতে সক্ষম হয়েছি তার বিচারের ভার অন্যের হাতে, আমি শুধু কি করতে চেয়েছি, কোন্ ভাবের বশবর্ত্তী হয়ে' এই কার্য্যে ব্রতী হয়েছি, তারই হিসাব দিতে পারি।

একালে সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা একটা মস্ত ভুল ধারণা অনুসারে করা হয়। ও-বস্তুর যেন একটা বাঁধা তালিকা আছে, যেটা যেন-তেন-প্রকারেণ যত শীঘ্র সম্ভব আদ্যোপান্ত চোখ বুলিয়ে সাঙ্গ করে' গলাধঃকরণ করা চাই, যাতে "ফেল মারতে" না হয়; তারপরে জন্মের মত তার সঙ্গে এবং তার আর পড়াশুনার সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়ে শোধবোধ হয়ে' যায়, চিরজীবন আর ভুলেও সেদিকে মন যায় না। এই রকম করে' সব শিখতে এবং সব শেখাতে গিয়ে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞতার ফাঁক না দিলে, ফলে আনুষ্ঠানিক জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু ছাত্রের মনে সাহিত্যের রসবোধ কিছুমাত্র জন্মায় না; সাহিত্য কতকগুলি শুষ্ক তথ্য ও সূত্রের সমষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়, এবং যে সকল রচনার ব্যাখ্যা তা'তে করা হয়, সেগুলির প্রতি শিক্ষিতদের চিত্তে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা জন্মাবার কথা।

এই গুরুমশায়ী ভ্রান্তিটি আর একটি গভীরতর, ব্যাপকতর ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি অতীব সাংঘাতিক কুসংস্কারবশত সাহিত্যকে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা হয়েছে; সাহিত্যের বিশেষ জ্ঞানেরই একটা বিশেষ মর্য্যাদা দাঁড়িয়ে গেছে; এবং এজন্য স্বয়ং বিজ্ঞান কিংবা বৈজ্ঞানিকরাও দায়ী নন। দুঃখের সহিত স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, Renan উক্ত ভুল ধারণার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর "বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ" নামক গ্রন্থে তিনি যে কথাটি লিখেছেন, সেটি তাঁর অল্পবয়সের উৎসাহের নিদর্শন বলে',

বিজ্ঞান-চর্চ্চায় নূতন ব্রতীর অতিশয়োক্তি বলে' মেনে নেওয়াই ভাল। কথাটি এই,—"মানবের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাহিত্য-চর্চ্চার স্থান ভবিষ্যতে অনেকপরিমাণে সাহিত্যের ইতিহাস-পাঠের দ্বারা অধিকৃত হবে।" এই কথাটি একেবারে সাহিত্য-চর্চ্চার মূলে কুঠারাঘাত করে। এতে কেবলমাত্র ইতিহাসের একটি শাখারূপে সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়,—তা নীতির ইতিহাসই হোক্, আর ভাবের ইতিহাসই হোক্।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক পাতানো যতটা আবশ্যক, তার ইতিহাস এবং সারমর্ম্মের সঙ্গে তার সিকির সিকিও নয়। চারুশিল্পের ইতিহাস পাঠ করলেই যে ছবি এবং মূর্ত্তি চোখ চেয়ে দেখার কাজ হয়ে যায়, এ কথা বোধ হয় কেউ মানবে না। শিল্পেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, রচনা বিশেষকে বাদ দিলে চলে না; কারণ প্রতি রচয়িতার বিশেষত্ব সেই রচনার মধ্যে নিহিত থাকে, এবং তারই দ্বারা প্রকাশিত হয়। মূল বাক্যাবলীর পাঠে মানুষের মনে ঔৎসুক্য জন্মানো যদি সাহিত্যের ইতিহাসের চরম লক্ষ্য না হয়, তাহলে সে ইতিহাস পাঠে যে জ্ঞানলাভ হয়, সে জ্ঞান যেমন নীরস তেমনি অসার। উন্নতির নাম করে' আমাদের ভোগা দিয়ে মধ্যযুগের সেই জ্ঞানের কার্পণ্যের দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যে-সময় এক অঙ্ক এবং সব বিষয়ের সারতত্ত্ব বই লোকে আর কিছু জানত না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মূল গ্রন্থের অনুশীলন এবং টীকা-ভাষ্যের বর্জ্জন দ্বারাই ইতালীয় নবযুগ শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতীত্ব লাভ করেছিল।

অবশ্য আজকালকার দিনে সাহিত্য-চর্চ্চা করতে গেলে পাণ্ডিত্যের

সহায়তা চাই ; আমাদের বিচারবুদ্ধির স্থাপনা ও চালনা করবার জন্য কতকপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট এবং নিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আর সে-সকল প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়, যার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগপূর্ব্বক আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাবগুলিকে সুসম্বদ্ধ করা, এবং সাহিত্যের গতি, বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু দুটি জিনিস যেন আমরা সর্ব্বদা মনে রাখি— সাহিত্যের ইতিহাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি-বিশেষত্বের বর্ণনা, এবং তার ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অনুভূতি। জীবজগতের কোন-একটি বিশেষ শ্রেণীর জ্ঞানলাভ করা তার লক্ষ্য নয়,—তার লক্ষ্য Corneille, তার লক্ষ্য Hugo এবং যে-সব অভিজ্ঞতা ও প্রণালী সকলেরই আয়ত্তাধীন, যার দ্বারা সকলেই সমান ফল পায়, তার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না ; সিদ্ধ হয় সেই সকল অনুভূতির দ্বারা, যা' মানুষে মানুষে বিভিন্ন, এবং যার ফল আপেক্ষিক ও অনিশ্চিত হওয়া অনিবার্য্য। হিসাবমত ধরতে গেলে, সাহিত্য-জ্ঞানের উদ্দেশ্যই বল, উপায়ই বল, কোনটিই পুরোদস্তুর বৈজ্ঞানিক নয়।

শিল্পে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, রচনা-বিশেষকে অগ্রাহ্য করলে চলে না ; কারণ তার শক্তি ও সৌন্দর্য্য অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট, এবং কেউ বলতে পারবেন না যে তিনি নিঃশেষে তার সারসঙ্কলন করেছেন, কিংবা তাকে ধরবার সূত্র বানিয়েছেন।—অর্থাৎ সাহিত্য একমাত্র জ্ঞানের অধিগম্য নয় ; সাহিত্য হচ্ছে চর্চ্চা করবার, উপভোগ করবার জিনিস। ও-বস্তু জানতে হয় না, শিখতে হয় না ; তা' সাধনা করতে হয়, অনুশীলন করতে হয়, ভালবাসতে হয়। Descartes সাহিত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেইটিই সব চেয়ে সত্য কথা ;—ভাল

বই পড়া মানে হচ্ছে সেকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলা, এবং সে কথোপকথনে তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের শ্রেষ্ঠ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

আমি কোন কোন অঙ্ক-শাস্ত্রীকে জানি, যাঁরা সাহিত্য-চর্চ্চায় আমোদ পান, যাঁরা চিত্তবিনোদনের জন্য নাট্যাভিনয় দেখতে যান, বা একটু ফাঁক পেলেই একখানি বই নিয়ে পড়তে বসেন; আবার এমন সাহিত্যিকও জানি, যাঁরা পড়েন না, কিন্তু সাহিত্যের খোসা ছাড়িয়ে নেন, এবং যা-কিছু ছাপানো জিনিস তাঁদের হস্তগত হয়, তাকে খেলার কড়িতে পরিণত করাই কর্ত্তব্য মনে করেন। এ দুই দলের মধ্যে প্রথমোক্ত দলই সত্যের পথে অধিক অগ্রসর হয়েছেন বলে ত আমার বিশ্বাস। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আমাদের আমোদ দেওয়া; কিন্তু সে আমোদ মানসিক, সে আমোদ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির খেলা হতে উৎপন্ন। এবং তার ফলে সে বৃত্তিগুলি অধিকতর সবল সচল ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। অর্থাৎ সাহিত্য অন্তরের উৎকর্ষসাধনের একটি উপায়,—এই হচ্ছে তার আসল কাজ।

সাহিত্যের একটি মহৎ গুণ এই যে, তার চর্চ্চায় মানুষ ভাব-রাজ্যের সুখাস্বাদনে অভ্যস্ত হয়। তার ফলে মানুষ নিজের বুদ্ধির চালনায় একাধারে সুখ, শান্তি ও সঞ্জীবনী-শক্তি লাভ করে। সাহিত্য সাংসারিক কাজকর্ম্মের অবকাশে মানুষের মনোরঞ্জন করে, এবং জ্ঞান বিজ্ঞান, স্বার্থসিদ্ধি ও বৈষয়িক পক্ষপাতিতার ঊর্দ্ধে মানুষের চিত্তকে উত্তোলন করে;—বিশেষজ্ঞের মনের সংকীর্ণতা দূর করে। একালে উদার সত্যের আলোক-বিশেষরূপে আমাদের মনের পক্ষে আবশ্যক; কিন্তু দর্শনের মূল গ্রন্থের আলোচনা সকলের আয়ত্তাধীন

নয়। সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে দর্শনকে ইতর না করে'ও লোকায়ত্ত করে; তাকে মধ্যস্থ করেই আমাদের লোক-সমাজের ভিতর দিয়ে সেই সকল বড় বড় দার্শনিক স্রোত বইতে থাকে, যার দ্বারা সামাজের উন্নতি, অন্তত পরিবর্ত্তন নির্দ্ধারিত হয়। যে-সকল মানবাত্মা জীবনসংগ্রামে খিন্ন এবং বিষয়ব্যাপারে মগ্ন, সাহিত্যই তাদের অন্তরে সেই সকল উচ্চ সমস্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগরূক রাখে, যেগুলি মনুষ্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তার অর্থ ও লক্ষ্য নিরূপিত করে। আধুনিক কালে অনেকের মনেই ধর্ম্মভাব বিলুপ্তপ্রায় এবং বিজ্ঞান সুদূরবর্ত্তী; একমাত্র সাহিত্যই তাদের কাছে সেই সকল আবেদননিবেদন পৌঁছে দেয়, যার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তারা সঙ্কীর্ণ অহমিকা এবং পাশব পেশাদারীর হাত হতে মুক্তিলাভ করে।

অতএব আমি যতদূর বুঝি, সাহিত্য-চর্চ্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের উৎকর্ষসাধন ও চিত্তবিনোদন। অবশ্য শুধু সৌখীন ও সহজভাবে সাহিত্য পাঠ না করে' যাঁরা শিক্ষা দেবার জন্য পাঠ করতে চান, তাঁদের নিজের জ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করতে হবে, ব্যবস্থাপূর্ব্বক বিদ্যানুশীলন করতে হবে, অপেক্ষাকৃত নির্দ্দিষ্ট, নির্ভুল, এমন কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই অধ্যয়ন করতে হবে, তা' স্বীকার করি। কিন্তু দুটি জিনিসের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা চাই;—একটি হচ্ছে এই যে, তিনিই সাহিত্যের সদ্‌গুরু, যিনি শিষ্যের মনে প্রধানত সাহিত্যরস উপভোগ করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে উদ্যোগী হবেন, ও তাদের মনের গতি এমন দিকে ফেরাতে পারবেন যাতে চিরজীবন তারা সাহিত্যকে একদিকে বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনী রসায়ন, অপরদিকে কর্ম্ম-জীবনের অবকাশের নর্ম্ম-সচিবস্বরূপ মনে করবে। এই

গন্তব্যস্থানে পৌঁছনোই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত,—কেবল তাদের পরীক্ষার দিনের উপযোগী কাটাছাঁটা উত্তর যোগানো নয়। আর একটি স্মর্ত্তব্য কথা হচ্ছে এই যে, কেউ তাঁর শিক্ষাকে এইপ্রকারে সফল করে' তুলতে সক্ষম হবেন না, যদি তিনি পণ্ডিত হবার আগে নিজেই সখের সাহিত্যিক না হ'য়ে থাকেন; আজ যে সাহিত্যকে অপরের উন্নতিসাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করছেন, এক সময়ে সেটিকে যদি তিনি নিজের উৎকর্ষসাধনের কাজে না লাগিয়ে থাকেন; সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে যা-কিছু অনুসন্ধান, যা-কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন, সে সব যদি তিনি নিজেই আরও ভাল করে' বোঝবার উদ্দেশ্যে, বুঝে আরো বেশি উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে না করে' থাকেন। সুতরাং আমার এই গ্রন্থপাঠ সাহিত্যের মূল রচনাবলী পাঠকে অনাবশ্যক করে তুলবে না, বরঞ্চ সাহিত্যপাঠের নিমিত্তকারণ হবে; কৌতূহল নিবৃত্ত করবে না, বরঞ্চ উদ্রেক করবে,—এই আমার অভিপ্রায়; এবং এই উদ্দেশ্য অঙ্গীকার করেই আমি ফরাসী-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

* * * * *

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি নতুন কথা বলবার জন্য বা নতুন কিছু আবিষ্কার করবার জন্য ব্যস্ত হই নি; এবং আমার সমসাময়িক অধিকাংশ পাঠকের মনে যে লেখা পড়ে' যে ভাব উদয় হয়ে থাকে, মোটামুটি সেই সকল ধারণাই আমারও মনে জন্মেছে,—এই কথা জানতে পারলে আমি যেমন কৃতার্থ হব, এমন আর কিছুতে নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

দ্ব-ইয়ারকি

—— —ঃ০ঃ——

শ্রীমতী…………দেবী

করকমলেষু—

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে' আসছি যে খবরের কাগজ তুমি নিত্য পড় আর সেই সঙ্গে নিত্য ভ্রু-কুঞ্চিত কর। তোমার এহেন অপ্রসন্ন হবার কারণ আমি তোমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করি নি, কারণ জানি যে কাগজ পড়াটা তুমি একটা দৈনিক কর্ত্তব্যের হিসেবে দেখো। আর দৈনিক কর্ত্তব্য মাত্রেই বিরক্তিকর, যথা—আমাদের আপিসে যাওয়া।

কিন্তু কাল তোমার মুখে শুনলুম যে, তোমার ব্যাজার হবার এদানিক একটু বিশেষ কারণ ঘটেছে। তুমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছ যে খবরের কাগজ নিত্য এক কথা লেখে, তাও আবার প্রায় একই ভাষায়; শুধু তাই নয়, কাগজওয়ালাদের যত বকাবকি যত রোখারুখি কিছুদিন ধরে সব নাকি হচ্ছে একটা কথা নিয়ে এবং সে কথাটা হচ্ছে diarchy; অথচ ও-কথার মানে জানা দূরে থাক্ নামও তুমি ইতিপূর্ব্বে শোন নি, যদিচ ইংরেজি ভাষার সঙ্গে তোমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ও-কথার অর্থ যে জানন৷ তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। দুদিন আগে আমরাও কেউ জানতুম না। কথাটা গ্রীক কিন্তু জন্মেছে ভারতবর্ষে। Monologue-এর

সঙ্গে dialogue-এর যা প্রভেদ, মূলত monarchy-র সঙ্গে diarchy-রও সেই প্রভেদ—অর্থাৎ একের সঙ্গে দুয়ের যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ। এখন বুঝলে ত?

তুমি যদি মনে ভাব বুঝেছ, ত ঠকেছ। ঐ diarchy-র মূল অর্থ ভুল অর্থ। সে অর্থের সঙ্গে তার হাল অর্থের সম্পর্ক এক রকম নেই বললেই হয়। অভিধানের ভিতর থেকে ওর মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারবে না। ওর অর্থের খোঁজ নিতে হবে এক সঙ্গে হিষ্টরি এবং জিওগ্রাফির কাছে। ইউরোপের হিস্টরি আর ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি এই দুয়ের মিলনের ফলে এই diarchy জন্মলাভ করেছে। ঐ কথাটার জন্মবৃত্তান্ত তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি, তাহলে তুমি ওর রূপগুণের পরিচয় পাবে।

(২)

এদেশে কিছুকাল থেকে একটা পলিটিক্যাল-মামলা উঠেছে, যার নাম হচ্ছে Democracy *vs.* Bureaucracy, এ ক্ষেত্রে বাদী হচ্ছে স্বদেশী শিক্ষিত সম্প্রদায় আর প্রতিবাদী হচ্ছেন বিদেশী শাসক সম্প্রদায়। উভয় পক্ষের ভিতর অনেক তর্কাতর্কি চটাচটি এমন কি সময়ে সময়ে গুতোগুতি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, শেষটা এ মামলার বর্ত্তমানে যেটা সর্ব্ব-প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে তারি নাম হচ্ছে diarchy. বিলাতের পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এখন এই মামলার শুনোনি হচ্ছে, তাতে দু-পক্ষই কসে' সওয়াল-জবাব করছেন। উভয় পক্ষই যে এক কথা একশ-বার বলছেন, তার কারণ আমরা যাকে ওকালতি বলি—সে হচ্ছে এক কথা একশ' রকমে বলবার বিদ্যে।

এই মামলাটার আসল হাল বুঝতে হলে' ইউরোপের ইতিহাসের অন্তত মোটামুটি জ্ঞান থাকাটা আবশ্যক। তাই আমি সে ইতিহাসের সারমর্ম্ম যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি যে দু'কথায় তা হবে না।

ইউরোপীয়দের মতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম কথাও যা আর তার শেষ কথাও তাই, সে কথা হচ্ছে democracy,—ও শব্দ যে গ্রীক তার থেকেই অনুমান করা যায় যে, ঐ হচ্ছে ইউরোপের সভ্যতার গোড়ার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুমানের কোনও প্রয়োজন নেই, কেননা এর প্রমাণ আছে। গ্রীসের ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই যে গ্রীসের শাসনতন্ত্র সাধারণত লোকমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে শাসনতন্ত্রের নাম হচ্ছে democracy. Demos শব্দের মানে তুমি অবশ্য জানো, কেননা এদেশে democracy-র সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও—দু'-চারজন demagague-এর সঙ্গে ত আছেই। তারপর রোমক সভ্যতাও ঐ democracy-র উপরেই দাঁড়িয়েছিল। রোম যে-দিন থেকে তার republic খুইয়ে সম্রাটের অধীন হন সেইদিন থেকেই তার অধঃ-পতনের সূত্রপাত হয়। রোমক-সাম্রাজ্যের ইতিহাস যে, তার Decline এবং fall-এর ইতিহাস—এ সত্যের সাক্ষাৎ ত আমরা Gibbon-এর বইয়ের মলাটেই পাই।

(৩)

"ডিমোক্রাসি" ইউরোপের ইতিহাসের প্রথম কথা আর শেষ কথা হলেও এর মধ্যের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। ইউরোপের মধ্যযুগ একালের

ইউরোপীয়দের মতে উক্ত মহাদেশের সভ্যতার নয়—অসভ্যতার যুগ। রোমক-সাম্রাজ্য যতই জরাজীর্ণ হোক্ না কেন,—আরও বহুকাল টিঁকে থাকত, বাইরে থেকে বর্ব্বররা এসে যদি না তা সমূলে ধ্বংস করত। গ্রীকো-রোমান সভ্যতা ত বড় জিনিস, এই বর্ব্বরেরা কোনরকম সভ্যতারই ধার ধারত না, সুতরাং তারা ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা একঘায়ে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে এবং রোম সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে নিজেরা ভোগ দখল করতে লাগল। ফলে যে নূতন তন্ত্র সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করে বসলে, তার নাম হচ্ছে Feudalism. এই Feudalism ব্যাপারটা যে কি তা একটা ঘরাও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ-কথা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, এক সময়ে বাঙলা দেশে বারোজন ভুঁইঞা ছিলেন। এই দ্বাদশ ভূম্যধিকারী যে এ-দেশের শুধু জমিদার ছিলেন তাই নয়—তাঁরা এক একজন ছিলেন এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। আমরা জমিদারদের চিঠি লিখতে হলে আজও শিরোনামায় লিখি "প্রবল প্রতাপেষু"। মধ্যযুগে ইউরোপ ঐ শ্রেণীর এক ডজন নয়, শতশত ভূম্যধিকারীর অধীন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের এ যুগের ইতিহাস হচ্ছে এদেরই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ইতিহাস। এই কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ফলে, ইউরোপে শেষটা কতগুলি বড়বড় রাজ্য দাঁড়িয়ে গেল। সে রাজ্যগুলি আজ প্রায় সবই বজায় আছে।

ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিও যেমন ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন, ইংলণ্ডের হিস্টরিও তেমনি বিভিন্ন। প্রথমত দ্বিপা হবার দরুণ ইউরোপের কোন দেশের সঙ্গে তার কস্মিনকালেও সীমানাঘটিত বিবাদ ঘটে নি। আর মধ্যযুগের যত ভূম্যধিকারী-রাজাদের পরস্পরের যত মারামারি

হত তা ঐ চৌহদ্দি নিয়ে। প্রকৃতি যেমন ইংলণ্ডকে একদেশ করে গড়ে দিলেন, William the Conqueror-ও তেমনি একদিনে এ দেশকে এক রাজ্য করে তুল্‌লেন। সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুগযুগ ধরে কাটাকাটি করে' ইংলণ্ডের রাজাকে একরাট হতে হয় নি। এই কারণে ইংলণ্ডের ইতিহাসের ধারাও একটু স্বতন্ত্র। রাজায় সামন্তে জমি নিয়ে লড়ালড়ি নয়, রাজায় প্রজায় রাজশক্তি নিয়ে কাড়াকাড়ির ইতিহাসই হচ্ছে ইংলণ্ডের আসল ইতিহাস।

মধ্যযুগের অবসানে যখন আমরা বর্ত্তমান যুগের মুখে এসে পৌঁছই তখন দেখতে পাই যে ইউরোপ কতগুলি ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত, এবং প্রতিদেশের মাথার উপর বসে আছেন এক এক জন সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা,—যিনি হচ্ছেন সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সর্ব্ব রাজশক্তির একমাত্র আধার। এ রাজশক্তি সংযত করবার ক্ষমতাও কারো ছিল না, কেননা এ শক্তি সেকালের মতে ছিল—ভগবদ্দত্ত, সুতরাং তার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার মানুষের ছিল না। ইতিমধ্যে ইউরোপের সকল জাতিই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছিল, এবং সেই ধর্ম্মের প্রসাদে তারা বিশ্বরাজ্যে যে একেশ্বরের সন্ধান পেয়েছিল, প্রতি রাজা নিজ নিজ রাজ্যে তদনুরূপ একেশ্বরের পদ লাভ করেছিলেন অর্থাৎ তাঁরা প্রতিজন হয়ে উঠলেন, স্বরাজ্যের অদ্বিতীয় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। Monarchy, অবশ্য প্রাচীন গ্রীসেও ছিল, কিন্তু ইউরোপের এই নব monarchy-র তুলনায় সে হচ্ছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু। তার পিছনে না ছিল এতাদৃশ ধর্ম্মবল, না ছিল এতাদৃশ বাহুবল।

(৪)

যে ডিমোক্রাসি মধ্যযুগে একদম ছাই চাপা পড়ে গিয়েছিল, বর্ত্তমানে তা আবার ইউরোপে সদর্পে জ্বলে উঠেছে। এ যুগের ইউরোপীয়রা এ ছাড়া যে অপর কোনও শাসনতন্ত্র সভ্যজগতে গ্রাহ্য হতে পারে এ কথা মুখে আনলেও কানে তোলে না। এ বিষয়ে পরস্পরে যে মতভেদ আছে সে শুধু তার বাহ্য আকার নিয়ে। শাসন যন্ত্রটা কি ভাবে গড়লে ডিমোক্রাসি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে, এমন কি জাতিতে জাতিতে মতান্তর হয়। এক কথায় ডিমোক্রাসির ধর্ম্ম সবাই মানেন, যা কিছু সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে সে শুধু তার Church নিয়ে, সে Church-এর মাথায় জনৈক ধর্ম্মরাজ, কিম্বা পঞ্চায়েৎ থাকা শ্রেয়; এ নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই। এ তর্কের শেষ কস্মিনকালে যে হবে তারও আশা করা যায় না, কেননা মানুষের রুচিও ভিন্ন আর তর্ক করবার প্রবৃত্তিও অদম্য।

সে যাই হোক্ ইউরোপের এই নব-ডিমোক্রাসি ও তার প্রাচীন ডিমোক্রাসি এক বস্তু নয়, এদের পরস্পরের আত্মাও বিভিন্ন;—এ দুয়ের ভিতর যে আশমান জমিন ফারাক্ এমন কথা বললেত অত্যুক্তি হয় না।

ইউরোপের পণ্ডিতদের মতে সে দেশের সভ্যতা হচ্ছে Antico-modern, অর্থাৎ—ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের পাতা ক'টা প্রক্ষিপ্ত, আর সেই প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু ছেঁটে ফেললেই তার অতীত তার বর্ত্তমানের সঙ্গে জুড়ে যায়, আর তখন দেখা যায় যে ইউরোপ আসলে গ্রীকো-রোমান সভ্যতারই জের টেনে আসছে।

এ মতটা অবশ্য সত্য নয়। দু'হাজার পাতার ইতিহাসের মধ্যে থেকে যদি হাজার পাতা ছিঁড়ে ফেলা যায়, তাহলে তার যে অঙ্গহানী হয় এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। বর্ত্তমান ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের যোগ আছে শুধু বইয়ের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ সে যোগ হচ্ছে বিদ্যাবুদ্ধির যোগ; কিন্তু তার নাড়ীর যোগ আছে শুধু মধ্যযুগের সঙ্গে।

জের, ইউরোপ আজও মধ্যযুগেরই টানছে। বকেয়ার মায়া কেউ বা বেশি কাটিয়েছে কেউ বা কম, সে দেশে এ যুগে জাতিতে জাতিতে মনের তফাৎ এই মাত্র। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষের যে আত্মা গড়ে উঠেছে, সেই আত্মা হচ্ছে এই নব-ডিমোক্রাসির আত্মা। আর ঐ মধ্যযুগে ও-দেশে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সেই রাষ্ট্রই এই নব ডিমোক্রাসির দেহ।

এই নব-মানবধর্ম্মের বীজ-মন্ত্র যে liberty, equality এবং fraternity—এ কথা ত এ দেশের স্কুলবয়রাও জানে। Liberty শব্দ যে-অর্থে আমরা বুঝি সে-অর্থে প্রাচীন ইউরোপ বুঝত না, liberty শব্দের এ-কেলে অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সে-কালে State-এর বহির্ভূত ব্যক্তিত্বের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তারপর দাস প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন সভ্যতার ধর্ম্মই ছিল অধিকারী ভেদ আর এ অধিকারী ভেদ ছিল জাতিভেদেরই একটি অঙ্গ। যারা জাতিতে গ্রীক কিম্বা রোমান নয় তারা সকল রাজনৈতিক অধিকারে সমান বঞ্চিত ছিল। রোম শেষটা অবশ্য—রোমক-সাম্রাজ্যের অধিবাসী মাত্রকেই রোমের নাগরিক হিসেবেই গণ্য করতে সুরু করেছিল, কিন্তু সে হয়েছিল তখন যখন সে সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা

উপস্থিত। এবং তার কারণ সে অবস্থায় রোমান নামক একটা বিশেষ জাতির কোন অস্তিত্বই ছিল না। রোম সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করেছিল, তার ফলে সমগ্র ইউরোপের অধিবাসীরাও রোমানদের গ্রাস করে ফেলে। সুতরাং equality বলতে এ-কালের লোক যা বোঝে সে-কালের লোক তা বুঝত না। এসিয়ার ধর্ম্ম যদি ইউরোপের মনে বসে না যেত তাহলে liberty, equality প্রভৃতি শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থের সন্ধান ইউরোপ পেত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে হচ্ছে এই যে, ইউরোপ যুগ যুগ ধরে খৃস্টধর্ম্মের বশীভূত না হলে তার মুখ দিয়ে Fraternity শব্দ কখনই বার হত না। নব-ডিমোক্রাসির মুখে এ কথাগুলি শুধু শাসন-তন্ত্রের মূল সূত্র নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের সাধন-মন্ত্র। গ্রীকো-রোমান সাহিত্যের প্রভাবে, ইউরোপের এই উদ্বুদ্ধ আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তি-জ্ঞানে রূপান্তরিত হল। ইউরোপ আত্মবলে স্বর্গরাজ্য জয় করবার দুরাশা ত্যাগ করে, পৃথিবী জয় করতে উদ্যত হল। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যার আসন নবযুগের বিজ্ঞান অধিকার করে বসলে।

(৫)

ডিমোক্রাসির আত্মাকে অব্যাহতি দিয়ে এখন তার দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্।

প্রাচীন ইউরোপের ডিমোক্রাসি সব এক একটি ছোট সহরকে অবলম্বন করে' তার গণ্ডীর মধ্যেই কায়েম ছিল। এবং সে সকল সহরের, আদ্-বাসিন্দারা নিজেদের সব এক বংশের লোক মনে করত।

তারা সকলে পরস্পর যে পরস্পরের, জ্ঞাতি না হোক্ অন্তত যে স্বগোত্র সে বিষয়ে তাদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সে কালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম কুলাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সহরের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে সকল নাগরিকদের মতই নেওয়া হত। নাগরিক মাত্রেরই ভোট ছিল, কিন্তু অ-নাগরিকের এ-বিষয়ে কথা কইবার কোন অধিকারই ছিল না। নাগরিকরা মাথা-গুণতিতে অতি স্বল্পসংখ্যক ছিল বলে' সকলে একত্র হয়ে তাদের পুরী-রাজ্যের ছোট বড় রাজকার্য্য সব চালাতে পারত। অর্থাৎ সে-কালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম পারিবারিক-পঞ্চায়েৎ।

এ-কালের রাজ্য কিন্তু একটা সহরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, এক একটা প্রকাণ্ড দেশ জুড়ে' তা বসে আছে। আর এই সব দেশে এক কুলের ত দূরে থাক্, একজাতির লোকও বাস করে না। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে এক-দেশীমাত্রেই পলিটিক্যাল হিসাবে একজাতি। এক কথায় এ যুগে স্বদেশীতে আর স্বজাতিতে কোনই তফাৎ নেই। সে-কালের রাজারা ছিলেন নৃপতি আর এ-কালের রাজারা হচ্ছেন ভূপতি। এ পরিবর্ত্তন ঘটেছে মধ্যযুগে। মনে রেখো, মধ্যযুগের সামন্তরাজারা ছিলেন সব ভূম্যধিকারী, সাদা কথায় জমিদার। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে দেখতে পাই ইউরোপের প্রতি রাজা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভূত সমগ্র দেশটাকে নিজের জমিদারী মনে করতেন। এরই ইংরাজি নাম হচ্ছে territorial sovereignty, আর রাজত্বের এই নূতন আইডিয়া থেকে একালের ডিমোক্রাসিতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে প্রজামাত্রকেই ভোট দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধি-কারভেদ একালে কে কত খাজনা দেয় তার উপর নির্ভর করে, কে

কোন্ দেবতা মানে তার উপর করে না। এ কালের রাজশক্তি আকাশ থেকে নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়েছে। ফলে একালে এত অসংখ্য লোকের ভোট আছে যে, সকলে একত্র হয়ে, দেশের রাজ-কার্য্য চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং একালে দেশের লোক তাদের শুধু জনকতক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। সেই প্রতিনিধি-সভাই রাজকার্য্য চালায়। এরি নাম representative গভর্ণমেণ্ট। ইউরোপের সেকেলে আর একেলে ডিমোক্রাসির প্রভেদটা এত লম্বা করে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য, এই কথাটা পরিষ্কার করা যে নব ডিমোক্রাসির গোড়া-পত্তন যেমন এদেশের অতীতেও হয় নি তেমনি সে দেশের অতীতেও হয় নি। এ-বস্তু আমাদেরও অন্বয়া-গতসম্পত্তি নয়, তাদেরও নয়। প্রাচীন আথেন্স রোমের মত স্বরাট সহর প্রাচীন ভারতবর্ষেও একটি আধটি নয়, একশ' দুশ' ছিল। নব ডিমোক্রাসির সূত্রপাত সব প্রথম ইংলণ্ডেই হয়, একমাত্র ইংরাজ জাতিরই এ বিষয়ে একটা পাঁচ ছশ' বছরের tradition আছে, কিন্তু সে tradition আজ দেড়শ' বছর আগে ইউরোপ মহাদেশের কোন জাতেরই ছিল না। এই কারণে ফরাসী-বিপ্লবের নেতারা যখন Constitution গড়তে বসেন তখন Arthur Young নামক জনৈক ইংরেজ বলেন এ হচ্ছে পাগলামি, কেন না ফরাসী জাতের ভিতর এ বিষয়ে পাঁচশ' বছরের পুরোনো কোনো tradition ছিল না। এর উত্তরে ফরাসীরা যে বলেন তবে কি আমাদের আর পাঁচশ' বছর হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে? Arthur Young-এর সেই পুরোনো কথা আজ সহস্র ইংরাজ-কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের জবাবও ফরাসীদের সেই পুরানো জবাব। খাঁটি ইংরাজের মনোভাব এই

যে পৃথিবীর অপর সকল জাতি যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের পক্ষে ইংরাজ জাতির হিস্টরির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ কথা বলাও যা আর এ কথা বলাও তাই যে, পৃথিবীর অপর সকল দেশ যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের দেশের জিওগ্রাফিকেও ইংলণ্ডের জিওগ্রাফির অনুরূপ করতে হবে। ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিই যে ইংলণ্ডের হিস্টরি গড়েছে এ ত ইংলণ্ডের পণ্ডিতদের মত।

(৬)

এই নব-ডিমোক্রাসির জন্মদাতা যে ফরাসী-বিপ্লব, এ কথা সর্ববাদী সম্মত।

এস্থলে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার যে ইংলণ্ডের ইতিহাস এর স্রষ্টা নয় কেন? যে পার্লিয়ামেণ্টরি গভর্ণমেণ্ট ডিমোক্রাসির দেহ তা ত ফরাসী-বিপ্লবের বহুপূর্ব্বে গড়ে' উঠেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ডিমোক্রাসির দেহ ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সে দেশের লোক তার আত্মার সঠিক সন্ধান পায় নি। ফলে ইংলণ্ডবাসীরা এ বিষয়ে সব দেহাত্মবাদী হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে উক্ত দেহের অতিরিক্ত কোনও আত্মা নেই। গভর্ণমেণ্ট ভাবের জিনিস নয় কাজের জিনিস। আর যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তারা গড়ে তুলেছে সে ব্যবস্থার সার্থকতা শুধু ইংলণ্ডেই আছে অপর কোথায়ও নেই। এক কথায় লোকায়ত্ত শাসন-প্রণালী ইংরাজ জাতির একায়ত্ত।

অপর পক্ষে ফ্রান্স স্বদেশে ডিমোক্রাসির যন্ত্র গড়বার পূর্ব্বেই তার মন্ত্রের সৃষ্টি করলে, যে-মন্ত্র আজ পৃথিবী শুদ্ধ লোক আওড়াচ্ছে।

ফ্রান্সের কথা এই যে, মানুষ মাত্রেরই কতকগুলো জন্মসুলভ অধিকার আছে এবং সেই সব অধিকার বজায় রাখাই হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। নব-ডিমোক্রাসির মূল সূত্রগুলি এই —

1. Men are born and remain free and equal in their rights.

2. The rights are liberty, ownership of property, security, and resistance to oppression. Liberty consists in being able to do anything which is not injurious to others.

3. The principle of all sovereignty rests in the nation.

4. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to co-operate personally or through their representatives in its formation. The law should be the same for all."

এই কথাগুলি পৃথিবী শুদ্ধ লোকের মনে বসে গেল, বিশেষত তাদের মনে, যারা উক্ত সকল অধিকারে বঞ্চিত। এ সব কথায় বিশ্বমানবের মন যে, এক সঙ্গে সাড়া দিলে ও সায় দিলে, তার কারণ, ফরাসি জাতি এ সব অধিকার শুধু নিজেদের জন্য নয়, জাতি দেশ বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে মানুষ মাত্রেরই জন্য দাবী করেছিল। এক কথায় ফ্রান্স পৃথিবীতে এক নতুন ধর্ম্ম মত প্রচার করলে। এ ধর্ম্মের মুক্তি পারত্রিক নয়, ঐহিক সমগ্র ইউরোপের জনগণ এই মুক্তিলাভের জন্য লালায়িত এবং সেই সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। অপর

সকল ধর্ম্মের মত এই ধর্ম্মের dogma-গুলির উপরে লজিকের ছুরি অবশ্য চালানো যায়, এবং সে ছুরি চালাতে ইউরোপের পণ্ডিত-মণ্ডলী, বিশেষত জর্ম্মানরা মোটেই কসুর করেন নি। এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত বই লেখা হয়েছে, তা একত্র করলে বোধ হয় একটা নতুন আলেকজাণ্ড্রিয়ার লাইব্রেরি তৈরি করা যায়—যা ভস্মসাৎ করলে মানুষের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। পণ্ডিতের তর্ক পণ্ডিতে করে' চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষে এই ধর্ম্মমত অনুসরণ করে এক নব-সভ্যতা গড়ে চলেছে—যার নাম হচ্ছে ডিমোক্রাসি। লজিকের ছুরি এ dogma-গুলোকে জখম করলেও তার প্রাণবধ করতে পারে নি, তার কারণ এর একটিও axiom নয়; সব postulate. এ যুগের ফ্রান্সের একটি বড় দার্শনিক, কিছুদিন হল আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের অন্তরে একরকম অশরীরি শক্তি আছে, যার নাম idea-force, যার বলে, মানুষে তার সমাজ গড়ে, সভ্যতা গড়ে। Liberty, equality ও fraternity-র তুল্য প্রবল idea-force যে এ যুগে আর কিছু নেই, তার প্রমাণ গত দেড়শ' বৎসরের ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। এই সব আইডিয়া যখন মানুষের স্বার্থের সঙ্গে একজোট হয় তখন তার শক্তি যে কি রকম অদম্য হয়ে ওঠে, তার পরিচয় ত গত যুদ্ধেই পাওয়া গেছে।

(৭)

অশরীরি আত্মা যতক্ষণ না একটা দেহের ভিতর প্রবেশ করতে পারে ততক্ষণ তার একটা স্থিতভিতও হয় না, আর তা পৃথিবীর কোন কাজেও লাগে না। সুতরাং নব-ডিমোক্রাসির আত্মা ফ্রান্সে

জন্মগ্রহণ করে' ইংলণ্ডের তৈরি দেহকে আশ্রয় করলে। এক কথায় ইংলণ্ডের শাসন-যন্ত্রের অনুকরণে তারা তাদের দেশের শাসনযন্ত্র গড়লে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে, রাজ-বিদ্রোহী ফ্রান্স যে, Constitution তৈরি করলে তার আদর্শ হল ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টারি গভর্ণমেণ্ট। এ নকল করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। প্রথমত সে সময় লোকায়ত্ত শাসনতন্ত্র এক ইংলণ্ড ব্যতীত আর কোথায়ও ছিল না। দ্বিতীয়ত—যে সব আইডিয়ার উপর ফ্রান্সে তার নবমানব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করলে সে সব আইডিয়ারও সূত্রপাত হয়েছিল ঐ ইংলণ্ডেই। ইংলণ্ড আগে আইডিয়া গড়ে' তারপর সেই আইডিয়া অনুসারে তার গভর্ণমেণ্ট গড়ে নি। কিন্তু সেই গভর্ণমেণ্টের অন্তরে যে সব আইডিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করছিল, যে সব পলিটিক্যাল-আইডিয়া ইংলণ্ডের মগ্নচৈতন্যের ভিতর লুকিয়ে ছিল, ফ্রান্সের দার্শনিকরা সেইগুলি টেনে বার করে, জাগ্রতচৈতন্যের দেশে তাদের খাড়া করলেন। সত্য কথা বলতে গেলে Hobbes, Lock প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকরাই এ সব আইডিয়া প্রথমে আবিষ্কার করেন, Montesquie, Rousseu—প্রভৃতি সেইগুলিকে শুধু ফুটিয়ে তোলেন এবং তাদের একটা নতুন দিক্‌ আর নতুন গতি দেন। ইংলণ্ড যা তার খানদানি জিনিস মনে করত, ফ্রান্স তা বিশ্বমানবের সম্পত্তি বলে প্রচার করলে। এই যা তফাৎ, কিন্তু এ তফাৎ মস্ত তফাৎ। ইংলণ্ডের হাতে যা কর্ম্মমাত্র ছিল, ফ্রান্সের হাতে পড়ে' তা ধর্ম্ম হয়ে উঠল।

(৮)

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে, Rights of Man-এর যে চারটি

মূলসূত্রের পরিচয় দিয়েছি, তার প্রথম দুটির বিষয়ের সঙ্গে শেষ দুটির বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম দুটির সার কথা হচ্ছে, গভর্ণমেণ্ট মাত্রেরই পক্ষে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য আর শেষ দুটির সার কথা হচ্ছে, সর্ব্বলোকের সমবেত ইচ্ছার উপরই প্রতি দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। একটি হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের গড়নের কথা, আর একটি হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের সার্থকতার কথা। যে diarchy-র নাম শুনে শুনে তোমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে তার মানে বুঝতে হলে, গভর্ণমেণ্টের গড়নের কথাটাই মোটামুটি বুঝতে হবে, কেননা মণ্টেগু-চেমসফোর্ড-কল্পিত Reform Bill-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ দেশের শাসন-যন্ত্রটা নতুন করে গড়া। গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের কথাটা এখন মুলতুবি রাখা যাক্, কেননা তা হলে Reform Bill-এর নয় Rowlat Act-এর আলোচনা করতে হয়, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র বিষয়। নব ডিমোক্রাসির উক্ত সূত্রগুলির একটির সঙ্গে আর একটির যে যোগ নেই, তা নয়। তবে ইউরোপের লোকের বিশ্বাস যে শাসনযন্ত্রটা লোকায়ত্ত না হলে লোক সমূহের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব, সুতরাং ডিমোক্রাসির প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ডিমোক্রাটিক গভর্ণমেণ্টের স্থাপনা করা। এ মতে Reform Bill পাশ হলে আর Rowlat Bill পাস হতে পারে না। সর্ব্বলোকের সম্মতিক্রমে যদি আইন গড়তে হয়, তাহলে সর্ব্বলোকের অসম্মতি-ক্রমে কোনও আইন তৈরি হতে পারে না। আর সামাজিক জীব যাকে স্বাধীনতা বলে, তা একমাত্র আইনের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের দ্বারাই রক্ষিত, অতএব স্বেচ্ছায় আইন গড়বার অধিকার হচ্ছে সমাজের সব অধিকারের মূল।

(৯)

এই খানে বলে' রাখি যে Representative Government হচ্ছে ডিমোক্রাসির প্রথম কথা, আর responsible Government তার শেষ কথা। এই কথা দু'টোর মোটামুটি অর্থ এখন তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব। ব্যাপারটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়, বিশেষত তোমাদের পক্ষে, কারণ আসলে ও হচ্ছে সামাজিক ঘরকন্নার কথা। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের উদাহরণ নেওয়াই সঙ্গত, কেননা ফ্রান্স তার নব-শাসনতন্ত্র কতকগুলো স্পষ্ট principle-এর উপরে একদিনে খাড়া করেছে; সুতরাং সে শাসনতন্ত্রের মূল উপাদানগুলি ধরা সহজ। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বহুকাল ধরে ধীরে-সুস্থে হাত-আন্দাজে গড়ে তোলা হয়েছে। ফ্রান্স তার প্রজাতন্ত্র একদম নতুন করে গড়েছে, ইংলণ্ড তার সেকেলে রাজতন্ত্র ক্রমান্বয় এখানে ওখানে মেরামত করে' করে' তার হাল শাসনযন্ত্র লাভ করেছে। অবশ্য এই মেরামতের প্রসাদে তার সেকেলে গভর্ণমেণ্টের খোল এবং নইচে দুই-ই বদল হয়ে গেছে।

তা ছাড়া ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্টের লিখিত আইন আছে, ইংলণ্ডের নেই। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মূল, আইন নয়—আচার; সুতরাং তার ভিতর আগাগোড়া মিল পাবে না। ইংলণ্ডের পলিটিক্যাল ধর্ম্মও হচ্ছে একরকম protestantism—অর্থাৎ মধ্যযুগের রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে যুগে যুগে প্রতিবাদ করে' সে শক্তিকে ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ করে' হরণ করে' অহরণ করে' ইংরাজেরা তাদের Constitutional monarchy দাঁড় করিয়েছে। রাজা কি কি করতে পারবেন না,

সেই বিষয়েই তারা রাজার কাছে সব লেখাপড়া করে নিয়েছে। কিন্তু গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য এবং মানুষের সহজ অধিকার সম্বন্ধে তাদের Constitution নীরব। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নব-ডিমোক্রাসির ভিত্তি, ইংলণ্ডের আইন-কানুনে তার নাম পর্য্যন্ত নেই। অথচ ও স্বাধীনতা ইংরাজের মত আর কোনও জাতের নেই। রাজশক্তিকে আইনে বেঁধে এ স্বাধীনতা তারা পরোক্ষ ভাবে লাভ করবে।

"No man can be accused, arrested or detained in prison except in cases determined by law, and according to the forms prescribed by law"—

Declaration if Rights of Man-এর এই সূত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি অতি প্রাচীন কথা, এর সাক্ষাৎ Magna charta-তেই পাবে। ইংলণ্ড তার সকল মন ব্যক্তিগত সত্বস্বামিত্ব রক্ষার উপরেই নিয়োগ করাতে, সে দেশের Constitution ইংরাজেরা অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবে গড়ে' তুলেছিল। ফলে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট, গড়নে কতকটা English Church-এর অনুরূপ—অর্থাৎ নূতনে পুরাতনে যোড়া-তাড়া দিয়ে তা খাড়া করা হয়েছে। এক কথায় Reason এবং authority,—এই দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তুর এক রকম কাজ চালানো-গোছ সমন্বয়ের উপর ইংলণ্ডের মন ও জীবন দুই-ই সমান-প্রতিষ্ঠিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স যখন তার নব Constitution গড়তে বসল, তখন তার চোখের সুমুখে ঐ ইংলণ্ডের Constitution ছাড়া ডিমোক্রাসির আর কোনও জ্যান্ত নমুনা ছিল

না। ফ্রান্স অবশ্য তার নূতন গভর্ণমেণ্ট, একমাত্র Reason-এর উপরেই খাড়া করতে চেয়েছিল, তা সত্ত্বেও যে ইংলণ্ডের মডেল গ্রাহ্য করতে তার আপত্তি হল না, তার কারণ ইতিপূর্ব্বে জনৈক ফরাসি দার্শনিক, ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত reason আবিষ্কার করেছিলেন। Montesquie-র মতে রাজশক্তি সর্ব্বত্র ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেই আবির্ভূত হয়। এর একটির কাজ হচ্ছে—বিচার (Judicial), আর দ্বিতীয়টির আইন গড়া (Legislative), আর তৃতীয়টির শাসন সংরক্ষণ (Executive).

Montesquie-এই মত প্রচার করেন যে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে বিচারের ক্ষমতা রাজার নিয়োজিত জজের হস্তে ন্যস্ত, আইন গড়বার ক্ষমতা সে দেশে আছে শুধু পালিয়ামেণ্ট অর্থাৎ প্রজাবর্গের প্রতিনিধির হাতে, আর শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা চিরদিনই রাজার হাতে রয়ে গিয়েছে। Montesquie-র এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের রাজশক্তির কোন্ অংশ যে কার হাতে ছিল তা বলা অসম্ভব, কেননা এ বিষয়ে তখন কোন একটা লিখিত-পড়িত ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় নি। আসল কথা এই যে রাজা ও প্রজার অধিকারের পাকা-পোক্ত সীমানা তখনও ঠিক হয়ে যায় নি, এমন কি আজও হয় নি। এর ভিতর যে-শক্তি যখন প্রবল হ'ত তখনই সে শক্তি তার অধিকারের মীমাংসা বাড়িয়ে নিত। সে যাই হোক, বিদ্রোহী ফ্রান্স Montesquie-র মত গ্রাহ্য করে নিয়েই ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাহার আদ্ Constitution গড়ে। এ তন্ত্রে শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা রাজার হাতেই রয়ে গেল, প্রজার হাতে পড়ল শুধু—আইন তৈরি করবার ক্ষমতা। এই প্রতিনিধি সভা

আসলে ব্যবস্থাপক সভা হলেও, ইংলণ্ডের নজির দৃষ্টে প্রজার উপর টেক্স ধার্য্য করবার এবং বাৎসরিক বজেট পাশ করবার ক্ষমতাও এই সভা আত্মসাৎ করে নিলে। ইংলণ্ডের মতে এ ক্ষমতার অভাবে প্রজার কোন ক্ষমতাই থাকে না। আমরা মজা করে' টাকাকে রুধির বলি, কিন্তু উপমাটা নেহাৎ বাজে নয়। প্রজার হাতে টাকার থলি এসে পড়ায় রাজত্বের রক্ত-চলাচল বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাদের হস্তগত হয়। এই নমুনার গভর্ণমেণ্টর নামই হচ্ছে representative Government সে দিন পর্য্যন্তও জার্ম্মাণীতে এই ধরণের গভর্ণমেণ্টই ছিল।

(১০)

যে-দেশে representative Government আছে, এখন দেখা যাক্ সে-দেশে রাজার হাতে কি ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। শাসন-সংরক্ষণের একাধিক বিভাগ আছে, যথা,–administration, justice, finances, foreign affairs, army, navy, commerce, agriculture, education and public works ইত্যাদি ইত্যাদি। এর প্রতি বিভাগটি এক একটি রাজমন্ত্রীর হাতে সঁপে দেওয়া হয়, এবং সেই রাজমন্ত্রী ক'টিকে নিয়ে যে মন্ত্রী-সমিতি গঠিত হয়, তারই নাম হচ্ছে—Executive Council. বলা বাহুল্য যে, সমগ্র দেশের শাসনভার এই মন্ত্রী-সমিতির হাতেই পুরোপুরি থাকে। ফলে যে দেশে Legislative-শক্তি থাকে প্রজার প্রতিনিধির হাতে আর Executive ক্ষমতা রাজমন্ত্রীর হাতে, সে দেশে এ দুয়ের ভিতর বিরোধ অনিবার্য্য। প্রতিনিধি সভা ক্রমান্বয়ে রাজমন্ত্রীদের সকল কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে, আর

রাজমন্ত্রীরা নিত্য প্রতিনিধি সভার দল ভাঙিয়ে সে সভাকে কাহিল করে ফেলবার চেষ্টা করে।

ফ্রান্সের ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে এই বিরোধের ইতিহাস। সে দেশে যে আশি বৎসরের মধ্যে তিনবার রাষ্ট্র-বিপ্লব হয়েছে এবং ছ'বার গভর্ণমেণ্টের বদল হয়েছে, তার একমাত্র কারণ—Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর এই চিরদ্বন্দ্ব। এ বিরোধ দূর হল তখনই, যখন Executive রাজার অধীন না হয়ে Legislative Council-এর অধীন হল। এর চলতি উপায় হচ্ছে প্রতিনিধি সভার সভ্যদের মধ্যে থেকে জনকতককে মন্ত্রী নিযুক্ত করা, যাদের উক্ত সভার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এবং যাদের বরখাস্ত করবার ক্ষমতা উক্ত সভারে হাতেই থাকবে। Absolute monarchy-র দিনে—যেমন legislative এবং executive, উভয় ক্ষমতাই একমাত্র রাজার হাতে ছিল, পূর্ণাঙ্গ ডিমোক্রাসির দিনে, তেমনি ঐ দুই ক্ষমতাই একমাত্র প্রজার হাতে আসে। এই তন্ত্রের নামই হচ্ছে responsible Government, আর এই হচ্ছে ডিমোক্রাসির শেষ কথা।

(১১)

এতক্ষণ যদি পেয়ে থাকো ত আর একটু ধৈর্য্য ধরে আমার ব্যাখ্যান শুনলে, আমাদের পলিটিক্যাল মামলার মোদ্দা কথাটা জলের মত বুঝে যাবে। কারণ এ পত্রে আমি ইউরোপের পলিটিক্সের শুধু ক খ-র পরিচয় দিচ্ছি। প্রস্তাবনাটি যত লম্বা হয়েছে, উপসংহার তার সিকিও হবে না।

আমাদের গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থা এই। বিচার করবার আইন তৈরি করবার ও শাসন সংরক্ষণ করবার ক্ষমতা সবই আজ Bureaucracy-র হাতে। এদেশে অবশ্য Legislative Council আছে, এবং তাতে জনকতক প্রজার প্রতিনিধিও আছেন, কিন্তু আসলে এ Legislative Council, গভর্ণমেণ্টের Executive Council-এর সদর মহল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যবস্থাপক সভায় প্রজার মুখপাত্রেরা তর্ক করতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে, কিন্তু কোন আইনের জন্মও দিতে পারে না, কোন আইনের ভূমিষ্ট হওয়াও বন্ধ করতে পারে না, এক কথায় আমাদের প্রতিনিধিদের মুখ আছে কিন্তু হাত নেই। প্রমাণ—দেশী সভ্যদের সে ক্ষমতা থাকলে Rowlat Bill আর Rowlat Act হত না।

এই যুদ্ধের তাড়নায় ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি, ডিমোক্রাসির মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে।

এই সুযোগে Congress এবং Moslem League, দু-জনে দু-হাত মিলিয়ে জোড়করে বিলেতের কাছে Representative Government ভিক্ষা করে। আর প্রায় ঠিক সেই সময়ে ইংরাজরাজ ভারতবর্ষকে চোখের এক নতুন কোণ দিয়ে দেখতে পেলেন, যে-কোণকে দক্ষিণ কোণ আর ইংরাজিতে right angle বলা যেতে পারে, এবং সেই কারণে বিলাতের মন্ত্রীসভা এর উত্তরে বলেন যে—

The policy of His Majesty's Government is. ... the gradual development of self-govering institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of

the British Empire. They have decided that substantial steps in this direction should be taken as soon as possible."

আমরা ভিক্ষে চেয়েছিলুম reprsentative Government বিলেত দিতে চাইলেন, তার উপরে ফাউ হিসেবে কিঞ্চিৎ responsible Government। যত গোল বেধেছে ঐ একটা নিয়ে।

ফলে দাঁড়িছে এই যে, মণ্টেগু এবং চেম্‌সফোর্ড সাহেব উভয়ে মিলে reform bill-এর একটি খসড়া তৈরি করেছেন। যে শাসনযন্ত্র এঁরা গড়তে চাচ্ছেন সে এত জটিল যে, তার কলকব্জা সব তোমাকে চিনিয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এ যন্ত্রের গড়নটা এত জটিল হবার কারণ, তার break-এর আধিক্য। মোটার গাড়ীতে সবে দুটি ব্রেক আছে, এক হাত-ব্রেক আর এক পা-ব্রেক। কিন্তু এ যন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গে ব্রেক আছে। মনে রেখো পার্লেমেণ্টের অভিপ্রায় হচ্ছে gradual development, সুতরাং ডিমোক্রাসির গতি এদেশে যাতে অতি ধীর-ললিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এ যন্ত্র গড়া হয়েছে। অনেকের মতে, এ যন্ত্রের গতিরোধ করবার যত রকম কায়দা-কানুন বানানো হয়েছে তাতে ওটা চলবেই না। সে যাই হোক্ এই বিলের সর্ত্ত অনুসারে আমরা যে পুরো Represetative Government পাব না, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নেই।

গভর্ণমেণ্ট ,যেখানে পুরোপুরি representative নয়, সেখানে তা যে কি করে' responsible হতে পারে তা বোঝাই কঠিন। অথচ এ মীমাংসা করাই চাই, নচেৎ পার্লেমেণ্টের কথার খেলাপ হয়। এ মীমাংসা অন্য কোনও জাত করতে পারত কি না সন্দেহ, ইংরাজ-

রাজমন্ত্রীরা যে পারছেন, তার কারণ ইংরাজের রাজনীতি লজিকের তোয়াক্কা রাখে না।

অতঃপর মীমাংসাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, আধা representative Government-এর সঙ্গে আধা responsible Government জুড়ে দেও—এ দুটি যমজ ভ্রাতার মত এক সঙ্গে বাড়বে এবং কালক্রমে দুই যখন সাবালক হবে তখন ভারতবর্ষ Canada প্রভৃতির মত "an integral part of the British Empire" হয়ে উঠবে।

আপাতত কোথায় এবং কতটুকু responsible Government দেবার প্রস্তাব হচ্ছে জানো?—বড়লাটের বড় খাসদরবারে নয়—প্রাদেশিক ছোটলাটদের যত ছোট ছোট খাসদরবারে। এই ছোটলাটদের দরবারে নানারূপ শাসন-বিভাগ আছে, তারই দুটো একটা নিরীহ-বিভাগ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভার দুটি একটি সরকারের মনোনীত সভ্যকে দেওয়া হবে। যে-সব বিভাগের কাজ হচ্ছে রাজ্য-শাসন ও সংরক্ষণ করা সে সব বিভাগ নয় কিন্তু যে সব বিভাগের কাজ হচ্ছে দেশের উন্নতি সাধন করা সেই সব বিভাগ, যথা—শিক্ষা-বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিভাগ ইত্যাদি, অর্থাৎ রাজ্য-চালনার ভার থাকল রাজপুরুষদের হাতে আর প্রজার উন্নতি করবার ভারপড়ল প্রজার প্রতিনিধির হাতে। ভাষান্তরে প্রজাকে শাসন করবার ক্ষমতা রয়ে গেল তাঁদেরই হাতে, এখন তা আছে যাদেরহাতে। এবং প্রজাকে লালন করবার দায় পড়ল তাঁদের ঘাড়ে যাঁরা কস্মিনকালেও কোন রাজকার্য্য চালান নি। এরই নাম diarchy.

অতএব দাঁড়াল এই যে, দেশের ঘরকন্না চালাবার সেই বন্দোবস্ত করা হল যে-বন্দোবস্তে আমাদের পারিবারিক ঘরকন্না চালান হয়। পারিবারিক-গভর্ণমেণ্টের যেমন কতক বিভাগ থাকে

আমাদের হাতে আর কতক বিভাগ তোমাদের হাতে, এই নব-শাসন-তন্ত্রেরও তেমনি বড় বিভাগগুলো থাকবে ওঁনাদের হাতে আর ছোটগুলো আমাদের হাতে।

পৃথিবীতে আর কোথাও যে এ বন্দোবস্ত নেই তার কারণ পৃথিবীর আর কোনও জাতের অবস্থাও আমাদের মত নয়। ভারত-বাসীরা আবহমান কাল দোটানার মধ্যেই পড়ে আছে। এ দেশের যে-যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করো দেখতে পাবে একদিকে রয়েছে রাজভাষা আর একদিকে রয়েছে লোকভাষা, একদিকে রয়েছে পোষাক অর্থাৎ রাজবেশ আর একদিকে রয়েছে আটপৌরে কাপড় অর্থাৎ লোকবেশ। আর আমরা ভদ্রলোকেরা—এক সঙ্গে এ দুই-ই অঙ্গীকার করে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে আসছি; সুতরাং রাষ্ট্রতন্ত্রে এই diarchy আমাদের দেশেরই উপযুক্ত হয়েছে।

যদি বলো এ ঘরকন্না চলবে কি রকম? তার উত্তর, সে নির্ভর করবে কাকে রাজমন্ত্রী আর কাকে লোকমন্ত্রী করা হয় তার উপর। যদি স্ত্রী পুরুষে মনের মিল থাকে তাহলে চলবে নিখিরখিচে আর তা যদি না থাকে ত দিনরাত খিটিমিটি হবে। এই দু-ইয়ারকি duet ও হতে পারে dud ও হতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে যে, এ বন্দোবস্তে Bureaucracy-র তরফ থেকে এত আপত্তি উঠছে কেন? আপত্তি উঠছে এই ভয়ে যে, প্রজার প্রতিনিধিরা মন্ত্রী-সভায় ছুঁচ হয়ে ঢুকবে আর ফাল হয়ে বেরুবে। আর এ পক্ষ যে এই বন্দোবস্ত বজায় রাখবার জন্য এতটা জেদ করছেন, তার কারণ অপর পক্ষের যেটা আশঙ্কা এ পক্ষের সেইটেই আশা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সৎ - চিদ্---আনন্দ।

——:০:——

"আমি আছি!"
— কে শুনাল হেন অমিয় কথা!
আছ তুমি রোমে রোমে,
আছ তুমি ব্যোমে ব্যোমে,
অভয় প্রতিষ্ঠা তব
সর্ব্বকালে সর্ব্বগতা।
তুমি সৎ—মধুময় এ বারতা।

"আমি জ্ঞান!"
—কি সুধা সম্বাদ হল রটনা!
জ্ঞানে কর সুখ সৃষ্টি,
দুঃখে রাখ জ্ঞান দৃষ্টি,
জ্ঞানমনন্তং জ্ঞান
পূর্ব্ব জগত-ঘটনা।
তুমি চিদ্—ধন্য হল এ চেতনা।

"আমি রস।"
—কি অমৃত-ভাষে ভরিল এ কান!
ওহে প্রেম, হে আনন্দ!
ঘুচিল সকল দ্বন্দ্ব।
সর্ব্বং খলু ব্রহ্ম,
অপ্রিয় প্রিয় সমান।
তুমি আনন্দ,—নন্দিত এ-পরাণ!

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।*

—:o:—

কলিকাতা, ৯ই অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের কল্যাণ,

বর্ষার সময়, বিশেষত ভরা শ্রাবণে, এক একটা বাদলার দিন আসে, যেদিন আকাশ মেঘে ছাওয়া, অনবরত টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি ঝরছে, কোথাও কোনখানে আলোর দেখা পাওয়া যায় না। এমন দিনে সুস্থ সবল মানুষের জীবনও দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে। আজ ঠিক তেমনি একটি দিন এসে দেখা দিয়েছে, চারিদিক ভিজে স্যাঁত স্যাঁত করছে—আকাশে মেঘের ভার যে কখন হাল্কা হয়ে যাবে, তার কোন সুদূর লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আজ আমার মনে কত দিনের কত পুরাণ সুখের কথা ভিড় করে আসছে। মানুষ কত কি ভুলে যায়, কিন্তু "পুরাণো সে দিনের কথা" ভোলা হয়ে ওঠে না! ছ'বৎসর পরে, আমি বনের মধ্যে বড় বড় বাঘ, ভালুক, হরিণ শীকার করতে নিয়ে গিয়ে তোমায় মৃগয়া-ব্রতে দীক্ষিত করব, কথা আছে। আমার এই অঙ্গীকার বার বার তুমি আমায় স্মরণ করিয়ে দাও। যখন আমার বয়স নাবালকের গণ্ডী পেরোয় নি, সবে সতের কি আঠার, সেই সময়, আমি আমার প্রথম চিতাবাঘ শীকার করি! "চিতা"

---

* শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরী প্রণীত "Sport in Jheel and Jungle" নামক ইংরাজী শীকার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

বলে মনে কোরনা সেটি ছোট্ট—তার রাক্ষসপ্রমাণ শরীর। রামায়ণে দুন্দুভি রাক্ষসের হাড়ের বর্ণনা পড়েছ ত? এই বাঘের চামড়া না নিয়ে, হাড় যদি নেওয়া হত, তাহলে হয়ত তার পরিমাণ, দুন্দুভির হাড়কেও হার মানাত। একরাশ কটাশে রোঁয়া, জন্তুটি এত কাছে এসে পড়েছিল যে, অতটা সান্নিধ্য কখনই নিরাপদ নয়! কিন্তু না জানা থাকলে, অনেক ভয়ানক জিনিসও ভয় দেখাতে পারে না। ভাগ্যে, তাক্‌ ঠিক ছিল, এক গুলিতেই ফরসা,—তারপর তার পিছন পিছন দৌড় দিলাম! আহত বন্য জন্তুকে এমন ভাবে তাড়া করে যাওয়া শীকারের সব আইনের বিরুদ্ধ; বিশেষত এদের চালচলন সবই যখন আমার অজানা। তবে "সব ভাল যার শেষ ভাল",—জয়ী আমিই হলাম। আজ এই বিশ্রী বর্ষার দিনে ঘরে বসে বসে সে দিনের পাগলামির কথা নতুন করে মনে পড়ছে। সে দিনের সেই অপূর্ব্ব আনন্দ, আজকার সব প্রতিকূলতার মধ্যেও উজ্জ্বল মুর্ত্তিতে এসে দেখা দিয়েছে—শুধু সে একা আসে নি, অনেক সাথীও সঙ্গে এনেছে। নিজের শক্তিসামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, বড় বড় জানোয়ার যা-কিছু শীকার করেছি, তা পায়ে হেঁটেই করেছি। এতে বিপদের খুবই সম্ভাবনা, তবু আমি জোর করে বলতে পারি এই পন্থাই সব চেয়ে নিরাপদ। যদি এদের ধরণ-ধারণ, মেজাজ ও খেয়াল সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা না থাকে, যদি এদের পিছু পিছু খুঁজতে যাবার, পায়ের দাগ দেখে খুঁজে বার করবার কায়দা কিছু না জান, কিম্বা কষ্ট স্বীকার করে এ বিদ্যা আয়ত্ত না করে থাক, তাহলে সুবিধার চেয়ে বিভ্রাট ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী। তবে এ বিদ্যা বই পড়ে পাওয়া যায় না, হাতে-বন্দুকে-বল্লমে শিখতে হয়। তা যদি

শিখতে পার, আর এ পথে চলবার জন্যে একজন যোগ্য সঙ্গী আর উপদেশ দেবার লোক পাও, তাহলে দেখবে, মৃগয়া তোমার ব্যসন না হয়ে আনন্দের উপকরণ হবে, শীকারের খেয়াল বজায় রাখতে গিয়ে দুঃখে পড়বে না। এ বিষয়ে তোমায় অনেক কল-কৌশল শিখিয়ে দিতে পারব। চারদিকের সব অবস্থার উপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলে, চর্চ্চার ফলে সহজে সে শক্তি যে আরো বাড়ে তাতে আর সন্দেহ কি? আজকালকার দিনে ছেলেদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তাদের অনেক বিধিদত্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অবনতি হয়। এই কথা মনে করেই, সর্ব্বদা যে-সব জীবজন্তু পাখী দেখতে পাও, তোমার মনে তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে রাখবার জন্যে আমি বিশেষ চেষ্টা করে আসছি। তুমি আর ছোট্ট অলকা, (যদিও তুমি মনে কর এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন অধিকারই নেই) অনেকবার হাতির উপর চড়ে স্নাইপ (Snipe) শীকার দেখেছ। যখনি ডিঙিখানা বিলের পদ্ম আর শরবনের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সরে চলেছে, পাখীটি উড়েছে, আমি মারতে যাচ্ছি, অমনি ছেলেবয়সের অদম্য উৎসাহে চীৎকার করে, হাততালি দিয়ে, সেটিকে উড়িয়ে দিয়েছ! তোমরা এখন জান, স্নাইপ কত অল্প সময়ের জন্যে বাঙলা দেশে বেড়াতে আসে। তাদের লম্বা ঠোঁটের পাশে, (চোখের পাশে নয়) কান যেখানটিতে থাকে, সেই সংস্থানের বিশেষ সার্থকতা আছে। কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার পর থেকে, আমার কথা ঠিক কি না, বার বার তার পরখ করে নিয়েছ। আমি যতদূর জানি বুনো মোরগ হচ্ছে আর একমাত্র পাখী, যার এই বিশেষত্ব আছে। এ তত্ত্ব তোমাদের

এখনও জানতে বাকী আছে। কৃষ্ণপক্ষের চেয়ে চাঁদনী রাত এদের বেশী পছন্দ। তাই বোধহয় শীগ্‌গিরই পৌঁছবে, তোমরা সহজেই তাদের চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে কার ছুঁচের মত লেজ আর কার পাখার মত লেজ, সে প্রভেদ চিনতে তোমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তোমাদের কাঁচা বয়সের ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখে, এ প্রভেদ অনায়াসেই ধরা পড়বে। একটি প্রবীণ চিত্রকর কিন্তু সে প্রভেদটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। স্বামী স্ত্রীকে এক চেহারা দিয়েছেন, কিন্তু তাও কি কখনো হয়? আর এক কথা, এই পাখীর বরক'নের মধ্যে এমনি ভাব যে, একেবারে মাণিক-জোড়। পুরুষ ধরা পড়লে মেয়েটিও ধরা দেয়; কাজেই আমি যখন শীকারে যাব, তখন তোমরা দুই ভাই বোনে দুটি পেতে পারবে। এদের সংখ্যা বেশী নয়, আর আমার বংশবৃদ্ধির অনুপাতে, তাদের নম্বর ঠিক রেখে গ্রেপ্তার করে আনবার সাধ্য হচ্ছে না। তাই এবারে প্রথম যেটি ধরা পড়বে, সেটি আমাদের বাড়ীর ছোট-লাটসাহেব ওরফে কালীবাবুকে নজর দিতে হবে, তা নাহলে তিনি নিশ্চয়ই মানহানির দাবীতে মহারাণীর দরবারে নালিশ রুজু করবেন, তখন আমার অবস্থা যে কি হবে, তা তোমরা বেশ আন্দাজ করতে পারছ।

স্নাইপ, আর স্নাইপ শীকারের কথা এখন বেশী বলব না। আমাদের হরিপুরের পৈতৃক বাড়ীর আঙিনা হতে, অনেক সন্ধ্যায় তোমরা চিতাবাঘের করাত-চলার মত আওয়াজ শুনেছ—আর যতদিন না আমার গুলি লেগে সে মরেছে, ততদিন আর সে শব্দের বিরাম হয় নি। তোমরা হয়ত দেখেছ, আমি যখন শীকার করতে যাই, তখন আমার বসবার টুলের সম্মুখে পাতায় ভরা ডালপালা দিয়ে একটা

আড়াল করে নিই। সে আড়ালটা যথেষ্ট ঘন কিম্বা মজবুত নয়, তবু নিজেকে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা মোহনলাল হাতিতে চড়ে বাঘের যাওয়া-আসার গলিপথ আবিষ্কার করে ফিরবার আগেই কতবার হয়ত বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছ, তারপর তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দেখেছ মস্ত একটা চিতাবাঘ ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে—গুলি একেবারে তার গলার নলি ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমাকে শীকার করাই ছিল তার মতলব, কিন্তু কপালে লেখা ছিল অন্য কথা, তাই তার মনের সাধ পোরবার আগেই সে লুটিয়ে পড়ল, আর যম-রাজা তার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। জানত যমের বাহন মহিষ, জীয়ন্ত থাকলে ব্যাঘ্রবীর মহিষটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পিছ-পা হত না বোধ হয়। যাই হোক তৃতীয় পাণ্ডব অৰ্জ্জুনের মত লক্ষ্য-বেধ করবার শক্তি আমার ছিল, তাই যমরাজার সুবিধা হয়ে গেল, তা নাহলে বাহনটি মারা গেলে ভদ্রলোকের চলা-ফেরার মুস্কিল হ'ত!

হরিপুরের চারদিকেই বুনো-শূয়োরের বসতি, পাবনার বুনো-শূয়োর তার বিপুল বপুর জন্যে বিখ্যাত। চতুর চিতা এদের লোভে লোভে চারিদিকে ফেরে, আর সুবিধা পেলেই অসহায় বরাহশিশুদের হত্যা করে উদর পূরিয়ে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। বনের ভিতরে যে সব গলিপথ দিয়ে জানোয়ার আনাগোনা করে, তাদের খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়; তাড়া খেয়ে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে, সেটাও অনুমান করা সহজ। আমি তোমাকে এ বিষয়ে আজ যা বলে দেব, তাতে কাল তোমার জ্ঞানলাভের সুযোগ হতে পারে। আর তার প্রসাদে পায়ে হেঁটে নির্ব্বিঘ্নে তুমি বেশ শীকার করতে

পারবে। আমরা যে শুনতে পাই, শীকার করতে গিয়ে অমুক লোকটা হঠাৎ মারা গিয়েছে, কিম্বা ঘায়েল হয়েছে, এ সব অনর্থ কিন্তু অকারণে ঘটে না, দৈবাৎ তো নয়ই! মূলে থাকে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা কিম্বা দুঃসাহসিকতা,—চল্‌তি কথায় যাকে বলে বোকামি আর গোঁয়ারতমি!

মৃগয়া শুধু খেলা নয়, এর মধ্যে বিপদও অনেক, তাই সাহস আর বুদ্ধি দু'য়েরি বিশেষ দরকার। তা না হলে, এ খেলায় কোন আমোদই থাকত না!

"No game was ever yet worth a rap
For a rational man to play,
Into which no accident, no mishap
Could possibly find its way."

আমি তোমাকে এখন যে সব চিঠি লিখছি, তা হতে তুমি প্রথম যেদিন বন্দুক হাতে শীকারক্ষেত্রে নামবে, সেদিন অনেক দরকারী জিনিস তোমার জানা থাকবে, অন্তত থাকা উচিত। আর তুমি যদি পাকা হুসিয়ার শীকারী হতে না পার, তার জন্যে আমি দায়ী হব না। শুধু পশুপাখীর প্রাণহানি করবার ক্ষমতা দক্ষ শীকারীর পরিচয় নয়। ইংরাজীতে যাকে gentleman বলে, তার ঠিক প্রতিশব্দটি আমাদের বাঙলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, তবু কথায় না বলতে পারলেও ভাবটি যে কি তা আমরা সবাই বুঝি। আমার মতে যে লোক জীবনের সব ব্যাপারেই যথার্থ gentleman, সেই ঠিক চৌকোষ শীকারী (sportsman). জীবনটা ত সহজ ব্যাপার নয়, বিশেষ

করে আমাদের ভারতবাসীদের জীবনের আশেপাশে চারিদিকেই কত বাধাবিপত্তি। শীকার করতে গিয়েও দেখবে সেখানে কত ঈর্ষা বিদ্বেষ, কত ক্ষুদ্রতা, কত দলাদলি, সহজ ভদ্রতাবিরোধী কত হীন ব্যবহার, এক কথায় বলতে গেলে কত অভদ্রতা বিরাজ করছে।

তোমার বয়সী ছেলেদের মধ্যে, বোধহয় তোমার মত মহাভারতের কথা আর কেউ অত ভাল করে জানে না, তাই তুমি জীবনে কি ভাবে চলতে পারবে, সে বিষয় আমার মনে বিশেষ কোন দ্বিধাই নেই। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, তার অর্থ তোমার মনে ভাল করে বসিয়ে দিতে চাই,—সে হচ্ছে "you must play the game"—অর্থাৎ খেলার নিয়ম মেনে খেলা চাই। চেনা ব্রাহ্মণের যেমন পৈতার দরকার হয় না, তেমনি ভাল খেলওয়াড়, হাতিয়ারের পরোয়া রাখে না। সব হাতিয়ারই তার হাতে চলে ভাল। এই যে জর্ম্মান-ইংরাজে যুদ্ধ হচ্ছে, এতে খুব ভালো করেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ভালো sportsman-রাই সব চেয়ে ভাল যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যে বীরত্ব, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, তার অনেক গুণই তারা মৃগয়া-ক্ষেত্রে অর্জ্জন করেছিল। এই বিপুল সমরাভিনয়ের নান্দী মৃগয়াতেই হয়েছিল। ফুটবলের হুড়োহুড়িতেও তুমি খুব মজবুত, তা আমি দেখেছি, ক্রিকেট খেলাতেও বেশ সতর্ক। এই দুই খেলাতেই লক্ষ্য ঠিক রাখবার ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, কৌশল ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে, শরীর সবল, অস্থি মজ্জা পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে। পুরুষের যা পৌরুষ, তারি সুচনা হয়। ইংরাজের বাচ্চার মধ্যে, এই যে খেলার উৎসাহ, আগ্রহ আর একাগ্রতা আছে, ইহাই পরে তাকে জীবনের ঝড়ঝাপটায় তরিয়ে দেয়, আর যুদ্ধের এই সঙীন বিপদের মধ্যেও খাড়া রেখেছে।

এই নৈপুণ্য, সাবধানতা, ব্যায়ামচর্চ্চার ফলে দৈহিক উৎকর্ষ, আজকার সংগ্রামের প্রাণান্ত পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কুলের ছাত্রদের যে কত বড় আর কেমন অটল সহায় হয়েছে, তা আর আমি তোমায় কি বলব? বৃহত্তর জীবনসংগ্রামেও এই সুকৃতির ফলে, তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যেই আমি তোমাকে আর তোমার ছোট ভাইটিকে বোঝাতে চাই যে, রাজার আর স্বদেশের সম্মানরক্ষার জন্যে যদি যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে সে মহৎ কর্ত্তব্যের আরম্ভ করতে হবে এই খেলার আখড়ায়, শৈশবের এই খেলাঘরে। একদিন আমার জীবনেও এই আকাঙ্খা জাগ্রত ছিল; বৎসরের পর বৎসর চলে গেল, কামনা আর কর্ম্মে পরিণত হল না। এখন সে স্বপ্ন আর আমার আশার রাজ্যে নেই, ক্রমশ স্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে আসছে। তবে তোমরা আমার জীবনে এসেচ, তাই আশা আবার দেখা দিয়েছে, আমাকে দিয়ে যা হয়নি, তোমরা তা করবে। যতক্ষণ না অনুভব কর যে তোমারি দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়তার উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করছে, যতক্ষণ না তুমি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এই বিশাল রাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের সঙ্গে পাশাপাশি ও সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পার, ততক্ষণ যথার্থ স্বদেশভক্তি তোমার মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। তোমাদের এই শক্তিতে প্রাণবান আর এই যোগ্যতার অধিকারী হ'তে দেখাই এখন আমার জীবনের পরম আকাঙ্খা, তাই আমি চাই, সংসারের এই রঙ্গভূমিতে সব রকমে তোমরা হুসিয়ার খেলোয়াড় আর মজবুত পালোয়ান হবে।

এ চিঠি শেষ করবার আগে, তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। বসুন্ধরা তাঁর প্রকৃতির যে সুন্দর বইখানি আমাদের চোখের সুমুখে

দিনরাত খুলে রেখে দিয়েছেন, এর চেয়ে ভালো পড়বার বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না, পড়ে শেষও করা যায় না। রোজই নতুন কথা লিখছেন, একঘেয়ে হয় না বলেই বুঝি এমন ভাল লাগে। বৈজ্ঞানিক তাঁর ঘরের কোণে ঘুপ্‌সি হয়ে বসে আপন খেয়ালমত চলেন,—অনেক সময় ভুল করে' চশমাটা যে চোখে পরবার নয়, তাতেই লাগান, তাই যা সত্যি, তা তাঁর সম্মুখে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তিনি যা হওয়া উচিত মনে করেন তার উল্টো কিছু দেখলে তাঁর মন বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু মাঠে বনে যাঁরা প্রকৃতির তত্ত্ব নিয়ে ফেরেন, তাঁরাই ঠিক খবরটি পান। সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখো, আর যা দেখলে তা মনে রেখো। যে সব জন্তু শীকার করা হয়, শুধু তাদের রীত-চরিত নয়, সব জন্তুরি অভ্যাস ব্যবহার ভারী আশ্চর্য্য। পাখীদের সম্বন্ধে একই কথা খাটে।—যখন শীকারের খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, বসে বসে দিন আর কাটে না, তখন যদি চারদিকের অপরাপর জন্তুদের চলাফেরা লক্ষ্য করবার অভ্যাস তোমার থাকে, তাহলে থিয়েটার দেখতে দেখতে মানুষের যেমন সময়ের জ্ঞান থাকে না, তেমনি তোমারও দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল তা বুঝতেও পারবে না।

কৃষিকাজ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বনজঙ্গল যত কাটা পড়ে যাচ্ছে, শীকারও তেমনি অল্প হয়ে আসছে। যে সব সুবিধা আমরা পেয়েছি, সে সুযোগ তোমরা খুব সম্ভবত পাবে না। খাল বিল শুকিয়ে আসছে—নদীর ধারার সে প্রবল স্রোত আর নেই; এর প্রধান কারণ দেশের বড় বড় বন কাটা পড়ে মাঠে পরিণত হয়েছে। এ বিষয় বেশী জোর করে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই, তবে শীকার

যে কমে আসছে, সেটা এমন প্রত্যক্ষ সত্য যে, তাও অস্বীকার করবার যো নেই। যে সব দেশে আগে বুনো-মোষ আর হরিণ দলে দলে চরে বেড়াত, এখন আর তাদের সেখানে দেখা যায় না, তারা অন্যত্র চলে গেছে, তাদের খুঁজে খুঁজে বাঘ ভালুকও দেশান্তরী হয়েছে। সেই জন্যে তোমাকেও হয়ত অনেক দূর দেশে যাত্রা করতে হলে, তবে যাত্রা যে নিষ্ফল হবে এমন কথা বলা যায় না। যা' চাও তা' পাবার জন্যে বহু ধৈর্য্যের আবশ্যক। জীবজন্তুর জীবনচরিত সম্বন্ধে একটু জ্ঞান সঞ্চয় করে নিয়ো। খাল, বিল, নদী, নালা, মাঠ, বন, পাহাড় পর্ব্বত মানুষের মন ভোলাবার অনেক ফন্দী জানে, এত আনন্দ দিতে পারে যা জীবনেও ফুরোয় না। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে : এই যে পশু পাখার গায়ের রং, এ যে কেন এমন, এ রহস্য ভেদ করবার আগে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়, অনেকখানি ধৈর্য্যের আবশ্যক। শুনতে পাই সূর্য্যের আলো বনের রাশি রাশি পাতার মধ্যে দিয়ে গোল হয়ে আসে, আর যেখানে গাছপালা ছাড়া ছাড়া, পাতার মধ্যে অনেক খানি করে ফাঁক সেখানে লম্বা হয়ে পড়ে। এই জন্যে চিতার গায়ে গুল বসান, আর বাঘের গায়ে ডোরা কাটা। একজন থাকেন গভীর বনে, আর একজন বনের ধারে ; এমনি পোষাক পরেন বলেই অলক্ষ্যে শীকারের উপর গিয়ে পড়তে পারেন। তৃণজীবি জন্তুদের গায়ের রং তাদের বাসস্থানের সঙ্গে এমনি মিশ খায় এবং পর্দ্দার মত আড়াল করে ঢেকে রাখে যে, শত্রুর চোখ সহসা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু এটা কি একেবারে বাঁধা নিয়ম, এর আর নড়চড় হয় না?—হয় বৈকি, বহুশত্রুবেষ্টিত একই জায়গায় হয়ত ঝলমলে পোষাকপরা অনেক পশুপাখী দেখা যায়—যাদের রং দূর হতেই

চোখে পড়ে। ঋতুপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পশুপাখীর গায়ের স্বাভাবিক রং আবার বদলাতেও দেখা যায়। যে দেশে শত্রুর সংখ্যা কম, সেখানে তাদের সাজপোষাকের জাঁক-জমক বেড়ে ওঠে। যেমন আজকাল যুদ্ধের দিনে খাকি পরা হয়েছে, শান্তির দিনে সেপাইরা রক্তের মত রাঙা পোষাক পরে' বেড়াত। দেশভেদে আর বিয়ের মতলবেও পশুপাখীরা রং বদলায়। যেমন বুড়ো-বর গোঁপে চুলে কলপ দিয়ে কাঁচা ছেলে সেজে মন ভোলাতে চায়, তেমনি আর কি! আমি তোমাকে গোড়ার কথা দু' একটা বলে দিতে পারি, কিন্তু এগোতে হলে সাবধান হয়ে দেখতে হবে, সতর্ক হয়ে বিচার করা চাই, তবে ত প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ করতে পারবে।

---

(২)

কলিকাতা, ১২ই অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা,

প্রথম চিঠিখানিতে উঁকি দিয়েই বুঝেছ সেখানি তোমার ভাই কল্যাণকে লেখা হয়েছে, এই দেখেই তোমার পুটপুটে রাঙা ঠোঁট দু'খানি একটু ফুলে উঠল, তার অর্থ—এ চিঠি ত দু'জনকেই লেখা যেতে পারত। কল্যাণকে আরণ্যবিদ্যা শেখান আর তোমাকে আমার শীকারের গল্প শোনান, এক ঢিলে দুই পাখীই শীকার করা চলত। কয়েক বৎসর পরেই তোমাকে আমাদের হিন্দুজীবনের যোগ্য গৃহ-লক্ষ্মীর কাজ করতে হবে। এ সাধ তোমার মনে হয়ত একটু আধটু আছে, আর তা ছাড়া, আমাদের প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের সাহায্যে এই সহজ সরল ইচ্ছাটি বিকৃত না হয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে। আজ-কালকার দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এড়ান বড় সহজ কথা নয়, কিন্তু সুদূর ইউরোপে তোমার বিদেশিনী বোনেদের জীবন যে বড় সুখে কাটে তা নয়, বরং অনেকেরি জীবন বৃথা কাজে ব্যর্থ হয়ে যায়। অনেককেই আবার নতুন করে শেখাতে হয় যে, স্ত্রী হওয়া, ছেলের মা হওয়াই সচরাচর নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ আর পূর্ণতা। আগে যে-পথে শুধু পুরুষরাই যাত্রা করতেন, এখন কালের গতিকে সেখান-কার মেয়েদের জন্যেও সেই পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। যে ভাবে, যে সুনিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তাঁরা এই নতুন পথের যাত্রী হয়েছেন, বিপদের মুখে তাঁরা যে নির্ভিকতা অথচ নারী-সুলভ সৌকুমার্য্য

ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে আশ্চর্য্য না হয়ে, তাঁদের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। কিন্তু তবুও সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করে' সুখী হলেও, স্ত্রীলোকের সবখানি মন যে এতে ভরে না, সে কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। পুরুষের যদি জীবনসঙ্গীর আবশ্যক থাকে, স্ত্রীলোকের আবশ্যক যে তার চেয়েও অধিক, তাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজের অঙ্গ, সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এককই সমাজের অংশ। আমাদের দেশে ইতিহাসের সুদূর অতীত আবার এতই সুদূর যে, তার অনেকখানি আমাদের চোখে ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি যে, পরিবারই সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, তার ধ্রুব পদ। স্ত্রীলোকেরা শুধু যে এই সভ্যতা গড়ে তুলেছেন তা নয়, তাঁদেরি যত্নে, তাঁদেরি প্রভাবে, আমরা কখনো বর্ব্বরতার ক্ষেত্রে পা বাড়াতে পারি নি। গৃহখানিকে সুন্দর পরিপাটি পরিচ্ছন্ন রাখা, জীবনের আদর্শ উন্নত পবিত্র রাখা, গৃহ বলতে যে আনন্দধাম আমাদের চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাকে চিরস্থায়ী করা,—এই কর্ত্তব্যই স্ত্রীলোকের বিশেষ কর্ত্তব্য; এর কাছে বিদেশী অনুকরণে "ফ্যাসানেবল" (fashionable) রমণীর জীবন কত তুচ্ছ, কি পর্য্যন্ত শ্রীহীন, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। এই নতুন জীবনের স্রোত ক্ষীণ-ধারায় এ দেশেও এসে পৌঁছেছে— তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না সত্যি, তবু সাবধান করে দেওয়ায় দোষ কি? কেননা অনেক পরিবারেই বিদেশী আবহাওয়া দেখা দিয়েছে, অনেকে বিনা বিচারে এই স্রোতে গা ঢেলে দিচ্ছেন। আসল কথায় ফেরা ভাল;—এখন হতে সব চিঠিই তোমার আর কল্যাণের দু'জনের নামেই লেখা হবে। তুমি শীকারের জীবনের

আনন্দ ও বিপদ দুই-ই বোঝ, কেন যে তোমাকে তার মধ্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তা তোমাকে বলবার বেশী দরকার নেই। তোমার সব চেয়ে অনুরক্ত বৃদ্ধ ভক্তটিও এ দুঃসাহসের কাজে অগ্রসর হবার সম্মতি দেবেন না। যে দিন আলোয় আকাশ উজ্জ্বল, বাগানে কত রং-এরি ফুলের বাহার, নীল আকাশের গায়ে কত টিয়ে চন্দনা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আমার শীকারের গল্প শুনবার জন্যে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন সে গল্প করতে আমার মনে যে গৌরব অনুভব করি, তা আর কারো কাছে হয়ত ছেলেমানষি বলে বোধ হতে পারে—তা হ'ক। সেই পুরাণ গল্পই আমি আজ আবার তোমাদের নতুন করে বলছি।

(ক্রমশ)

আমাদের শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা।*

—— –:০:——

এ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধে আজ এ ক্ষেত্রে যে বিষয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—সে বিষয়ের আমি ব্যবসায়ী নই। ছেলে-পড়ানো এবং স্কুল-চালানো সম্বন্ধে আমার কোনরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। প্রথমত আমি কখনও স্কুলমাষ্টারি করি নি; তার পর আমি নিজে নিঃসন্তান, সুতরাং ঘরেও কোন ছেলের শিক্ষার ভার আমাকে নিজের হাতে নিতে হয় নি; এবং অবস্থার গুণে পরের ছেলেরও প্রাইভেট-টিউটরি আমাকে কস্মিনকালে করতে হয় নি। এ সব কারণে যদি কেউ বলেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কথা কওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা, তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, অনেক সময়ে দর্শকের চোখে অনেক জিনিস ধরা পড়ে, যা যাঁরা কোনও বিশেষ কর্ম্মে একান্ত ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। এ সত্যের পরিচয় দাবা খেলায় নিত্যই পাওয়া যায়। পাকা খেলোয়াড়েরাও আনাড়ির উপরচাল অনেক সময়ে গ্রাহ্য করেন। আমি শিক্ষা বিষয়ে পরের ছেলের উপর কখনো কোনও experiment করি নি—কিন্তু বহুকাল থেকে মনোযোগ সহকারে

* বালিগঞ্জ জগবন্ধু বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত আলোচনা সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

সে experiment-এর পদ্ধতি এবং ফলাফল observe করে আসছি। সেই নির্লিপ্ত observation-এর ফলে আমার মনে শিক্ষার প্রকরণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মেছে বলে আমার বিশ্বাস, এবং কতকটা সেই বিশ্বাসের বলে এ সভায় মুখ খুলতে সাহসী হয়েছি।

এ সাহসের অন্য কারণও আছে। আমি একটি বিশেষ ছাত্রকে খুব ভালরকমই জানি, এবং সে ছাত্র হচ্ছেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। আমি বহুকাল পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছি, কিন্তু অদ্যাবধি বিদ্যার্থীই রয়ে গিয়েছি। এই বিদ্যার্থীটির শিক্ষার ভার আমি পাঠদ্দশাতেই অনেকপরিমাণে নিজের হাতে নিই,—তার পর থেকে যিনি ছাত্র তিনিই তার গুরু হয়েছেন। এ সূত্রেও গুরুগিরির সার্থকতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমার কতকটা জ্ঞানলাভ হয়েছে। তাই বলে অবশ্য এ ভুল আমি কখনও করে বসি নি যে, শিক্ষার যে পদ্ধতি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উপযোগী, সেই পদ্ধতি সকলের পক্ষে সমান উপযোগী। জ্ঞানের ক্ষুধাও সকলের মনে সমান নয়, তারপর এ বিষয়ে মানুষের রুচিও বিভিন্ন, অধীত-বিদ্যা জীর্ণ করবার শক্তিও কমবেশ। শিক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যে কতদূর সঙ্কীর্ণ ও অশাস্ত্রীয়,—সেই জ্ঞান আমার ছিল বলে, আমি ইউরোপের নব-শিক্ষা-শাস্ত্রেরও কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করেছি।

(২)

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে সকল দেশেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে নানারূপ মতভেদ আছে। মানুষের মন নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে

সকলের পক্ষে একমত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব; তা সত্ত্বেও ইউ-রোপ ও আমেরিকার বহু শিক্ষাচার্য্য ও দার্শনিকদের বহুদিনের সমবেত চেষ্টায় শিক্ষারও একটি Science এবং Art ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌ছে। এ শাস্ত্রকে Science নামে অভিহিত করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। কেননা ছেলেদের মন ও দেহ সম্বন্ধে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী এমন কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করেছেন যা, দেশকালনির্ব্বিচারে বালকমাত্রেরই সম্বন্ধে সমান সত্য। এবং এই সত্যের উপরেই শিক্ষার নব-পদ্ধতি গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। শিক্ষার এই নব আর্টের সার্থকতা হচ্ছে এই যে, এ আর্টের জ্ঞান থাকলে শিক্ষকেরা ভুল পথে যান না। অর্থাৎ তাঁরা এর সাহায্যে ছেলেদের সুশিক্ষা দিতে পারুন আর নাই পারুন—কুশিক্ষা দেন না। এও একটা কম লাভের কথা নয়। সুচিকিৎসার গুণে রোগী রক্ষা পাক্ আর না পাক্, কুচিকিৎসার ফলে সে বেচারা মারা যায়। এই শিক্ষা-শাস্ত্রের চর্চ্চা করলে স্কুলমাষ্টারেরা আর হাতুড়ে থাকেন না।

আমি আজকের সভায় এই Science এবং আর্টের আংশিক পরিচয় দেব স্থির করেছিলুম;—এই মনে করে যে, সে পরিচয় দিতে গিয়ে আমি বিপদে পড়ব না, অর্থাৎ বিবাদের সৃষ্টি করব না। ইংরাজি ও ফরাসী গ্রন্থ থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি, সে তথ্য বাঙলা করে আপনাদের কাছে নিবেদন করলে, আমি প্রথমত আত্মমত প্রকাশের দোষে দোষী হতুম না, দ্বিতীয়ত Professor James, Professor Findlay, Professor Dewey, Alfred Fouille প্রভৃতি বড় বড় মণীষীদের বাক্যাবলীতে আমার প্রবন্ধ অলঙ্কৃত করতে পারতুম; তাতে আমার প্রবন্ধের যে গৌরব বৃদ্ধি হত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, যে-কোন বিষয়েরই হোক্ না কেন, বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে, সে আলোচনায় আমাদের রাগদ্বেষ প্রকাশ করবার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না, এবং তার ফলে শ্রোতাদের অন্তরেও তাদৃশ রাগদ্বেষ আমরা উদ্রেক করি নে। আর ধর্ম্ম এবং পলিটিক্সের মত, শিক্ষাও যে এ যুগে মানুষে মানুষে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার হয়ে উঠেছে, ইউরোপের আজ একশ বৎসরের ইতিহাস পাতায় পাতায় এই অপ্রিয় সত্যের পরিচয় দেয়। বিশেষত শিক্ষার সমস্যা যখন হয় ধর্ম্ম নয় পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন সেই সমস্যা নিয়ে লোক-সমাজকে যে কি পরিমাণ উত্তেজিত করা যায়, তার প্রমাণ এই যে, বর্ত্তমান যুগে ফ্রান্স জর্ম্মানী বেলজিয়াম ইতালি প্রভৃতি দেশে, মধ্যে মধ্যে গুলিগোলার সাহায্যে সে সমস্যার আশু মীমাংসা করা হয়েছে। আর এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষা জিনিষটে অতি সহজেই ধর্ম্ম পলিটিক্স ইকনমিক্স প্রভৃতি জাতীয় আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের দেশেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাওয়া গেছে। তখন পলিটিক্সকে মুখ্য করেই আমরা শিক্ষা-সমস্যার একটা নূতন মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছিলুম। তার ফল কি দাঁড়িয়েছে, তা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা গড়তে চেয়েছিলুম একটি নব-নালন্দ—আমাদের হাতে কিন্তু সেটি হয়ে উঠেছে একটি workshop, এ ব্যর্থতার কারণ কি?—এর কারণ, আমরা শিক্ষাকে একটি বিশেষ পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ গণ্য করায়, যথার্থ শিক্ষার কোনও সুব্যবস্থা করতে পারি নি। উত্তেজনার মুখে কোনও কাজ করতে গেলে আমাদের পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট

হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়, বিশেষত সেই সকল ব্যাপারে, যে ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে হলে কিঞ্চিৎ স্থিরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির সহায়তা দরকার। বলা বাহুল্য লৌকিক আন্দোলনের প্রসাদে লোকের দৃষ্টি একমাত্র বর্তমানের উপরেই আবদ্ধ থাকে, এবং সে অবস্থায় লোকের অন্তরে হৃদয়াবেগ, বিচারবুদ্ধির স্থান অধিকার করে।

(৩)

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-তর্ক আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলুম—আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে পরোক্ষভাবে সেই তর্কে যোগদান করতেই আহ্বান করেছেন। আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতকার্য্যতা নিয়ে দেশে একটা মহা আন্দোলন চলেছে। ফলে একটা দলাদলি সৃষ্টি হবারও উপক্রম হয়েছে। এ আন্দোলনে লিপ্ত হতে হলে, এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, নচেৎ কোন পক্ষই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না, দু'পক্ষই সমান নারাজ হবেন। তার ফলে কোন পক্ষই আমার কথার কিছুমাত্র দাম দিতে রাজি হবেন না। অথচ এ ক্ষেত্রে কোন একটা দিক নিয়ে ওকালতি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরের খবর জানি নে,—না তার আয়ব্যয়ের হিসাব, না তার অধ্যাপকমণ্ডলীর গুণাগুণ। বিশ্বসরস্বতীর মন্দিরে তাঁর পূজো অথবা শ্রাদ্ধে দেশের টাকা পণ্ডিতবিদায় কিম্বা কাঙালীবিদায়ে বরবাদ হচ্ছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে জজ হয়ে বসবার পক্ষে আমার একটু বিশেষ বাধা আছে। আমি হচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঠিকে অধ্যাপক। এ অবস্থায় আমার রায়ের নিরপেক্ষতায়

কেউ বিশ্বাস করবেন না। সে রায় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটুও স্বপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি ইউনিভারসিটির নুন খাই বলে তার গুণ গাচ্ছি ; আর সে রায় যদি উক্ত বিদ্যালয়ের একটুও বিপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি নিমক-হারাম। এই উভয়সঙ্কটে পড়ে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে না-ছুঁয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে দু'-চারটি সাধারণ কথা বলতে চাই।

এ কালে একটি ইউনিভারসিটি চালানো বহু ব্যয়সাধ্য—এবং ইউরোপ আমেরিকার সকল শিক্ষাচার্য্যের মতে দিনের পর দিন সে ব্যয় বেড়েই যাবে। এক উচ্চ-শিক্ষা বন্ধ করা ছাড়া, এ ক্ষেত্রে ব্যয়ভার লাঘব করার উপায়ান্তর নেই। ইউনিভারসিটি কমিসনের রিপোর্ট অদ্যাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি, সুতরাং তার ভিতর সাপ ব্যাঙ কি আছে, আমি কিছুই বল্‌তে পারি নে। কিন্তু আমি ভরসা করে বলতে পারি যে, কমিসনের মতে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে যথার্থ বিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারে নি,তার অন্তত একটি কারণ—তার দারিদ্র্য। দরিদ্র বিদ্যালয় যে কি করে বিদ্যার খয়রাত করবে, তার হিসেব পাওয়া কঠিন।

এর উত্তরে অনেকে বলেন যে সু-গৃহিণীর কাজ হচ্ছে আয় বুঝে ব্যয় করা। আয় বাড়াবার চেষ্টা না করে ব্যয় কমাবার দিকে যত্ন করা যাঁরা সুবুদ্ধির কাজ মনে করেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা দিচ্ছেন। Post-graduate শিক্ষা ছেঁটে দেবার প্রস্তাব চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। এরূপ অস্ত্র-চিকিৎসার ফলে ইউনিভারসিটির দেহভার অবশ্য অনেকটা লাঘব হয়ে আসবে, তবে তাতে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি বাড়বে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এ প্রস্তাবের

অর্থ কি জানেন ?—বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তমাঙ্গ ছেদন করা। উচ্চ-শিক্ষার উচ্চতা নষ্ট করা যে সে শিক্ষার উন্নতির সদুপায়, এ জ্ঞান আমার পূর্ব্বে ছিল না ; আমার চিরকেলে বিশ্বাস এই যে, উচ্চ শিক্ষার সার্থকতা উচ্চ থেকে উত্তরোত্তর উচ্চতর হওয়ায়। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই যথার্থ সুব্যবস্থা, যার ফলে সমাজের অবস্থান্তর ঘটে, যার সহায়তায় মানুষ জীবনের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে। উচ্চশিক্ষা জিনিসটিকে আমরা যে এতদূর বহুমূল্য মনে করি, তার এক মাত্র কারণ—আমাদের বিশ্বাস যে শিক্ষার প্রসাদে মানুষ উচ্চতর জীব হয়।

আমার এ কথার উত্তরে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যাঁরা ব্যয়-কুণ্ঠ নন তাঁরা বলবেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগটি আগাগোড়া ফাঁকি ও ভুয়ো। এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই, অথচ কাজে কিছু হয় না। এ বিভাগের কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি অধ্যাপক আছে কিন্তু ছাত্র নেই ; এবং যে সকল ক্ষেত্রে ছাত্র আছে, সে সকল ক্ষেত্রে অধ্যাপকেরা নাকি একেবারেই অকর্ম্মণ্য।

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারি নে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাববশত। তবে বিনা প্রমাণে অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ গ্রাহ্য করে নিতে আমার মন সরে না। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা শতকরা নিরনব্বই জন হচ্ছেন আমাদের স্বজাতি। তাঁদের বিরুদ্ধে, এ অপবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার একদম চূর্ণ হয়ে যায়। সমাজ যদি শিক্ষকদের দুরছাই করে, তাহলে শিক্ষার কি সদগতি হয় ? এই অধ্যাপকদের মধ্যে অন্তত এমন জনকতক যদি থাকেন, যাঁরা অধ্যাপনার কাজটি ব্রত

হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাহলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বাইবেলের সেই পাকা কথাটা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, many are called but few are chosen, এবং আমাদের বিশ্ববিছালয়ে যে chosen few আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

তারপর উচ্চশিক্ষার কোন কোন বিভাগে যে ছাত্র জোটে না, সে দোষ কি বিশ্ববিছালয়ের না সমাজের? B. L. পড়বার জন্য হাজার হাজার ছেলে জোটে, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শেখবার জন্য যে দুই চারটির বেশি অগ্রসর হয় না, তার কারণ আমাদের মতে আইন অর্থকরী বিছা; কাজেই সে বিদ্যা এতটা অনর্থকরী হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য খুব আনন্দের বিষয় নয়।

আসল কথা এই যে, উচ্চ শিক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার উচ্চতার উপর। এস্থলে আমি আমার দার্শনিক গুরু Professor William James-এর গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নে। তিনি আমেরিকার শিক্ষকমণ্ডলীকে এই সত্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে বলেন যে—

"The renovation of nations begins always at the top among the reflective members of the State, and spreads slowly outward and downward."

ইউনিভারসিটি মাত্রেরই উদ্দেশ্য জনকতক reflective members of the State তৈরি করা, এবং তার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্তও রাখা চাই।

(৪)

আমরা যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছি, সেটির আসল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ত লর্ড কার্জনের University Act-এর ঠেলায় বহুদিন যাবৎ এই পথেই চলেছে। এতদিন ত কৈ আমরা এর হালচালের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করি নি। আজ কেন হঠাৎ আমরা এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম ?—

এর কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফী ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে জনকতক ছেলের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ পাছে বন্ধ হয়, এই ভয়ে আমরা বিচলিত হয়ে উঠেছি। সম্ভবত তাই হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, উচ্চ-শিক্ষা জিনিসটেই হচ্ছে আক্রা। ধরুন যদি বিশ্ববিদ্যালয় একদম অবৈতনিক হয়ে যায়, তাহলেও দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে সেখানে শিক্ষালাভ করা একেবারে আনায়াসসাধ্য হবে না। কেননা প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পরও আরও অন্তত চার-বৎসরের জন্য তার ভরণ-পোষণের ভার তার পরিবারকেই নিতে হবে। ষোল বৎসর বয়সে পৃথিবীর সকল দেশের ছেলেই উপার্জ্জনক্ষম হয়,—সে বয়সে তাকে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা একমাত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেই যদি নিজ নিজ ছেলেদের কর্ম্ম হতে লম্বা অবসর দেন, তাহলে দেশের আর্থিক দুরবস্থা বাড়বে বই কমবে না। এ সমস্যা পৃথিবীর সকল দেশেই উঠেছে, এবং সকল শিক্ষা-চার্য্যের মতে প্রতি জাতিকেই এ বিষয়ে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ সমস্যা পৃথিবীর কোন দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার

সমস্যা নয়। এ হচ্ছে Secondary education-এর সমস্যা। ইউ-রোপ ও আমেরিকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলে ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে' কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং এই বয়সে তাদের কতদূর সুশিক্ষিত করা যায়, এই হচ্ছে সে দেশের শিক্ষার প্রধান সমস্যা। Secondary education-এর সঙ্গে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, সুতরাং এ শিক্ষার ব্যবস্থা অবস্থা বুঝেই করতে হয়। উচ্চশিক্ষার কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার অবশ্য যোগ আছে, কেননা স্কুলের চৌকাট ডিঙ্গিয়েই কলেজে ঢুকতে হয়। কিন্তু তাহলেও এ দুই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, উপায়ও স্বতন্ত্র। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, উত্তেজনার মুখে বাণ নিক্ষেপ করলে সে বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে যা দাবী করছি, আসলে তা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার নিকট প্রাপ্য। আমার এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ আমরা post-graduate শিক্ষা বন্ধ করতে চাচ্ছি। ধরুন তা যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে যাকে আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয় বলি, তা একটি দু-ভাগে বিভক্ত Secondary School-য়ে পরিণত হবে। আমাদের দেশের B. A. এবং B. Sc. দু'জনে পৃথক্‌ভাবে যে শিক্ষা অর্জ্জন করেন, জর্ম্মানী প্রভৃতি দেশে যারা School-leaving certificate নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তারা প্রতিজনে ঐ উপরোক্ত দু'জনের শিক্ষার সম্বল নিয়ে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং আমাদের বদ্ধ-পরিকর হওয়া উচিত, উচ্চ শিক্ষার মাথা হেঁট করবার জন্য নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে খাড়া করে তোলবার জন্য। আমাদের বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে অনেকপরিমাণে নিষ্ফল হয়, তার মূল কারণ এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার কাঁচা ভিতের উপর উচ্চ শিক্ষার পাকা এমারত গড়া যায় না।

(৫)

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার এ প্রবন্ধের বিষয় নির্ব্বাচন এবং সেইসঙ্গে নামকরণও করে দিয়েছেন। সে বিষয়ের নাম হচ্ছে আমাদের "শিক্ষা ও বর্ত্তমান জীবনসমস্যা"। আমার মতে নামটা উল্টে দেওয়াই শ্রেয় ছিল, অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টি যদি "জীবন ও বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা" হত, তাহলে তার আলোচনা কতকটা আমার আয়ত্তের মধ্যে আসত। জীবন জিনিষটি চিরকালই একটা সমস্যা; আর একমাত্র বিদ্যালয় কোন দেশে কস্মিনকালে সে সমস্যার মীমাংসা করতে পারে নি; কেননা শিক্ষা জিনিষটে হচ্ছে জীবনেরই একটা বিশেষ অঙ্গ, এবং শিক্ষা-সমস্যাটা জীবন-সমস্যারই অন্তর্ভূত। শিক্ষার প্রভাব জীবনের উপর অবশ্যই আছে, অন্তত থাকা উচিত,—কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের প্রভাব প্রচ্ছন্ন হলেও প্রচণ্ড। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যালয় জাতীয়-জীবন হতেই তার রস রক্ত সংগ্রহ করে, সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, শিক্ষার সার্থকতা কিম্বা ব্যর্থতা অনেকপরিমাণে জাতীয় জীবন ও জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্য কিম্বা দৈন্যের উপর নির্ভর করে। স্কুলমাষ্টারের হাতে এমন কোনও পরশপাথর নেই, যার স্পর্শে ছেলেমাত্রেই সোনা হয়ে ওঠে। কি ভৌতিক জগৎ কি মানসিক জগৎ, উভয় ক্ষেত্রেই

আলকেমিতে বিশ্বাস আমরা হারিয়ে বসে আছি। এ বিষয়ে মনে দুরাশা পোষণ করলে, অবশেষে আমাদের হতাশ হতেই হবে। প্রচলিত শিক্ষার দৌড় কতটা, সে বিচার না করেই দেশসুদ্ধ লোক তাঁদের ছেলেদের শিক্ষার সেই চল্‌তি পথটা ধরিয়ে দেন, তারপর যখন দেখেন যে সে পথ ধরে তারা কোন একটা সিদ্ধি কিম্বা ঋদ্ধির রাজ্যে পৌঁছতে পারলে না, তখন তাঁরা স্কুল কলেজের উপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন। এক কথায়, তাঁদের মনে স্কুলকলেজের উপর এক সময়ের অগাধ এবং অযথা ভক্তি আর এক কালে সমান অগাধ ও অযথা রোষে পরিণত হয়। ছেলে পাস না করতে পারলে স্কুলকলেজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, এমন বাপ-মা এদেশে দুর্লভ নয়। বলা বাহুল্য এরূপ মনোভাবের মূলে যতটা পুত্রবাৎসল্য আছে, ততটা বিচারবুদ্ধি নেই। আর এ কথাও নিশ্চিত যে, একমাত্র হৃদয়াবেগের বলে পৃথিবীটিকে জয় করা যায় না। কামনা সুধু আমাদের সাধনার পথ নির্দ্দেশ করে দিতে পারে, তার বেশি কিছু পারে না। সুতরাং শিক্ষার কাছ থেকে কি ফল আমরা কামনা করি, প্রথমেই সেটি জানা দরকার।

(৬)

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে প্রশ্ন সাধু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তার সাদা বাঙলা হচ্ছে—"আমাদের লেখাপড়ার সঙ্গে আমাদের পেটের সম্বন্ধ কি"? এ প্রশ্নটা অবশ্য মানুষে না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না, কেন না পেটের ভাবনা আমাদের অধিকাংশ লোকেরই আছে, তারপর আমাদের সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত

ভদ্রলোকের পক্ষে এ ভাবনা সব চাইতে বড় ভাবনা এবং তাঁদের আশা যে স্কুল কলেজের শিক্ষার কৃপায় তাঁদের ছেলেরা হয় রসনা, নয় লেখনীর সাহায্যে, শুধু যে দুধেভাতে থাকবে তাই নয়, গাড়ি-ঘোড়াও চড়বে। আর যদি তা না হয় ত সে স্কুল কলেজের দোষ। বলা বাহুল্য যে, এ ইকনমিক-সমস্যার পূরণ, বিদ্যালয় একাহাতে করতে একেবারে অসমর্থ।

আমাদের জাতীয় দৈন্যের কারণ অনুসন্ধান করতে হলে স্কুল কলেজের বাইরে বহুদূরে যেতে হবে, এবং জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে হবে। যুবকদের জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়া অবশ্য শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু একমাত্র অর্থের দিকে নজর রাখলে আমরা শিক্ষার সকল অঙ্গ এবং সম্ভবত উত্তমাঙ্গই দেখতে পাব না। দেশশুদ্ধ স্কুল কলেজকে রাতারাতি Technical School-য়ে পরিণত করলে আমরা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে এক লম্ফে যে আরোহণ করব না সে কথা বলাই বৃথা, যে কথা বলা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে, উক্ত উপায়ে আমরা যে শিল্প-বাণিজ্যে চোখের পলক না ফেলতেই ইউরোপের উপর টেক্কা দেব তার কোনই সম্ভাবনা নেই। একমাত্র Technical School-এর শিক্ষাও যে বিশেষ কোনও কাজের হয় না, এ হচ্ছে ইউরোপের পরীক্ষিত সত্য। টেকনিকাল স্কুলে শিখে নাকি লোকে শুধু টেকনিকাল স্কুলের মাষ্টারি করতেই শেখে! হাতে কলমে শিল্প শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে কারখানা আর তার বৈজ্ঞানিক অংশ শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এই কারণে যারা কারখানায় কাজ করে তাদের সেই কাজের Science শেখবার জন্য কোন কোনও ইউনিভারসিটিতে এক একটি বিশেষ বিভাগ খোলা

হয়েছে। কেননা একদিকে যেমন হাতে ধরে না শিখলে যথার্থ শিল্পী হওয়া যায় না, অন্য দিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এই সব কারণে আমার মতে শিক্ষা সম্বন্ধে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের সম্বন্ধটা কি?—ইহলোকে মস্তিষ্কই আমাদের একমাত্র নিয়ন্তা, হস্তপদাদি সব তার আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র।

(৭)

শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাকে মানব-জীবনের কোনও একটি সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ মনে করলে সে শিক্ষা হয় নিষ্ফল হয়, নয় তার ফল ভাল হয় না। আমাদের মনোমত কোনও একটি বিশেষ ছাঁচে সকলকে ঢালাই করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, কেন না সে উদ্দেশ্য সাধন করবার এ যুগে কোনও উপায় নেই। ইউরোপে দেখা গিয়েছে যে, ও-হেন চেষ্টার ফলে শিক্ষকদের সেই মনগড়া ছাঁচ অধিকাংশ স্থলে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং যেখানে ভাঙ্গে নি, সেখানে যারা তাতে ঢালাই হয়ে এসেছে তারা মানুষ না হয়ে জড়পদার্থ হয়েছে, এবং তাদের নিয়ে সমাজকে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। মানুষ ধাতু নয়, কিন্তু দেহমনে একটি organism, এবং এই organism-এর স্ফুর্ত্তির সহায়তা করাই শিক্ষার একমাত্র কাজ; এক কথায় শিক্ষার ধর্ম্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। মনে রাখবেন যে, আমরা যাকে জাতি বলি সে হচ্ছে আসলে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি এবং তাছাড়া আর কিছুই নয়। আর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে

যখন মনের ও শক্তির পার্থক্য এবং তারতম্য আছে তখন শিক্ষারও এক উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা যাতে বহু লোকের ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করে এবং যার ফলে জাতীয় শক্তি নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবন অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। সকলের মাথাই যে ইউনিভারসিটির ক্ষুরে মোড়াতে হবে এমন কোনও কথা নেই। দেশসুদ্ধ লোকের মানুষ হওয়া চাই, কিন্তু সকলেরই পণ্ডিত হবার দরকার নেই। শিক্ষার এ উদ্দেশ্য যে সকলে সহজে মানতে চান না, তার কারণ, এদেশে আজও সকলে মানুষকে জীব হিসেবে দেখেন না, অনেকেই যন্ত্র হিসেবেই দেখেন।

তারপর অপরাপর জীবের সঙ্গে মানুষের একটি প্রকাণ্ড তফাৎ আছে। মানুষের অন্তরে মন বলে একটি পদার্থ আছে, জীবজগতের অপর কোনও প্রাণীর ভিতর যা নেই। পশু পক্ষীরা আজ তিন হাজার বৎসর পুর্ব্বে যে যেখানে ছিল, সে আজও ঠিক সেইখানেই রয়েছে। কিন্তু মানব-সমাজ এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় অন্নে বস্ত্রে ধনে রত্নে যে এতটা ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠেছে, মানুষ যে আজ এ পৃথিবীর অদ্বিতীয় প্রভু, সে পরিণতির মূলে আছে তার মানস-বল। মানুষের উন্নতির কারণ এই যে তার মনকে শিক্ষা দেওয়া যায়, অর্থাৎ তার আত্মশক্তিকে ফোটানোও যায় বাড়ানোও যায়। আমরাই হচ্ছি একমাত্র সেই শ্রেণীর প্রাণী যারা তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করতে পারে, এবং তা পরস্পরকে আদান প্রদান করতে পারে। আমরাই সুধু মনের কারবার করতে পারি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানের মূলধনও বাড়াতে পারি। শিক্ষার একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজ যারা ছেলে আর কাল যারা মানুষ হবে, পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানের তাদের উত্তরাধিকারী করা, এবং সেই সঙ্গে তাদের অন্তরে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করা ও নূতন কর্ম্ম-কৌশল লাভ করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির উদ্বোধন করা। যে যতটা জ্ঞান আত্মসাৎ করতে পরে, এবং যতটা কর্ম্ম-শক্তি লাভ করতে পারে, সে ততটা শিক্ষিত। কিন্তু দুই-ই হচ্ছে আসলে মনের জিনিষ এবং এ-দু'য়ের ভিতর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করাই বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। একটা ইংরাজি বচন আমাদের মনের উপর এ যুগে অযথা রকম অধিপত্য লাভ করেছে, সে হচ্ছে struggle for existence. এ কথা নিত্য শুনতে পাওয়া যায় যে, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যা আমাদের struggle for existence-এর সহায়। ঐ মস্ত কথাটার সাদা অর্থ হচ্ছে "আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা"। এ প্রচেষ্টা জীব-মাত্রেরই অস্থি মজ্জাগত, এবং যেহেতু আমরাও জীব সে কারণ ও-প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষেও নৈসর্গিক। কিন্তু পশু-পক্ষীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে আমাদের ভিতর উপরন্তু আর একটি প্রবৃত্তি আছে, যার নাম আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি। আমার স্বধু আত্মরক্ষা করেই সন্তুষ্ট থাকিনে, মনে ও চরিত্রে মনুষ্যত্বের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে ওঠবার প্রচেষ্টাও আমাদের প্রকৃতিতে স্বাভাবিক। এবং শিক্ষা হচ্ছে এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়। যদি কেউ বলেন যে তা বটে, তবে আগে আত্মরক্ষা পরে আত্মোন্নতি। এর উত্তরে আমার বক্তব্য ও দুয়ের ভিতর ওরূপ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নেই। আত্মোন্নতির প্রচেষ্টাই যে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়, এর প্রমাণ মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে দেয়।

(৮)

মানবজাতির যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানে মানুষ মাত্রেরই যে অধিকার আছে এবং সে অধিকারে অধিকারী হলে, মনুষ্যত্ব যে স্ফূর্ত্তি লাভ করে এই বিশ্বাসের বলে ইউরোপ ও আমেরিকায় ষ্টেটের খরচায় প্রতি বালককে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুধু তাই নয়, প্রতি বালক শিক্ষিত হতে বাধ্য। এরই নাম Compulsory primary education.

তারপর বার চৌদ্দবৎসরে এদের মধ্যে অধিকাংশকে জ্ঞানার্জ্জনের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ economic,—দরিদ্রের সন্তানের এই বয়সেই জীবিকা অর্জ্জনের প্রয়োজন হয়, কেননা তাদের বেশি দিন নিষ্কর্ম্মা রাখায় তাদের এবং সমাজের সমান ক্ষতি হয়। আরও একটি কারণ আছে। যাঁরা ছেলের মনের খোঁজ রাখেন তাঁদের মতে কৈশোরে পদার্পণ করবামাত্র অনেক ছেলের মনে কাজ করবার প্রবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান-চর্চ্চার অপ্রবৃত্তি জন্মায়,—অর্থাৎ তারা বাঁধা না খেয়ে সংসারে চরে খেতে চায়। সুতরাং ও বয়সে তাদের জোর করে কর্ম্মক্ষেত্র হতে দূরে রাখার কোনই সার্থকতা নেই। নিষ্ক্রিয় হলে যে জ্ঞানী হতেই হবে এমন কোনও নৈসর্গিক নিয়ম নেই। আমাদের যত ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তার ভিতর অনেকে যে যুগপৎ অশিক্ষিত ও অকর্ম্মণ্য হয়ে বেরোয় তার অন্যতম কারণ এই যে চৌদ্দ পোনেরো বৎসর বয়সে তাদের মনোমত কাজে তাদের লাগতে দেওয়া হয় নি।

তারপর চৌদ্দ থেকে আঠারো বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত

অল্পসংখ্যক ছেলেদের শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তার নাম secondary education. ইউরোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলেদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়। যৌবনে পদার্পণ করা মাত্র তারা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আমাদের সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে এই Secondary education-ই সব চাইতে মূল্যবান, কারণ এই শিক্ষাই আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। আঠার বৎসর বয়সে বিদ্যালয় থেকে নানা বিষয়ে সেই শিক্ষালাভ করে বহির্গত হওয়া আমাদের পক্ষে শ্রেয়, যে শিক্ষার ফলে জীবনের যে কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কৃতিত্ব লাভ করতে পারব। আমাদের economic অবস্থার সঙ্গে এই শিক্ষাই যথার্থ খাপ খায়। সুতরাং এ শিক্ষার যাতে সুব্যবস্থা হয় সেই বিষয়েই আমাদের একান্ত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আর এই বয়েসের মধ্যেই যে যথেষ্ট সুশিক্ষিত হওয়া যায় তার প্রমাণ ইউরোপের সকল দেশেই পাওয়া যাবে।

তারপর যে ক'টি বাকী থাকে তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করতে চেষ্টা করে। এও কতকটা অবস্থার গুণে। উচ্চ-শিক্ষা ইউরোপের অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়ের এক রকম একচেটে বললেও হয়। বাইশ তেইশ বৎসর বয়েস পর্য্যন্ত এক পয়সা রোজগার না করে পরিবারের অন্নে প্রতিপালিত এবং পরিবারের অর্থে উচ্চ শিক্ষিত হতে পারে এমন যুবকের দল সকল দেশেই দুর্লভ। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে তবে কি দরিদ্রসন্তান উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুফলে বঞ্চিত থাকবে? তার উত্তর—অবশ্য হবে যদি না তাদের নিজগুণে Scholarship নেবার ক্ষমতা থাকে। দরিদ্র সমাজও যদি পৃথিবীর সকল ভাল জিনিষে ধনীর সঙ্গে সমান অধিকারী হত তাহলে দারিদ্র্য ত আর

কষ্টের কারণ হত না। এরূপ হওয়া উচিত কি না, সে হচ্ছে শিক্ষার নয় সমাজের সমস্যা। ইউরোপের বহুলোকের মতে কোনও সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের এতটা অর্থগত পার্থক্য থাকাটা মোটেই মঙ্গল-জনক নয়। এঁদের চেষ্টায় যদি Socialistic State গড়ে ওঠে তাহলে হয়ত mass education এবং high education একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন সমাজে বড় ছোটর প্রভেদ থাকবে ততদিন শিক্ষারও উচ্চ নীচ প্রভেদ থাকবে। তবে এ সব প্রশ্ন আমাদের মুখে শোভা পায় না। এই জাতিভেদের দেশে আমরা সমাজে ছোট বড়র প্রভেদ মোটেই দূর করতে চাই নে, তার উপর এদেশে ধনীর অপেক্ষা দরিদ্রেরাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে বেশি লালায়িত, তার কারণ অধিকাংশ ছেলের বাপ ছেলেকে উচ্চ-শিক্ষিত করতে চান না, শুধু ধনী করতে চান। এবং সেই কারণ উচ্চ-শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব সস্তা করবার জন্য সকলে ব্যগ্র। এ মনোভাব স্বাভাবিক হলেও প্রশ্রয় পাবার উপযুক্ত নয়। আমার বিশ্বাস এইরূপ পারিবারিক মনোভাব দিয়ে জাতীয় শিক্ষার-সমস্যার সমাধান করা যায় না। ঘরের প্রদীপ ঘরই আলো করতে পারে কিন্তু বাইরের অন্ধকার ঘোচাতে পারে না ; তার জন্য চাই বাইরের আলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা যে কতটা অকিঞ্চিৎকর সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞান তবে আমার দুঃখের কারণ এই যে, আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটেই সুশিক্ষিত সম্প্রদায় নয়। যদি তাঁরা সত্যাই সুশিক্ষিত হতেন তাহলে কোন আপশোষের কারণ থাকত না, কেননা আমার দৃঢ় ধারণা যে যে-জাতির অনেকে সুশিক্ষিত সে জাতির কি আর্থিক কি আধ্যাত্মিক দুই ক্ষেত্রেই উন্নতি অনিবার্য্য।

(৯)

এ সত্য নিঃসন্দেহ সর্ব্ববাদী সম্মত যে, যে-শিক্ষা মানুষের মনকে মুক্তি দেয় না শক্তি দেয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আর যে মনের জীবনের উপর কোন সু-প্রভাব নেই সে মন মুক্তও নয়, শক্তিশালীও নয়, এক কথায় শিক্ষিতই নয়।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে জীবনকে চেপে ধরতে পারেন নি; এবং নিজ শক্তিতে তা যে মনোমত করে গড়ে তুলতে পারছেন না,—তার প্রমাণ আজকের দিনের এই অন্ন-সমস্যা। এই ব্যর্থতার পরিচয় একমাত্র economic ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমান পাওয়া যাবে। এই নব-শিক্ষার প্রভাব যে আমাদের সামাজিক জীবনের উপর এক রকম নগণ্য—তা কে অস্বীকার করবে? আর এ কথাও নিঃসংশয় যে আমরা যাকে ইকনমিক-সমস্যা বলি সেটি আমাদের সামাজিক মনোভাব, সামাজিক চরিত্র ও সামাজিক বিধি নিষেধের, এক কথায় সামাজিক জীবনের বিশেষরূপে অধীন। যদি কোন সমাজের প্রিয় প্রথা ও চিরাগত সংস্কার সকল বর্ত্তমান যুগে Struggle for existence-এর অনুকূল হওয়া দূরে থাক প্রতিকূল হয় তাহলে সে প্রথা ও সে সংস্কার বজায় রেখে জীবন-সংগ্রামে কি করে জয়ী হওয়া যেতে পারে? একমাত্র রসনা ও লেখনীর বলে? লেখনি ও রসনার শক্তিতে আমি অবিশ্বাসী নয়—কিন্তু সে শক্তি সত্যের আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও বৃদ্ধি পায়। মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ এ উভয় রাজ্যের যথার্থ জ্ঞানের উপরই মানুষের আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত। রসনা ও লেখনি দুইই অবশ্য মিথ্যাকে জন্ম দিতে পারে এবং তাকে প্রশ্রয়ও দিতে পারে,

কিন্তু তার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা জাতি বিশেষকে সুস্থ করতে পারে না, সজ্ঞান করতে পারে না, সক্রিয় করতে পারে না। আর সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সত্যপ্রিয় হওয়া চাই, সত্যসন্ধিৎসু হওয়া চাই, সত্যসন্ধ হওয়া চাই।

বিদ্যালয় ছেলেদের কাছে যুগযুগান্তর-সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দেয়, সে জ্ঞান আত্মসাৎ করা আর না করা সম্পূর্ণ ছেলের এক্তিয়ার। উচ্চ-শিক্ষা যুবকদের সঙ্গে মনুষ্যত্বের উচ্চ মনোভাব উচ্চ আইডিয়ালের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে—কিন্তু সে ভাব সে আইডিয়াল, যুবকদের মনে ঢুকিয়ে দিলেও সম্পূর্ণ বসিয়ে দিতে পারে না; যদি বাপ মা শিক্ষকের এবং সমাজ বিদ্যালয়ের সহায়তা না করে। ভুলে যাবেন না যে বিদ্যালয় একমাত্র শিক্ষালয় নয়—প্রতি পরিবার এক একটি শিক্ষালয় আর সমাজ হচ্ছে একটি মহাবিদ্যালয়। সমাজ যদি বিদ্যালয়ের উল্‌টো টান টানে তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফল কি হবে? স্কুল কলেজে অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের মনের উপর একটা বোঝামাত্র হয়ে থাকবে, এবং সে ক্ষেত্রে সংগৃহিত আইডিয়াল সুধু বক্তৃগত হয়ে থাকবে।

এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, সমাজ কি সত্যই চায় যে স্কুল কলেজের শিক্ষা সত্য সত্যই দেশের ছেলের মনে বসে যাক এবং তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করতে শিখুক? অপর পক্ষে এই কথাটাই কি সত্য নয় যে, সমাজ চায় এই নব-শিক্ষা যেন ছেলেদের মন স্পর্শ না করে; এবং যে মন দিয়ে স্কুল কলেজের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আর যে মন দিয়ে জীবনের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে—এ দুই মন সমান্তরল রেখায় ইংরাজিতে যাকে বলে

parallel lines-য়ে চলুক। আমরা চাই যে আমাদের ছেলেরা স্কুলে বলবে পৃথিবী গোল, আর ঘরে এসে মান্‌বে যে পৃথিবী ত্রিকোণ। কেননা একবার যদি তারা তাদের শিক্ষার দ্বারা আমাদের সামাজিক সংস্কার গুলোকে যাচাই করতে সুরু করে তাহলে তারা হয়ত দেখতে পাবে যে অনেক জিনিস যা আমরা চৌকোশ বলে ধরে নিয়েছি তা সুধু গোল নয়, মহাগোল। এরূপ মনোভাবের মূল কি তা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমাদের শিক্ষা একে বিদেশী, তায় আবার নূতন—আর আমাদের সমাজ একে স্বদেশী তায় আবার প্রাচীন, সুতরাং এর একটিকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে অপরটিকে হীনবীর্য্য করে দিতেই হবে। তাই অন্ধ সংস্কারের সাহায্যে আমরা শিক্ষাকে পঙ্গু করে ফেলতে সদাই যত্নবান!

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, যে শিক্ষায় মানুষের মনকে যুগপৎ মুক্তি ও শক্তি না দেয়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, কেননা তাতে মানুষকে person করে তোলে না। বহুকাল পূর্ব্বে জগৎ-পূজ্য জর্ম্মান দার্শনিক এই মহা-সত্যের আবিষ্কার করেন যে, person শব্দের অর্থ হচ্ছে Self conscious self-determining individual. মানুষে পশুতে এই খানে তফাৎ যে, পশু মাত্রেই কতকগুলি নৈসর্গিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত, তাদের ভিতর personality বলে কোনও জিনিস নেই। এইখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের মনে এবং চরিত্রে Self consciousness and self-determination-এর শক্তি উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাকে চিন্তা করবার ও কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত দরকার। তারপর আর একটি কথা;—আমরা যাকে শক্তি বলি তার অর্থ হচ্ছে reality-র উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা—বলা বাহুল্য

reality-র জ্ঞান না জন্মালে কেউ আর তার উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। আমাদের নব-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের reality-র জ্ঞান বাড়া দূরে থাক ক্রমে কমে যে আসছে তার কারণ আমাদের নব-শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা জিনিসটি সব দেশেই একটি সমস্যা কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটি যে এত ভীষণ সমস্যা হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ সে শিক্ষা আমাদের জীবনের পক্ষে অস্পৃশ্য। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, ইকনমিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা সবই এমন, যে আমাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই খাটাবার আমরা সুযোগ পাই নে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা খাটাবার আমাদের অধিকার পর্য্যন্ত নেই।—

এ অবস্থায় মনের সুখে থাকতে পারেন শুধু তাঁরা যাঁরা নিজের জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে গেলেই পরের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, এবং পরের দুরবস্থা যদি কালেভদ্রে চোখে পড়ে ত এই বলে মনকে আশ্বস্ত করেন যে, সে দুরবস্থা তাদের পাপেরই শাস্তি। কিন্তু এদেশে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা এই অতিনিন্দিত নব-শিক্ষার প্রসাদে স্বজাতির এই বর্ত্তমান দুর্গতি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিতে পারেন না, কিম্বা মোটার গাড়ীতে চড়ে কলেজষ্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় ইউনিভারসিটি Buildings নামক বুরোক্রাট এবং পেট্রিয়টের সমান চক্ষুঃশূল সরস্বতীর মন্দিরটিকে অম্লান বদনে ভূমিসাৎ করে দেবারও প্রস্তাব করতে পারেন না। দেশ উদ্ধারের অত সহজ মীমাংসা করবার পক্ষে তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি উভয়েই প্রতিবাদী হয়। ভবিষ্যতে বাঙালী জাতি, আমাদেরই অনুরূপ হবে, আমাদেরই মত তারাও নির্জ্জীব, নিরানন্দ এবং

পরভাগ্যোপজীবী হয়ে থাকবে, আমাদেরই মত তারা স্থধু ধনে নয় মন ও চরিত্রেও মধ্যবিত্ত হবে, আমাদেরই মত তারা জীবনের উৎসবের দর্শক মাত্র থাকবে, কিন্তু তাতে যোগদান করবার অধিকার লাভ করবে না ; এ কথা মনে হলে এ শ্রেণীর লোকদের মন নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তখন জীবনের সাধ তাদের মুখে তিতো লাগে। কিন্তু এ নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দিতে আমরা মোটেই চাই নে। একটি ইংরেজ লেখকের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, খানায় পড়ে থাকলেও আকাশের তারা দেখবার অধিকারে মানুষ বঞ্চিত হয় না। আমাদের ভবিষ্যতের গগনে সেই তারা দেখতে পাই বলে আমরা শিক্ষার উন্নতির জন্য এত লালায়িত। যদি কেউ বলেন যে আমরা যা দেখছি সে তারা নয়—আকাশকুস্থম, তার উত্তর তথাস্তু—কিন্তু তাই বলে খানায় পড়ে থাকাটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ, এ কথা মানতে আমরা প্রস্তুত নই। ওঠবার চেষ্টা আমাদেরই করতেই হবে, ফলাফল অদৃষ্টের হাতে।

(১০)

আমি বরাবর শিক্ষার উন্নতি, সমাজের উন্নতি, জাতির উন্নতি প্রভৃতি নানারূপ উন্নতির কথা বলে আসছি কিন্তু কি উপায়ে সে উন্নতি সাধন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ কোনও কথা বলি নি। বর্ত্তমান শিক্ষার সর্ব্বাগ্রে কোন্ সংস্কার করা প্রয়োজন, সংক্ষেপে সেই কথাটা বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। কারণ আমার ধারণা যে, সে সংস্কার না করে অপর সংস্কার করতে যাওয়া হচ্ছে শিক্ষার গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।

উন্নতি অবশ্য পরিবর্ত্তন স্বাপেক্ষ। জড়পদার্থের ধর্ম্ম এই যে তার নিজের ভিতর থেকে কোনও পরিবর্ত্তনের তাগিদ আসে না। লোষ্ট্রকাষ্ঠ অনন্তকাল পর্য্যন্ত এক অবস্থাতেই থাকতে পারে, যদি বাহ্যশক্তি তার পরিবর্ত্তন না ঘটায়।

জীবের ইতিহাস হচ্ছে নিত্য তার অবস্থার পরিবর্ত্তনের কাহিনী। প্রথমত বৃদ্ধির তারপর হ্রাসের। বীজ হতে বৃক্ষ জন্মায়, বড় হয়, একটা সীমা পর্য্যন্ত বাড়ে তারপর উত্তরোত্তর তার জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়ে এসে শেষে তার মরণ দশা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই হ্রাসবৃদ্ধি হয় নৈসর্গিক কারণে, এ অবস্থান্তর ঘটার ভিতর তার মনের কিম্বা ইচ্ছার কোন কার্য্য নেই। তার জীবন-মরণ দুই-ই দৈবাধীন, সে বেচারা অপমৃত্যুকেও এড়াতে পারে না, আত্মহত্যাও করতে পারে না।

মানুষের ধর্ম্ম কিন্তু স্বতন্ত্র। আমাদের দেহের হ্রাসবৃদ্ধির উপর আমাদের বিশেষ কোনও হাত নেই। আমরা ইচ্ছা করলে পর্ব্বত প্রমাণ উঁচুও হতে পারি নে, চিরদিন দেহে ছোট-ছেলেও থেকে যেতে পারি নে। কিন্তু মনের হ্রাসবৃদ্ধি অনেকটা আমাদের আয়ত্তাধীন। আমরা ইচ্ছা করলে মনে ছোট ছেলেও থেকে যেতে পারি, জ্ঞানী গুণীও হয়ে উঠতে পারি। তাই সমাজ সভ্যতা প্রভৃতি জিনিস মানুষ তার মনোমত করে গড়তে পারে এবং সে গড়ার ভিতর মানুষের ইচ্ছা-শক্তিই আসল শক্তি। সংক্ষেপে মানুষে আত্ম-চেষ্টায়—তার অবস্থার অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে, এবং মানব-সমাজের উন্নতি তার অভিপ্রায়কে অনুসরণ করে—সে উন্নতি অদৃষ্ট নয়, পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে মানুষ আত্মহত্যাও করতে পারে।

মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে বদলাতে পারে বলে সে বদল উন্নতির সহায়ও হতে পারে অবনতির সহায়ও হতে পারে। প্রতি বদলের মুখে এ উভয় সঙ্কটে মানুষকে যে পড়তে হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ কথাও নিঃসন্দেহ যে অবনতির ভয়ে যদি মানুষের আত্ম-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বন্ধ করো তাহলে সেই সঙ্গে তার উন্নতির পথও রোধ করা হবে। সুতরাং এ বিষয়ে মানব-সমাজকে experiment করতে দিতেই হবে, ফলে উন্নতি কি অবনতি হবে তার প্রমাণ ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে।

মন ও জীবনের এই লড়ালড়ি পৃথিবীর সকল দেশে চিরদিনই চলে আসছে, কারণ মন চিরকালই জীবনকে নূতন পথ দেখাতে চায়, আর জীবন চিরকালেই তার অভ্যস্ত পথ ত্যাগ কয়তে আপত্তি করে। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergson বলেন যে, জীবনের পক্ষে এক জায়গায় জমে গিয়ে জড়-পদার্থে পরিণত হবার দিকে একটা সহজ প্রবণতা আছে সেই জন্য মনের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাকে ক্রমান্বয়ে টেনে তোলা, নূতন নূতন পথে তাকে চালিত করা।

নব শিক্ষার সহিত প্রাচীন সমাজের এই লড়াই সব দেশে সব যুগেই হয়ে আসছে। আমাদের দেশে যে হচ্ছে তার ভিতর কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই। এমন কি দু-পক্ষ সকল দেশে একই বুলি আওড়ান। নূতন জ্ঞান এবং, তৎপ্রসূত নূতন আইডিয়াল জীবনকে ডেকে বলে আমাকে অনুসরণ কর, তোমাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাব, আর প্রথা-গ্রস্ত জীবন বলে যে-পথে বহুদিন চলে আসছি সে পথ ত্যাগ করলে সর্ব্বনাশ হবে, কেননা তোমার ঐ নূতন পথ ত্রিদিবের নয়, রসাতলের পথ।

তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে অপর দেশে নবশিক্ষা সামাজিক জীবনকে খাড়া করে তোলে আর আমাদের দেশে সামাজিক জীবন নবশিক্ষার কোমর ভেঙ্গে দেয়। এর কারণ কি? সহজ উত্তর আমাদের নবশিক্ষা বিদেশী শিক্ষা বলেই, জীবনের উপর তার প্রভাব কম। কিন্তু এ উত্তর, সহজ হলেও সত্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাস যুগ যুগ ধরে, এই সত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে যে, এক জাতির মন অপর আর এক জাতির মনের স্পর্শে জেগে ওঠে, সংঘর্ষে সজ্ঞান হয়। কালক্রমে জাতীয় মন যখন নিবে আসবার উপক্রম হয়, তখন বাইরে থেকে তাকে উস্কে দেওয়া দরকার। সত্য তা সে দেশীই হোক বিদেশীই হোক সত্য, এবং সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এদেশে শিক্ষার এ-দুর্গতির কারণ যে সে শিক্ষা বিদেশী ভাষাতে দেওয়া হয়।

আমরা এই বলে জাঁক করি যে ইংরাজি আমরা যেমন শিখি পৃথিবীর অপর কোনও জাত তেমন শিখতে পারে না। কথাটা কিন্তু সত্য নয়। অপর জাতের সঙ্গে নিজেদের তুলনা না করে, যদি নিজেদের বিদ্যের বহরটা মেপে দেখি ত, দেখতে পাই যে আমাদের অধিকাংশ লোকের ইংরাজি জ্ঞান যেমন মুষ্টিমেয় তেমনি খেলো। অধ্যাপকেরা বই না পড়িয়ে নোট দেন বলে তাঁদের উপর চারধার থেকে আক্রমণ হচ্ছে। কিন্তু এ নোট-দানের কারণ কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যার্থীদের অধিকাংশের ইংরাজিভাষার দখল এত কম যে তাঁরা Text-book পড়ে তার মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারেন না,—নিজের ইংরাজিতে সে মর্ম্ম প্রকাশ করা ত তাঁদের একেবারে সাধ্যের অতীত। এ অবস্থায় অধ্যাপকদের দায়ে পড়ে, বিশ্ববিদ্যার সার সংগ্রহ করে তার এমন সব নিরেট বড়ি পাকিয়ে দিতে হয়, ছেলেরা

যা কলেজে গিলে সেনেট হলে উগলে দিতে পারে। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, যে যত বেশি বড়ি গিলিয়ে দিতে পারে সে—তত ভাল অধ্যাপক, আর যে যত বেশি বড়ি ওগলাতে পারে সে তত ভাল ছেলে। তারপর আর একটি কথা, হাজার অপ্রিয় হলেও সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য। অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যে অনেকের ইংরাজি-জ্ঞান ছাত্র-বাবুদের জ্ঞানের চাইতে বড় বেশি প্রবৃদ্ধ নয়। এর কারণও স্পষ্ট। কাল যাঁরা শিষ্য ছিলেন আজ তাঁরা গুরু। হতে পারে যে জর্ম্মান ফরাসী ইতালীয়দের চাইতে আমাদের ইংরাজি জ্ঞান বেশি। তার কারণ এ শিক্ষার আমরা যে দাম দিই সে দাম তারা দেয় না। সে দাম হচ্ছে স্বভাষাকে ভাসিয়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারানো। বিদেশী ভাষার মারফৎ পাওয়া শিক্ষা আমাদের মনে বসে না, কথার কথা থেকে যায়। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে এত বক্তৃতা করেছি যে এস্থলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের স্কুলে ছেলের মন এবং বস্তুজগতের মধ্যে, ইংরাজি ভাষা একটি পুরু পর্দ্দার মত ঝুলে থাকে, ফলে তাদের মনে reality-র জ্ঞান এক প্রকার নষ্ট হয়েই যায়। বস্তুর সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ যে বাচ্য বাচকের সম্বন্ধ, বালককালে বিদেশী ভাষা শিখতে গেলে সে জ্ঞান হারানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ, বিদেশী ভাষার শব্দের সঙ্গে বস্তুর কোনও সাক্ষাৎ যোগাযোগ নেই, আছে সুধু স্বদেশী শব্দের সঙ্গে। Translation এবং re-translation-এর প্রসাদে সুধু এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে। ভাষার সঙ্গে reality-র যোগাযোগের জ্ঞান জন্মে না।

স্কুলে এ জ্ঞান একবার হারালে কলেজে এসে আর তার পুনরুদ্ধার করা যায় না। এর প্রমাণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সম্প্রতি আমি এ বৎসরের প্রাথমিক B L-এর কাগজ পরীক্ষা করছি, শ'খানেক কাগজ দেখা হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচখানিতে moveable এবং immoveable property-র কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে জানেন?—দু'দিন পরে যাঁরা উকিল হবেন তাঁদের ধারণা যে-সম্পত্তি অচল, তাই immoveable property, যথা—পর্ব্বত এবং যে-সম্পত্তি সচল তাই হচ্ছে moveable property, যথা—নদী। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা যে কি তা বাড়ীর চাকর দাসীরাও জানে, কিন্তু স্কুলের ইংরাজি শিক্ষার কৃপায় B. A. B. Sc রাও জানেন না। একজন লিখেছেন যে, incorporeal property হচ্ছে সেই সম্পত্তি which has no physical existence। জবাব ঠিক হয়েছে, কিন্তু তিনি তার উদাহরণ দিতে গিয়ে, copyright ইত্যাদির নাম উল্লেখ না করে, উল্লেখ করছেন "air." কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্? কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। যিনি লিখেছেন air হচ্ছে সেই বস্তু যার কোনও physical existence নেই শুনতে পাই তিনি হচ্ছেন B. Sc. পাশ! এই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, স্কুলে সকল শিক্ষা ইংরাজি ভাষার মারফৎ হওয়াতেই আমাদের শিক্ষা এতটা নিস্ফল হচ্ছে? আপনারা যদি Secondary School-য়ে ইংরাজিকে Second language করতে পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস দশ বৎসরের ভিতর বাঙালী জাতির মনের চেহারা ফিরে যাবে, এবং তখন দেখা যাবে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে আর আকাশ পাতাল প্রভেদ নেই।

আমি এই বলে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি যে, আমি একজন ষ্টুডেণ্ট এবং সেই ষ্টুডেণ্ট হিসেবেই আমি বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যার আলোচনা করেছি, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সমস্যাটা কি তাই বুঝতে চেষ্টা করেছি, তার কোনও কাটা-ছাঁটা মীমাংসা করে দিতে সাহসী হই নি। আমি মানি যে পেটের ভাবনা অবশ্য আমাদের সর্ব্বপ্রধান না হলেও সর্ব্বপ্রথম ভাবনা কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে পেট যদি মস্তিষ্কের চালক হয়, তাতে পেটের কিছু লাভ হয় না, কিন্তু মস্তিষ্কের অশেষ ক্ষতি হয়। বাঙালী যে মারোয়াড়ি নয় এ দুঃখ আমরা আগেও করেছি। রামমোহন রায় ও রবীন্দ্রনাথের স্বজাতির সর্ব্বনাশ যে literary education-এর ফলে হয়েছে, এই বিশ্বাসের বলে আমরা তথাকথিত Scientific education-এর জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিলুম। ফলে কলেজে একদল ছেলেদের গোড়াথেকেই একমাত্র বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত করা হল। সে শিক্ষার প্রসাদে আমরা কি লাভ করেছি? আমাদের আশা ছিল, যে ছেলেরা কাব্য দর্শন ইতিহাস ব্যাকরণ ত্যাগ করে বিজ্ঞান ধরলেই, এক কথায় লাইব্রেরী ছেড়ে লাবরেটরিতে ঢুকলেই বঙ্গমাতা অন্নপূর্ণা হয়ে উঠবেন, অন্তত B. Sc.-দের ঘরে টাকা রাখবার আর জায়গা থাকবে না। কিন্তু আজ কি দেখতে পাচ্ছি? দেশ 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' হয়ে ওঠা দূরে থাক, B. Sc.-র অন্নচিন্তা B. A-র চাইতে একচুলও কম নয়, এবং উভয়ের বাজার-দর এক, বড় বাজারেও, বৌ-বাজারেও।

আপনারা এই কথাটা স্মরণ রেখে শিক্ষার নূতন ব্যবস্থা করবেন যে বাঙালী আসলে সরস্বতীভক্ত জাত এবং তারা যেদিন ভাবের চর্চ্চা

থেকে বিরত হবে, সেদিন তারা তাদের স্বধর্ম্ম হারাবে। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি কলকারখানা গড়তে না পারুক, তার চাইতে একটা ঢের বড় জিনিস গড়েছে এবং তার নাম হচ্ছে নব-ভারত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কথিকা।

—※—
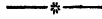
বনের ছায়াতে যে, পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জ্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠ্‌ল, "আমাকে চিন্‌তে পার না" ?

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম, বল্‌লেম, "মনে পড়চে বটে কিন্তু ঠিক নাম করতে পারচিনে"।

সে বল্‌লে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক"।

তার চোখের কোণে একটু ছল্‌ছলে আভা দেখা, দিলে যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বল্‌লেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মত কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেচ" ?

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাস্‌লে। আমি বুঝলেম সবটুকু রয়ে গেচে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েচে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, "আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজো তোমার কাছে রেখে দিয়েচ" ?

সে বল্‌লে, "এই দেখনা আমার গলার হার"।

দেখ্‌লেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপ্‌ড়িও খসে নি।

আমি বল্‌লেম, "আমার আর ত সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও ত ম্লান হয়নি"।

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বল্‌লে, "মনে আছে, সেদিন বলেছিলে তুমি সান্ত্বনা চাওনা, তুমি শোককেই চাও"!

লজ্জিত হয়ে বল্‌লেম, "বলেছিলেম বটে, কিন্তু তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন্ ভুলে গেলেম"।

সে বল্‌লে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি ত ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও"।

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বল্‌লেম, "একি তোমার অপরূপ মূর্ত্তি"!

সে বল্‌লে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েচে শান্তি"।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

একখানি পত্র।*

—:*:—

জেমো, কান্দি।

১লা জুলাই, ১৯১৬।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ পাইলাম। আনন্দ এই যে ঐ সকল দুরূহ প্রশ্ন আপনার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে—বিষাদ এই যে আপনার পত্রে একটা যেন অবসাদের ভাবের ছায়া আছে।

যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। মৃত্যুর সম্মুখে মানুষ চিরকাল ভীত, মরণকে জয় করিবার জন্য ইতিহাসের আরম্ভ হইতে মানবের চেষ্টা। যে চেষ্টায় মানব-জাতির অগ্রনীগণ বিমুখ হইয়াছেন—সর্ব্বদেশের সুধীগণ যেখানে পরাহত হইয়া আসিয়াছেন, আমার মত ক্ষুদ্র-ব্যক্তির নিকট সেই সেই উৎকট সমস্যার মীমাংসা পাইবেন কিরূপে? আমার নিকট যে উত্তর চাহিয়াছেন সে আমার প্রতি আপনার নিরতিশয় শ্রদ্ধার ফল।

---

* আজ ক'দিন হল—৺ত্রিবেদী মহাশয়ের একখানি পত্র আমার হস্তগত হয়েছে—যেখানি প্রকাশ করবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারলুম না। কেননা এই চিঠিখানিতে লেখক তার মনের কথা আশ্চর্য্য রকম সরল ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ চিঠি প্রকাশ করবার কোন বাধাও নেই, ব্যক্তি বিশেষকে লেখা হলেও এ পত্র প্রাইভেট নয়, কেননা যাঁকে এ পত্র লেখা হয়েছিল সে ব্যক্তি ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ, তিনি একটি ষোলো বৎসরের যুবককে পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু বলে সম্বোধন করেছেন। সম্পাদক,

খুব সম্ভব আপনি আমাকে কখনও দেখেন নাই। দূর হইতে কাগজ পত্রের খ্যাতিতেই আমার পরিচয় পাইয়াছেন। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইতেন আমিও সাধারণ ক্ষুদ্র-মানবের ন্যায় অতি দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ জীব—আমাতেও কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই। আপনিও যেরূপ জীবন সমস্যার সমাধান না পাইয়া সংশয় সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, আমার দশাও ঐরূপ। মরণের রহস্যের সম্মুখে জীবের প্রাণ ব্যাকুল—কোনো মীমাংসা পাইবার কোন উপায় বোধ করি নাই।

আপনার প্রশ্নগুলির আমি যে আলোচনা না করিয়াছি তাহা নহে। মনুষ্যমাত্রেই করে, আমিও করিয়াছি—হয়ত অনেকের চেয়ে একটু বেশী মাত্রাতেই করিয়াছি। কিন্তু উত্তরে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা একখানি ক্ষুদ্র চিঠিতে কিরূপে প্রকাশ করিব?

আমি যতদূর বুঝিয়াছি, যতক্ষণ মানুষের জীবভাব থাকিবে, ততদিন মরণের ভয় হইতে নিষ্কৃতি নাই—ততদিন religiousness-ই একমাত্র উপায়;—এই religiousness-এর মোটামোটি দুইটা লক্ষণ, একটা optimistic.

—তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা—ইহা রামপ্রসাদের ভাব,—আমি যখন মায়ের চরণ আঁকড়াইয়া আছি তখন কি ভয়—শমন বেটা কি করিবে? এইরূপ attitude কোনরূপ যুক্তিতর্ক সংশয়ের ধার ধারে না—জোর করিয়া যুক্তিতর্ক ঠেলিয়া ফেলা আবশ্যক। যে পারে সেই সফল হয়।

আর একটা দিক্ দৈন্যের দিক্—আমি পাপী তাপী দীন, আমার

কি হইবে—হয়ত তিনি দয়া করিয়া টানিয়া লইবেন—যদি তিনি কূলে ধরিয়া উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা। ইহাতে একটা নৈরাশ্য, Despondency আনে যে অতি উৎকট অবস্থা।

বৈষ্ণব ও Christian সাধুদের মধ্যে অনেককে এই পথে Slough of the despond-এর ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে—কেহ কেহ সম্পূর্ণ acquiescence দ্বারা শান্তিলাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত খৃষ্টানদের মধ্যে John Bunyan. আমাদের মধ্যে চরম দৃষ্টান্ত স্বয়ং চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের পক্ষে মরণের বিভীষিকা ছিল বলিলে অনুচিত হইবে—এখানে বিরহের যাতনা—প্রাণ স্বরূপের সহিত বিরহ সম্ভাবনায় তিনি কেবলই হা হা করিয়া গিয়াছেন—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শান্তি অনুভব করেন নাই। তাঁহাকে যদি ভগবান বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে তিনি মানুষকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু যাঁহারা সাধনার পথে পথিক তাঁহাদিগকে অল্প-বিস্তর এই বিরহব্যথা ভোগ করিতে হয়।

ইহা সাধনোন্মুখ জীবের অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি। তাঁহারা মরণ জানেন না, বিরহ জানেন—অমরত্ব তাঁহাদিগের নিকট অর্থহীন, তাঁহারা মিলনের ইচ্ছায় ব্যাকুল।

মনে যতক্ষণ জীবভাব থাকিবে ততক্ষণ সংশয় যাতনা যাহা মরণ ভয় হইতে উৎপন্ন তাহা থাকিবেই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যতক্ষণ আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ মরণ ভয় যাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম—আর কোনো ব্রহ্ম নাই—আমিই জগৎকর্ত্তা ও জগৎ-বিধাতা,—এই যে জন্ম মৃত্যু জীবন—এ সমস্তই আমার লীলা-

ভিনয়—এইটুকু উপলব্ধি না হইলে বিরহভাব ঘুচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও উপলব্ধির ব্যাপার—কোন চেষ্টা করিয়া তর্কদ্বারা এ উপলব্ধি ঘটিবে না।

আমার রচনার মধ্যে, "জিজ্ঞাসা"র ও "কর্ম্মকথা"র শেষ দিকে—এই কথাটি বুঝাইবার যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। যে চেষ্টায় স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য কৃতকার্য্য হন নাই, তাহাতে আমার মত কীট কতদূর করিবে !

যাহাই হোক আপনার মনের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, আপনাকে দু'একখানা গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। যদি না পড়িয়া থাকেন, পড়িতে পারেন। বাংলায় ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অভয়ের কথা" গ্রন্থখানি পড়িবেন। ইংরাজিতে William James-এর Varieties of religious Experience (Clifford Lectures) খানি পড়িতে পারেন। আমি religiousness-এর যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাই তাহা আপনি ঐ পুস্তকে পাইবেন। এ বিষয়ে আলোচনার অন্ত নাই—আমি নিজে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত নিজের মনে খাড়া করিয়া তাহাই আশ্রয় করিয়া কতকটা শান্তিতে আছি। কিন্তু ক্ষুদ্রপত্রে আপনাকে তাহা কিরূপে বুঝাইব ? উহা আমার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল—এখন উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। জীবন সমস্যার সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা attitude-এ বসাইয়া রাখিয়াছি—আপনাকে সহসা কিরূপে সেই attitude-এ আনিব ?

আমি কয়েক বৎসর হইতে মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যে কাতর—সকল সময়ে চিঠি লিখিতে পারি না। আমার হস্তাক্ষর অতি অস্পষ্ট। এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পত্রদ্বারা এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা ত অসম্ভব বটেই, আমার শারীরিক অবস্থা মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্যের হেতু আমি উহাতে একেবারেই পরাঙ্মুখ। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধাবলি গত দুই বৎসর ধরিয়া বাহির হইতেছে, উহার শেষভাগে এই বিষয়ে কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে।

আপনি আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার নমস্কার লইবেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

মুক্তি।

—:o:—
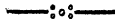
যে সময়ের কথা ব'লছি তখন দার্জ্জিলিং-এ মানুষের অভাব না থাকলেও দেবতার প্রভাব একেবারে হ্রাস হয় নি; এবং বার্চ্‌হিলে একালের শিশু-মানবের দোলনার পরিবর্ত্তে সে কালের শিশু-দেবতার পুষ্পধনুটাই ছিল একমাত্র খেল্‌বার জিনিস—যদিও দেখ্‌বার নয়।

এ কহিনীটি আর কিছুই নয়—সেই আদিযুগের বার্চ্‌হিল-ইতিহাসের একটা অধ্যায় মাত্র; এবং এটা রচিত হ'য়েছিল শুদ্ধ তিনটি প্রাণীকে নিয়ে—একটি পুরুষ, একটি নারী এবং একটি গাধা।

পুরুষটি থাকত চৌরাস্তার কাছে একটা হোটেলে—নিতান্ত অনাত্মীয়দের মধ্যে; নারীটি থাকত জলাপাহাড়ের একটা বাড়ীতে—আত্মীয়স্বজনের মধ্যে; এবং গাধাটি থাকত ভুটিয়া-বস্তির একটা আস্তাবলে—আত্মীয়-অনাত্মীয় উভয়বিধ চতুষ্পাদেরই মধ্যে।

নিয়তির বিধানে এই তিনটি প্রাণী একদিন বার্চ্‌হিলে একত্রিত হ'য়েছিল—এবং তারই ফলস্বরূপ এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি।

(২)

সে দিন শরতের অপরাহ্ন। বার্চ্‌হিলের সর্ব্বোচ্চ চূড়োটার পশ্চিমে খানিকটা নীচের দিকে একখানা নাকবারকরা পাথরের

উপর নারী ব'সেছিল এবং পুরুষ তার পায়ের তলায় আর একখানা পাথরে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নারীর পরিধেয়ের আগুন-রংটা তাকে মানিয়ে ছিল ভাল। এই থেকে তার রূপের এবং বয়সের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। পুরুষের রূপের পরিচয় অনাবশ্যক এবং তার গুণের পরিচয় দেবার মতন বয়স তখনও হয় নি।

পুরুষ ব'লছিল—"সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক করে ফেলেছি। রাত্তির দেড়টার সময় ডাণ্ডি অপেক্ষা ক'রবে—তোমাদের বাড়ীর সেই উপরকার রাস্তাটায়। রাত্তির থাকতেই ঘুম্ ছাড়িয়ে যাবো এবং কাল এমন সময় আমরা কালিম্পং-এ"।

পুরুষের স্বর স্নায়বিক উত্তেজনা ব্যঞ্জক। নারী কিন্তু স্বভাব-সিদ্ধ কোমল স্বরেই একটু অন্যমনস্ক ভাবে প্রশ্ন ক'রলে—"এর মধ্যেই"? তারপর কিছুক্ষণ চুপ্ ক'রে থেকে ব'ললে—"কিন্তু তোমার দিক থেকেও তো কথাটা একবার ভেবে দেখতে হয়। সমস্ত জীবনটা নষ্ট ক'রবে একটা চা-বাগানে কাটিয়ে"?

পুরুষ যা' উত্তর ক'রলে তার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই যে, সে যদি তার প্রেমের সৌরভে নারীর নষ্ট গৌরবটা ঢেকে দিতে পারে—তাতেই তার জীবনটা সার্থক হ'য়ে উঠবে।

"এর বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই"।

উত্তেজনা সত্ত্বেও পুরুষের স্বরে এমন-কিছু ছিল যা' নারীকে একেবারে স্বপ্নের মত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সেটা পরিপূর্ণ প্রেমের আবেগ, গভীর সমবেদনার প্রকাশ, তীব্র কামনার প্রেরণা—অথবা এই তিনের মিশ্রন-সঞ্জাত একটা কিছুও হ'তে পারে।

নারী কিন্তু ঠিক পুরুষের কথাই ভাবছিল না। তার নিজের ব্যথাটা যে কোথায় সেইটেই বারবার মনে প'ড়ছিল। সংসারের অপমান-অত্যাচার সে বরণ ক'রে নিতে পারত; কিন্তু অভিমানের দাবীটা যেখানে বড্ড বেশি, অবহেলাটা যে সেখানে তেমনিই অসহ্য !......... বর্ত্তমানটা যাই হোক না কেন—ভবিষ্যৎটাই কি খুব আশাপ্রদ ? সমাজ-সৌরচক্র থেকে গতিভ্রষ্ট হ'য়ে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট শূন্যতার মধ্যে বাকী জীবনটা কাটাবে সে ? প্রেম তো একটা নেশা মাত্র। যদি নেশা কেটে যায়, তা'হলে.........?

মুখ ফুটে ব'ললে—"এ-রকম ভাবেই যদি চলে তো চলুক না কেন" ?

"না—তা' আর চলতে পারে না"।

কেন চ'লতে পারে না পুরুষ সেটা বুঝিয়ে ব'ললে না। কিন্তু তার স্বরে পৌরুষ-অভিমানের একটা আভাষ ছিল।

নারীর তখন মনে প'ড়ল—গৃহত্যাগ-কল্পনাটা তো প্রথম তারই মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল। পুরুষ সেটাকে নিজের উৎসাহে সম্ভব ক'রে তুলেছে বৈত নয়।

তাই লজ্জিত-কাতর স্বরে ব'ললে—"যেতেই হবে আমাকে। তবে আর একটু সময় চাই। আজ রাত্তির ন'টার সময় তোমায় শেষ জানাব"।

নারীর এই দ্বিধাভাবে পুরুষের দায়িত্বভারটা বাড়্‌ল বৈ ক'মল না।

নারী তারপর বাড়ী ফেরবার প্রস্তাব ক'রলে এবং নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল। "কাল কোথায় বা বাড়ী আর কোথায় বা

কি” ? পুরুষ এই পরিহাসভাবটা আর নিবন্তে দিলে না এবং নারীর কলহাস্যে ফেরবার পথটা মুখরিত হ'য়ে উঠতে লাগল।

(৩)

সেই ফেরবার পথেই গাধার সঙ্গে দেখা।

যেখানে জিম্‌-নামক কুকুরটার গোর আছে সেইখানে গাধাটা দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে ছিল এক গোছা ঘাস এবং পিঠে ছিল একটি ছেলে। নারীর হাস্যরবে সে কান খাড়া ক'রে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে এবং পরক্ষণেই নারীকে দূরে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটল। সইস-বালকটা তার পিছনে ধাওয়া ক'রলে এবং পিঠের ছেলেটি প'ড়ে যাবার ভয়ে চর্ম্ম-বেষ্টনীটা দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রলে।

পুরুষ নারীকে আগলাবার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু তার কিছুই দরকার ছিল না। গাধাটা নারীর কাছে এসে শান্তভাবে মাথা বাড়িয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়ালে—যেমন করে' গাধারা দাঁড়ায়।

নারী ছেলেটিকে আশ্বস্ত করে' গাধার দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। ব'ললে—“এ যে সেই পেম্বা” !

এ যে তার মৃত সন্তানের চড়বার ডিঙ্গি এবং খেলবার সঙ্গী ছিল। গেল বৎসর এমনি সময় রোজ দুবেলা সে পেম্বার পিঠে চ'ড়ে বেড়াত। তার সঙ্গে কথা কইত, ঝগড়া করত। কখন মারত, কখন গলা জড়িয়ে আদর করত। এই মূক প্রাণীটি সে সমস্তই নীরবে সহ্য করত এবং তার পুরস্কার স্বরূপ নারীর কাছ থেকে কখন কখন মিষ্টান্ন উপহার পেত।

এখনও তো এক বৎসর হয় নি !

নারীর চোখ জলে ভরে এল।

পুরুষ ব'ললে—"গাধারাও মনে করে রাখে" ?

নারী ব'ললে—"গাধারাই বোধ হয় মনে করে রাখে"।

পুরুষ ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে দোবার জন্যে বলতে যাচ্ছিল—"অর্থাৎ যারা মনে করে রাখে তারাই বোধ হয় গাধা"। কিন্তু সামলে গেল। নারীর চোখে তখনও জল ছিল।

তারপর সকলেই বাড়ীর দিকে ফিরল।

(৪)

চৌরাস্তার কাছে এসে গাধা নীরবে বিদায় নিলে। পুরুষও বিদায় চাওয়াতে নারীর চমক ভাঙল। ব'ললে—"অন্তত আজকের দিনটা ক্ষমা করো।"

পুরুষের মনের হাওয়াটাও ভিন্নদিকে বইতে আরম্ভ ক'রেছিল। তাই বোধ হয় ব'ললে—"একদিন নয়, চিরদিনের জন্যই ক্ষমা ক'রলুম"।

তাদের আর কালিম্পং যাওয়া হ'লনা।

বেশ বোঝা গেল পুরুষ ও নারী উভয়ের-ই মনে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। কিন্তু তৃতীয় প্রাণীটির কোনই পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

সে যে-গাধা সেই-গাধাই র'য়ে গেল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

কথিকা।

—:০:—

সাম্‌নের বাড়ি তিনতলা। তার জানালার ফাঁকে ফাঁকে প্রতিবেশীর জীবনযাত্রার একটা জালিকাজকরা ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

একদিন কলেজের পড়া ছেড়ে সেই ছবির দিকে বনস্থলীর চোখ পড়ল। বিশেষ করে চোখ পড়ল তার কারণ, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দু'জন নতুন লোকের ছবি ফুটে উঠেচে। তাদের একজন বিধবা প্রবীণা, আরেকটি মেয়ের বয়স ষোল হবে, কি সতেরো।

সেদিন দেখা গেল সেই প্রবীণা জানালার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্চে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়চে।

আরেকদিন দেখা গেল চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি একলা বসে দিনান্তের শেষ আলোতে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের পিতলের ফ্রেম যত্ন করে আঁচল দিয়ে মাজ্‌চে।

তারপর দেখা যায় জানালার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতিদিনের কাজের ধারা। কখনো বা কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছে; কখনো বা জাঁতি হাতে সুপুরি কাটে; কখনো বা স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোয়; কখনো বা বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্দুরে মেলে দেয়।

দুপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস খেলে; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্‌বকম্ বিমর্ষ হয়ে আসে। সেই সময়ে ঐ মেয়েটি ছাতের চীলে-কোঠায় একলা পা-মেলে কোনো দিন কোলে বই রেখে পড়ে, কোনো দিন বা বইয়ের উপর চিঠির কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থম্‌কে থাকে, আর তার আঙুল যেন চল্‌তে চল্‌তে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা চিঠি লিখছিল, খানিকটা কলম নিয়ে খেলা করছিল, আর আল্‌সের উপরে একটা কাক আধ-খাওয়া আমের আঁঠি ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাচ্ছিল।

এমন সময়ে এক প্রৌঢ়া নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। তার মোটা মোটা হাতে মোটা মোটা কাঁকন। তার সাম্‌নের চুল বিরল, সেখানে সিঁথির জায়গাটাতে মোটা সিঁদূর আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচম্‌কা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখী হঠাৎ যেন পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কখনো বা গভীর রাত্রে কখনো বা সকালে বিকালে ঐ বাড়ি থেকে এমন সব আভাস আসে, যার থেকে বোঝা যায় ঐ সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠুক্‌চে।

অথচ জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তেমনিই চল্‌চে ডাল বাছা, আর পান সাজা,—মাঝে মাঝে দেখা যায় দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেচে উঠোনে কলতলায়।

এম্‌নি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্ত্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা; ছাদের

উপর আকাশপ্রদীপ জ্বলেচে, আস্তাবলের ধোঁয়া যেন অজগর সাপের মত পাক দিয়ে আকাশের নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্চে।

বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি তার ঘরের জানালা খুল্‌ল, অমনি তার চোখে পড়ল সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের বাড়ি ঠাকুরঘরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজ্‌চে। অনেকক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে; তারপরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখ্‌লে। লিখেই নিজে গিয়ে তখনি ডাকবাক্‌সে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগ্‌ল সে চিঠি যেন না পৌঁছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল, কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না।

কালেজ খোল্‌বার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সাম্‌নের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব কোথায় চলে গেছে।

বনমালী বলে উঠল, "যাক্‌, ভালই হয়েচে! স্বপ্নের বোঝার মত এমন বোঝা আর নেই!"

ঘরে গিয়ে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব নীচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোষ্ট-আপিসের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুল্‌লে না। একবার কেবল সেটা কেরোসিনের আলোর সাম্‌নে তুলে ধরে দেখ্‌লে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পষ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে এও তেমনি অস্পষ্ট অক্ষর।

একবার খুল্‌তে গেল, তারপরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে নিজের মায়ের নামে শপথ করে বল্‌লে—"এ চিঠি কোনো দিন খুল্‌ব না।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

—:o:—

কলিকাতা, ২০শে অগষ্ট, ১৯১৭।

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

শীকারের রাজ্যে ব্যাঘ্রবীরকেই সম্মানের প্রথম পদবী দেওয়া উচিত, তিনিই এ-রাজ্যের অধিনায়ক। যদিও এ-রাজকীয় জাতির সংখ্যা ততো অধিক নয়, তবুও আমাদের বিশাল অরণ্যপ্রদেশ সকলে, তাদের নির্ব্বংশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। অনেকে মনে করেন শ্বাপদজাতির বংশক্ষয়ের জন্যে শীকারীরাই বিশেষরূপে দায়ী; একথা আফ্রিকা আর আমেরিকার সম্বন্ধে হয়ত বা সত্য। চতুষ্পাদ রাজ্যের সাধারণ প্রজাবর্গের, যেমন হরিণমহিষের সংখ্যা, আমাদের দেশে এতই হ্রাস হয়ে গিয়েছে যে, সেটা একটা ভাবনারি বিষয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি মৃগয়ার নিয়ম মেনে চলে, আর যথার্থ যার এ সম্বন্ধে অনুরাগ আছে, সে কখনো নির্ব্বিচারে জীবহত্যা করে না; যাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, তারা প্রায়ই প্রলম্ব জোয়ান, আর যাতে অধিক সংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখে। কিন্তু শীকার যাদের ব্যবসায় আর জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়, তারাই কোন নিয়ম গ্রাহ্য করেনা, জীবহত্যাকাণ্ডে সংখ্যা নিয়মিত করবার চেষ্টা তাদের আদৌ নাই। এই অত্যাচার রহিত

করবার জন্যে অনেক বিধিবিধান প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে আরও সতর্ক সাবধান হওয়া আবশ্যক, তা নাহ'লে আমরা যে-সকল দৃশ্য আর যে আনন্দ উপভোগ করে গেলাম, আমাদের বংশধরদের ভাগ্যে আর তা' ঘটবে না।

বহুবৎসর পূর্ব্বে কটক জিলায়, এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি, একএকটা শীকারযাত্রায় প্রায় তিনশত অনুচর সহযাত্রী হত—এর মধ্যে আবার অনেকে সেকেলে-ধরণের বন্দুক ঘাড়ে করে আসত। দিনের শেষে আমরা যখন তাম্বুতে ফিরতাম, তখন এই অনুচরগণ সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দেখলে, আমরা আপনাদের ভাগ্যবান বলে জ্ঞান করতাম। এরা এক এক জন, ত্রিশ ত্রিশ গজ তফাতে, বন্দুক ঘাড়ে জঙ্গল ঘিরে খাড়া হয়ে যেত; যে হতভাগারা উত্তরাধিকারী সত্বে কিম্বা পয়সার জোরে এমন সব দানব-অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে নি, তারা গিয়ে পাহাড়ের মাথার উপর চড়ত, আর সেখান হতে মহাদেবের ভূত-প্রেতের মত অমানুষিক চীৎকার করে, ঢিল পাট্‌কেল, বড় বড় পাথরের চাঙড়, ছুঁড়ে, গড়িয়ে, শীকার খেদিয়ে এক জায়গায় জড় করবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে চেষ্টার ফল কিছুই হ'ত না। ময়ূর, চিকারা হরিণ, শূকর ছানা, সজারু—যাই পাশ দিয়ে যাক না কেন, অমনি এরা সেই সেকেলে বন্দুকগুলো ছুঁড়্‌ত। যদিও বেশী কোন বিপদ ঘটতে আমি এপর্য্যন্ত দেখিনি, সে কিন্তু তাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের জোরে; মরতে মরতে অনেকে কোনরূপে বেঁচে এসেছে। বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে এ অবস্থায় বিপদ ঘটাই নিয়ম, আর ঘরের ছেলে নিরাপদে ঘরে ফিরে আসাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। বেশ বোঝা যায়, এই সব বুনোলোক যারা জঙ্গলের

অন্ধিসন্ধি খুব ভাল করেই জানে, তারা যে সময়ে-অসময়ে নির্ব্বিচারে অনেক জীবহত্যা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষের অরণ্যপ্রদেশে আরণ্যজন্তুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হয়ে যাচ্ছে। যে প্রধান শীকারী আমার মৃগয়া-ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল, সেও দেখলাম এ প্রলোভন এড়াতে পারল না ; যে দিন আমি পৌঁছেছি, সেইদিন সকালেই সে এ মৃগয়া-রীতিবিরুদ্ধ কাজটি করলে। ভাল করে ভোর হবার আগেই বনের পথে সে বাঘের পায়ের দাগ খুঁজ্‌তে গিয়েছিল ; কথা ছিল খোঁজখবর করে, ব্যাঘ্রবীর কোথায় শিবির স্থাপন করেছেন, তার সংবাদ নিয়ে আসবে। একটা মহুয়া গাছের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে, শীকারীর সেকেলে বন্দুকটি, একখানি গামোছা, রক্তের জুলি, আর তার থেঁৎলান অর্দ্ধেক-খাওয়া শরীরটা পাওয়া গেল। পরে আমরা জানলাম, এ ভীষণ হত্যাকাণ্ড, একটি মানুষখাওয়া বাঘিনী আর তার তরুণ বংশধরেরা করেছে।

খুব সম্ভবতঃ শীকারী একটি চিত্তল অর্থাৎ গুলবাহার (Spotted deer) হরিণের আশায় আশায়, সেইখানটিতে লুকিয়ে বসেছিল,—মৎলব, যদি দেখা হয় তবে সেটিকে মেরে আনবে—ইতিমধ্যে বাঘিনী এসে তাকেই শীকার করে ফেল্‌লে। সে অঞ্চলে যতগুলি বাঘ ও বাঘিনী এসে বসত করেছিল, তারা সবাই মহামাংসের পক্ষপাতী, মৃগমাংসেও তাদের অরুচি ছিলনা, কাজেই মানুষটিকে আগে পেয়ে তাকে আর ছেড়ে কথা কইল না। এসব শীকারীরা যেমন নির্ব্বিচারে বনরাজ্যে জীবহিংসা করে বেড়ায়, মনে হল বনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা এর প্রাণ নিয়ে তেমনি তারি প্রতিশোধ তুল্‌লেন। নর-মাংস আর

মৃগমাংসলোভী বাঘেদের কথা বলতে গেলে, বলা উচিত, তারা ভিন্ন গোত্রীয় হলেও, একজাতীয়।

তাদের বিপুল শরীর, দৈর্ঘ্য দশফুটের কিছু উপর (রোলণ্ড সাহেবের পরিমাপরীতি অনুসারে); শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতা তাদের নামকরণ করেছেন, "বাঙ্গলার ব্যাঘ্ররাজ"। বঙ্গভূমির জলবাতাসের গুণে তাদের বরবপু শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, আয়তনেও বৃদ্ধি পায়, তাই তারা দেখতে সহরের কাঙাল কেরাণীদের মত নয়, মফঃস্বলের মহিমান্বিত জমিদার ও রাজারাজড়ার মত মেদমাংসবহুল, চালচলনও বিশেষ গম্ভীররকমের। কিন্তু যে সব বাঘ শীকারের সন্ধানে শুধু মাঠে-বনে নয়, পাহাড়ে আর পাহাড়তলীতে চলাফেরা করে, তাদের দেহগুলি, ক্ষিপ্রগতি রাজপুত বীরের মত দীর্ঘকায়, বসা মাংস-বর্জ্জিত, অস্থিমজ্জার সাম্যে দেখতে সুঠাম সুন্দর। তারা চতুর, সতর্ক, দ্রুতগতি, সহসা তাদের শীকার করা কঠিন; কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় ফাল্গুন চৈত্রে কিম্বা তার কিছু পূর্ব্বেই, যখন নদীতীর আর বনভূমি মরকতশ্যামলতৃণে সুসজ্জিত হয়, বাথানের মহিষের দল সেখানে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে আহারবিহার করে' দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তাদের শীকার করে' করে,' ব্যাঘ্রবীরেরাও শীঘ্রই ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুজ হয়ে ওঠে; তখন তাদের দিগ্বিজয়ী, অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রঘুরাজ বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। পাহাড়ের দেশে ব্যাঘ্রের ভাগ্যে পশুলাভ সহজ ব্যাপার নয়, অনেক পরিশ্রমই করতে হয়; হরিণ শূকর ভারি চতুর, পারতপক্ষে ধরা দেয়না, দিন গুজরান করতে অনেক মেহনত দরকার। তাই প্রাণধারণ শুধু চলে, ভুঁড়িটি গড়ে তোলা আর হয়ে ওঠে না, কাজেই নতুন কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজে নিতে

হয়। এঁদের সম্বন্ধে যা ব'ল্লাম, চিতা ও নেকড়েদের বিষয়ও সেই কথা বলা চলে। এই রকম ব্যাঘ্র-রাজদম্পতি যেখানে রাজত্ব করে, সেখানে অন্য কেউ আর অনধিকার চর্চ্চা করতে আসে না, তারা ভিন্ন রাজ্য অধিকারচেষ্টায় দূরে যায়। এছাড়া আরও এক কারণ আছে, যে রাজ্য কোন এক ব্যাঘ্রদম্পতি অধিকার করে থাকে, সেখানকার পশুপ্রজা আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হয়ে ওঠে। কাজেই সেখানে মৃগয়ার সুবিধা বড় একটা ঘটে ওঠে না। সেখানে থাকলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু উলুখড়ের প্রাণ যায় না, পেটও ভরে না। তাই স্বার্থসাধন করবার জন্যে স্বতন্ত্রদেশই শ্রেয়। এ ছাড়া, দেশবিশেষে এই সব জন্তু বাস করতে একটু বেশী ভালবাসে। তোমাদের মনে আছে বোধহয়, আমাদের হরিপুরের কাছাকাছি জঙ্গলে, তিন তিনটা চিতা, তিন মাসের মধ্যে, উপরি উপরি, আমার গুলিতে মারা পড়েছিল।

এদের স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ, আয়তনে এবং চতুরতায়। মেয়েরা চালাক বেশি, এমনি করে বোধ হয় তারা গায়ের জোরের অভাবটা পূরিয়ে নেয়। তা নইলে পুরুষদের কাছে স্ত্রীজাতিকে খাটো করে কোন কথা বলি, এমন সাধ্যি আমার নেই। অলকমণি, তোমার এ বিষয়ে ভীত হবার কিছু নেই, নাহয় তোমার পতি-দেবতাকে এইটুকু পড়ে শুনিয়ো না, তাহলেই কোন গোল হবে না! সন্তান পালন আর রক্ষণের জন্যেও বাঘিনীকে অনেক সময় বেশি সতর্ক হতে হয়। কেননা বাপেদের গ্রাস হতে তার পেটের ছেলেদের রক্ষা করবার জন্যে অনেক বুদ্ধিখরচ, অনেক ফন্দীআঁটা দরকার হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তার ছেলেদের আর আপনার ভরণপোষণের ভার নিজেকে

না নিলে চলে না। যিনি জন্মদাতা তিনি কিছুই করেন না, উল্টে ছেলেগুলিকে কেমন করে মারবেন, সেই মৎলবে ফেরেন। ছেলেগুলি কিছু বড়সড় হয়ে যখন আত্মরক্ষা করতে পারে, তখনি তাদের মায়ের ভাবনা যায়। তোমরা সবাই জান বোধ হয়, বেড়ালের মত বাঘেরাও সুবিধা পেলেই ছানাদের খেয়ে ফেলে। তাই মা তাদের অনাহারে, অনিদ্রায়, রাতদিন প্রাণপণ করে পাহারা দিয়ে থাকে। একবার আমি মস্ত একটা বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম, কিছুতেই আর নাগাল পাই নে, তারপর সাবালক পুত্র-হত্যা-পাপের বমালসাক্ষীতেই সে বাঁধা পড়ল। গ্রামের কোন লোক একদিন ভোর হবার কিছু আগেই তার বাড়ীর কাছে বাঘের ডাক শুনে জেগে ওঠে। তার বাড়ীখানি গ্রামের এক টেরে, বনের কাছাকাছি ছিল। শেষ রাতের উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে, সে দেখলে দুটি মস্ত চিতা মাঠের উপর খেলা করছে। হঠাৎ ভয়ানক গর্জ্জন শুনতে পেয়ে বেরিয়ে দেখে কি, দুয়ের মধ্যে যে বয়েসে বড়, আকারে আয়তনে বোঝা গেল সে পুরুষ, অন্যটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কুকুরে যেমন ইঁদুরকে নাকড়ানি দিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেচারী জলে ভরা একটা নালার মধ্যে গিয়ে পড়ল, করুণাময় পিতা আর তার খোঁজ খবর নেওয়া দরকার বোধ করলেন না, সে পড়েই রইল। এ খবর ভোর-রাতে আমার কাছে পৌঁছল, কাজেই এর পরে তাকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হল না—এই ক'দিন ধরে ব্যাঘ্রবীরের তল্লাসে আমাকে ভারী হয়রান হতে হয়েছিল কিন্তু। বাচ্ছাটি মায়ের কাছে একটুখানি আদরের চেষ্টায় গিয়েছিল, বাবামশায়ের বুকে আর সে-টুকু সইল না—পুরুষব্যাঘ্র

ভালবাসার স্থলে কারো আধিপত্য সইতে পারে না—এমন কি নিজের পুত্রেরও নয় !

তোমরা মনে কোরনা বাঘ কিম্বা চিতা, জলের ঘেঁষ নিতে চায় না ; সচরাচর তারা জলে পা দিতে চায় না সত্যি, তবে দরকার হলে স্রোতে গা ভাসাতে আপত্তি কিম্বা অনিচ্ছা দেখায় না। আমার বন্ধুবর্গ—যাঁদের সকলেরই সঙ্গে তোমরা বিশেষ পরিচিত—আমায় বলেছেন আসামে, শ্রীহট্টে বাঘশীকারের সময় তাঁরা দেখেছেন—এরা সাঁতার দিয়ে বড় বড় খাল বিল বেশ পার হয়ে যায়। একবার একটা বাঘ দেখে, তার অনুসরণ করে যেতে হঠাৎ দেখলেন, 'সে যেন' ধোঁয়ার মত কোথায় মিলিয়ে গেল, তার আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সম্মুখে ঘাসেঢাকা মাঠ, তার চারদিকে হাতীর উপর শীকারী, এর মধ্যে কোন্ যাদুতে এমন অসাধ্য সাধন ঘটল, কারো বোধগম্যই হ'ল না। ক্রমে আবিষ্কার হল মাঠের একধারে একটি খাল—বাঘটি টুপ্ করে তারি জলে নেমে, শুধু মাথাটি জলের উপর জাগিয়ে রেখে, কিনারার একটি বনঝাউগাছ মরিয়া হয়ে আঁক্‌ড়ে ধরে আছে—সেই অবস্থাতেই সে মহারাজার—গুলিতে মারা পড়ল।

একবার একটা বাঘ, কিম্বা চিতা, যাই বল, (এদের মধ্যে আমিত কিছু প্রভেদ দেখি নে, যদিও অনেকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন) মস্ত একটা বেতবনে ঘনঝোপে কোণ-ঠাসা হয়ে আট্‌কা পড়েছিল, পালাবার পথ তার একটিমাত্র ছিল, তাও আবার খালের ধারে। হেঁটো-ধূতির মত কম-চওড়া একটা খুস্কি পথ, আমি তারি পাশে টুল নিয়ে লুকিয়ে, তার আবির্ভাবের আশায় বসেছিলাম। শীকারীরা চারিদিক হতে বন ঘেরাও করে' পিটতে পিটতে আসছিল, আমি

একান্ত উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম—তখন আমার অবস্থা "পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদদুপযানং" !—কিন্তু কৈ, কারো দেখা নেই—আর আমাকে এড়িয়ে সে পথ দিয়ে কেউ যে পালিয়ে যাবে, তারও কোন উপায় ছিল না। শুধু একটিবার জলে ভারী কিছু পড়বার ক্ষীণ একটা শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হয়েছিল, কিন্তু সে এমন অস্পষ্ট যে, তাতে করে অমন প্রকাণ্ড জানোয়ার যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, একথা মনে করবার কোন কারণ ঘটে নি; আর সে শব্দ এতই ক্ষীণ যে, কিছুতেই ভাবতে পারি নি যে অরণ্য-সম্রাট শার্দ্দূল প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে জীবননদীতে শেষ সন্তরণে প্রবৃত্ত। নৈরাশ্য আর বিস্ময় যুগপৎ আমার মনকে অধিকার করলে।—হঠাৎ প্রহরী একজন চীৎকার করে উঠল, অন্য শীকারীদের নিয়ে সেই শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে দেখি, সন্তর্পণে ঝাঁপিয়ে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌঁছে, সে চুপি চুপি পলায়নের চেষ্টায় আছে,—শীকারীর চীৎকারে বাধা পেয়ে, সবে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে!

এমনও দেখা যায়, বাঘ ১২০ হাত চওড়া খরস্রোতা নদী সোজা সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে, নদীর কিনারা পর্য্যন্ত তার পায়ের দাগ ছিল, তারপর ধারে ধারে অনেকদূর সাবধানে হেঁটে গেছে, নিরাপদ পারঘাট বেছে নিয়ে তবে জলে নেমেছে। সাঁত্‌রে অন্য পারে গিয়ে, যেখানে একটি গাছ জলের উপর একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছিল, সেইখানে কঠিন মাটি পেলে ডাঙায় ওঠা যে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, তা সে ঠিক অনুমান করে নিয়েছিল। যদিও সোজা সেখানটিতে পৌঁছবার জন্যে স্রোতের মুখে সাঁতার দিতে বিশেষ কষ্টই হয়, তবুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, প্রাণপণ চেষ্টায় আপন অভীষ্ট সাধন করে নিয়েছিল।

এই সব নদীকে সর্ব্বত্র সর্ব্বথা বিশ্বাস করা চলে না, তবুও হিতোপদেশের ঐতিহাসিক বাঘের চেয়ে, আমি যার কথা বলছি, তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল,—তাকে আর পথচলা পথিকের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে হয় নি। অন্য একটা বাঘ আর একবার সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে, জেলের জালে আট্‌কা পড়ে বেঘোরে মারা যায়। পরদিন তার মৃত দেহটা জেলেরা আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছিল। এরা কই মাগুর ধরবে বলেই জাল পেতেছিল, কিন্তু এমন নতুন শীকার পেয়ে তারা ভারী খুসি হয়, লাভও করেনি মন্দ! তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আমাদের বাড়ীর উত্তরে যে বিল আছে, চওড়ায় এক মাইলের উপরে হবে। যথাকালে এখানে হাঁস চখাচখি, আর স্নাইপের মস্ত মেলা বসে যায়। কথায় বলে "গাঁ দেখ্‌বিত কলম, আর বিল দেখ্‌বিত চলন";—এ বিল সেই বিখ্যাত চলন-বিলের শাখা, এরি ধারে জলাভূমিতে বছর কুড়ি আগে বুনো মোষের দল চরে বেড়াত। একবার দুর্গা পূজার সময়, তখন আমরা ছেলেমানুষ, নবমী পূজার দিন, ব্রাহ্মণ ভোজনের দই ক্ষীর আর এসে পৌঁছয় না, ফলারেবামুন পাত পেতে বসে গেছেন; কর্ত্তারা ঘর-বার করছেন, এদিকে যেখান দিয়ে নৌকা করে গোয়ালারা দই ক্ষীর নিয়ে আসবে—একপাল বুনো মোষ সেখানটিতে পথ আটক করে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িমাঝির সাধ্য কি যে নৌকা বেয়ে আসে। এ মোষের পাল তো সুবোধ বালকের দল নয় যে তাদের বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু সুবিধা হবে। তাই যতক্ষণ এই মহিষাসুরগুলি আপনা হতে পথ ছেড়ে না দিলে, ততক্ষণ মহিষমর্দ্দিনীকে ভোগের জন্যে মুখটি বুঁজে প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। এখন আর সে জলাভূমি নেই, বিলগুলি মাঠ হয়ে

চাষবাস চলছে, মহিষাসুরও তার মোসাহেবের দল নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে।

পাহাড়তলীর বনজঙ্গলে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মে, বাঘরা প্রায়ই নালায় গিয়ে পড়ে থাকে, তবে ভিন্ন কারণে; (মানুষে যে কারণে নালার আশ্রয় গ্রহণ করে, এখানে তা নয়!); আমরা যেমন গরমের দিনে নাইতে নেমে আর উঠ্‌তে চাইনে, এও তেমনি আর কি।

(ক্রমশ)

পত্র।

—:*:—

শ্রীযুক্ত সবুজ পত্র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবুজ পত্রের মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্কে দু'একটি কথা, পাঠকদের তরফ হতে নিবেদন করছি। অবশ্য পাঠকমাত্রেই যে আমার মতের সঙ্গে সায় দিবেন, এমনতর প্রত্যাশা করি নে।

সবুজ পত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হল, তখন প্রবীণদের নিকট হতে যে ও পত্রিকা আশীর্ব্বাদ ও সমাদর লাভ করবে, সে দুরাশা অবশ্যই কেউ করেন নি; কিন্তু নবীনরা যে ওকে অন্তরের সহিত অভ্যর্থনা করবেন, সে আশাটা করা গিয়েছিল। ভরসা হয়েছিল আমাদের সামাজিক দুর্গতির দিনে এ পত্রিকাখানার পশ্চাতে আমাদের বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ সবুজ মনগুলি rally করে, মুক্তির গগনচুম্বী ধ্বজা এম্‌নি শক্ত করে তুলে ধরবে যে, নবারব্ধ crusade-এ জয় না হওয়া পর্য্যন্ত সে পতাকা কখনো নামানো হবে না;—মুক্ত হাওয়ায় কম্পিত পতাকার তালে তালে স্বাধীন বক্ষের ভিতর সতেজ প্রাণগুলিও স্পন্দিত হতে থাকবে। সে আশা অনেকাংশেই ফলবতী হয় নি, কেননা তাহলে যাঁরা সবুজ পত্রের মতে subscribe করেন তাঁরা, একেবারে অক্ষম না হলে, পত্রিকাখানাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁতে

subscribe করতেন। গ্রাহকদের নিকট হতে একটু বেশি মূল্য পেলে, ও পত্রের পেট ভরলেও প্রাণ ভরবে না। অতএব পাঠকদের দিক থেকে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করছি।

বাংলা দেশের প্রায় কোনো পত্রিকারই একটা বিশেষ ভঙ্গী নেই। একখানা পত্রিকাকেই হরেকরকম মনের খোরাক জুগিয়ে চলতে হয় ;—যে ভাবতে চায় তাকে ভাবাতে হয়, যে কাঁদতে চায় তাকে কাঁদাতে হয়, যে হাসতে চায় তাকে হাসাতে হয়, তদুপরি আর্টগ্যালারি খুলতে হয়, এবং স্বরলিপি সরবরাহ করতে হয়। সাতমিশালি রং সাদা হতে বাধ্য, কাজেই আমাদের দেশের অনেক পত্রিকারই, ওজন কিংবা পরিমাণ যতই থাকুক, রঙের অভাব বড় বেশী। অবশ্যই এ অবস্থার জন্য আমাদের যে দারিদ্র্যই অংশতঃ দায়ী তা অস্বীকার কচ্ছি নে, কেননা একাধিক পত্রিকা নেবার মতো সঙ্গতি আমাদের দেশের বেশি লোকের নেই ; কিন্তু এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন, তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কোথায় আমাদের মনের সেই দুর্নিবার পিপাসা, যার দুরন্ত তাগিদে নব নব বার্ত্তা নিয়ে নব নব পত্রিকার অভ্যুদয় হবে? কোথায় সে চিন্তার বিশিষ্ট ধারা, যার সাহায্যে আমাদের মনের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি? আমাদের মনের বিশিষ্টতা থাকলে, পত্রিকারও থাকত। পাশ্চাত্যে যে তা আছে তার প্রমাণস্বরূপ, কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, এমন অনেক কাগজের নাম করা যেতে পারে, যা বহুকালাবধি কোন বিশেষ শ্রেণীর চিন্তা-ধারা বিতরণ করে জন সাধারণকে পরিপুষ্ট করছে, এবং নিজেও পরিপুষ্ট হচ্ছে।

সাতমিশালি সাদা রং থেকে—সৌর-কিরণ যে সাতমিশালি তা

সকলেই জানেন—সবুজ রংটা বের করে চোখে পড়িয়ে দেবার চেষ্টা যে ব্যর্থ হচ্ছে, তার কারণ আমি যা বুঝতে পারছি তা এই যে, সাদা আলোয় গন্তব্যস্থানটা সুস্পষ্ট করে, আর সবুজ আলোয় তা ঝাপসা হয়; আবার সবুজ আলোয় নৃত্য করবার যদি একটু প্রবৃত্তি হয়, সাদা আলোয় তা নিবে যায়। নৃত্যশিল্প আমাদের নয়,—পাশ্চাত্যের; আর বাঙালী যুবক বায়োস্কোপে Shackelton Expedition-এর ছবি দেখতে যতই ভালোবাসুক, একটি স্থান ব্যতীত অপর কোন ঝাপসা জায়গায় লাফিয়ে পড়তে সে একান্তই নারাজ। সে স্থানটি হচ্ছে বিবাহ-বাসর। অবগুণ্ঠনের ভিতরকার সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তুটি আহার ও পানীয় সরবরাহ করবার উপযুক্ত হলে, সে আর কিছুর জন্যই কেয়ার করে না। এরূপ ঝাপসার প্রতি সংস্কারগত অনুরাগ সম্ভবতঃ আমাদের জাতির কবিত্বের প্রমাণ। এ অবস্থায় যাঁরা পাটেল বিল সমর্থন করছেন তাঁরা যে পাট্‌কেল পাচ্ছেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। সরকার বাহাদুর যদি পাটেল বিল তুলে না নেন, তবে পাটেল বিলের বিরোধীরা যে পটল তোলবার কাছাকাছি যাবেন, তা অসম্ভব নয়। কেননা উক্ত বিল যে শুধু অসবর্ণ বিবাহ আইন সিদ্ধ করবে তা নয়, নরনারীর পূর্ব্বরাগকেও প্রশ্রয় দেবে এরূপ আশা করা যেতে পারে; কারণ যাঁরা বিবাহ করবেন তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিলের স্মরণ গ্রহণ করবেন,—যাঁরা বিবাহ করাবেন তাঁরা নয়; এবং যাঁরা এরূপ বিবাহ করবেন, তাঁরা পরস্পরকে দেখেশুনেই বিবাহ করবেন।

যাঁরা বিবাহ নামক এত বড় ঝাপসা জিনিসটিকে এক মুহূর্ত্তে আয়ত্ত করে ফেলবার অমানুষী শক্তি লাভ করেছেন, তাঁরাই আবার অপর কোন ঝাপসা জিনিস দেখলে যে একদম পিছ-পা হয়ে পড়েন কেন, তা

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন। সবুজ পত্র যে পথ দেখাচ্ছে সে, পথে অগ্রসর হলে কোথায় গিয়ে পড়ব তার ধারণা আমার নেই, অথচ দশের পথে চললে কোথায় গিয়ে পৌঁছব তা বিলক্ষণ জানা আছে ;—সে হচ্ছে যেখানে রয়েছি, সেখানেই। ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের পানে ছোটবার পরিণাম হিতোপদেশে দেখেছি। অতএব সবুজ পত্রের আহ্বানে কর্ণপাত করবার যুক্তি-যুক্ততা প্রমাণিত না হলে, যুবকবৃন্দ যে অমনি অমনিই অকূলের পানে ছুটে চলবে, এমনতর প্রত্যাশা আমাদের দেশে করা চলে না।

মানবজীবনের লক্ষ্য কি?—এর জবাব নিঃসঙ্কোচে দিতে পারেন, এমন স্পর্দ্ধা যে কেউ রাখেন না, তা জোর করে বলা যেতে পারে। অবশ্যই "ধরি মাছ, না ছুঁই পানী" নীতির অনুসরণ করে "যা ভালো তা-ই লক্ষ্য" জবাবটা দেওয়া চলে। দার্শনিকেরাও দেখতে পাচ্ছি হোঁচোট খেতে খেতে সৃষ্টির লক্ষ্য সম্বন্ধে ঐ নিরাপদ উত্তরটিই দিয়েছেন। ইতিমধ্যে দার্শনিকদিগের মুখব্যাদান দেখে, এর পরে পাঠকেরাও "ভালো"র মানে সম্বন্ধে আর প্রশ্ন করবার ভরসা পাচ্ছেন না।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ও প্রশ্নটি দুরূহ হলেও, মীমাংসা করবার চেষ্টা অবিশ্রাম চলেছে; কেননা মীমাংসাটা এতই জরুরী যে, এর একটা কিনারা না হলে জীবনের প্রতি পদবিক্ষেপ অর্থহীন বলে মনে হয়। এথিক্সের স্তূপাকার পর্ব্বত ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে, এবং মানবের এ চেষ্টারও যে কোনকালে অবসান হবে, এমন লক্ষণ মোটেই দেখা যাচ্ছে না;—কেননা দিনের পর দিন মানুষের "angle of vision" বদলে যাচ্ছে।

এই ভাঙাগড়ার ভিতর বাঙালী জাতির আদর্শটি চিরস্থির রয়েছে বলে যে গর্ব্ব করা হয়ে থাকে, বিশ্বের মাপকাঠিতে সে গর্ব্বের মুল্য নিরূপণ করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রশ্ন হতে পারে—যেটা এতদিন আবশ্যক হয় নি, আজ হঠাৎ আবশ্যক হয়ে পড়ল কেন? উত্তর নিতান্ত সোজা। ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম—এ গুলির প্রায় সব ক'টিকেই জয় করে মানবজাতি দেশ দেশান্তরে অবাধে যাতায়াতের পথ একেবারে উন্মুখ করেছে। পূর্ব্বের ন্যায় জীবনসংগ্রাম আর দেশখণ্ডে আবদ্ধ নয়,—একেবারে বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়েছে।

জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করতে হলে আমাদের কয়েকটি স্তম্ভকে যে সযত্নে রক্ষা করতে হবে, এমন কোনো যথার্থ হিতকামী সমাজ সংস্কারক নেই, যিনি তা অস্বীকার করেন। তবে এখন কেন নূতনের আবশ্যকতা বেশি, যাঁরা "অরণ্যের বাণী" পড়েছেন তাঁদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না, এবং ওর চেয়ে সুন্দর করে বোঝানো সম্ভব বলে মনে হয় না।

কিন্তু যে, সকল চিরাগত সংস্কারের স্তূপীকৃত জালজঞ্জাল আমাদের একেবারে চেপে রেখে এক পা'ও অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, সে গুলোকে আর কতকাল এমনি করে পোষণ করে রাখব?

একটা প্রচণ্ড জবাব প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, মনু পরাশর যে-সকল ধারা গভীর চিন্তার ফলে প্রণয়ণ করলেন, কার এরূপ স্পর্দ্ধা যে স্বীয় সীমাবদ্ধ তর্ক-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে-সকল ধারার সমীচীনতা ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে?—যুক্তিটি যে প্রবল তা মানতেই হবে! বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান মানুষের ব্যক্তিত্বকে অপমান করে যিনি ভাববার ও চিন্তবার দায় হতে অব্যাহতি লাভ করেছেন, তাঁকে

তর্ক করে বোঝাবার দুঃসাহস সম্ভবতঃ কেউ রাখেন না; তবে তাঁর পক্ষে একথাটি মাঝে মাঝে স্মরণ করা সম্ভবতঃ শক্ত হবে না যে, যে-সকল মহাপুরুষ আমাদের জাতীয় জীবনকে কিছুমাত্র সত্য ও সৌন্দর্য্য দান করেছেন, তাঁরা সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন—

"যাঁরা সবল, স্বাধীন,
নির্ভয়, সরলপ্রাণ, বন্ধনবিহীন,
সদর্পে ফিরিয়াছেন বীর্য্য জ্যোতিষ্মান,
লঙ্ঘিয়া অরণ্য নদী পর্ব্বত পাষাণ,

* * * *

কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করিছেন ভেদ।"

যাঁদের চোখে সত্যের শুভ্র আলোক একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নি, যাঁরা সুমুখ হতে বিচারপ্রবৃত্তিকে একেবারে নির্ব্বাসিত করে জীবনযাত্রাকে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট করেন নি, অথচ সমস্ত হৃদয় দিয়ে সত্যকে আহ্বান করবার শক্তি হতে বঞ্চিত; আশা করা যেতে পারে তাঁদের sophistry-র মৃদু-গুঞ্জন সবুজ পত্রের মর্ম্মর কলতানের নীচে চাপা পড়ে যাবে।

যে sophistry-র বিষয় উল্লেখ করা গেল তা যে মনঃকল্পিত নয়, তা দু'একটি দৃষ্টান্ত দিলেই স্পষ্ট হবে। কোন এক স্থলে সামাজিক কুসংস্কারকে প্রাণীদেহের Vestigal organ-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণীদেহের Vestigal organ-এর কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও, তাতে অস্ত্রপ্রয়োগ করলে যেমন প্রাণীর

মৃত্যু ঘটতে পারে, তেমনি আবহমান যে সকল কুসংস্কার চলে আসছে, অর্থহীন হলেও তাদের উপর হঠাৎ হস্তক্ষেপ করলে সমাজ-শরীর একেবারে ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। অতএব কি জীবদেহের Vestigal organ, কি সামাজিক কুপ্রথা—উভয়ের তিরোধানের জন্য নীরবে অপেক্ষা করাই বিজ্ঞজনোচিত। আর এক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, evolution একটি একটানা ঊর্দ্ধগামী ব্যাপার নয়;—মোটের উপর তার গতি উন্নতির দিকে হলেও তাকে উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে, ঢেউয়ের মতো, অগ্রসর হতে হয়। অতএব সমাজ-শরীরের কোন সাময়িক দুর্গতি দেখে ভয় পাওয়া অনুচিত, কেননা তা evolution-নিয়মের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

কালের উপর বরাত দিয়ে সহিষ্ণুতার দাবী করা অবশ্যই সে জাতির পক্ষে শোভনীয়, যে জাতির অপরিসীম ধৈর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় বালবিধবার দুঃসহ নির্জ্জলা উপবাসে ও লাঞ্ছিত পত্নীর নীরব অশ্রুপাতে।

জীবদেহের সহিত সামাজের সাদৃশ্য যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাতে দু'একটি কলমের খোঁচায় তাকে টলানো সম্ভব নয়। আমাদের সামাজিক জীবনে এ সাদৃশ্যের শাখা-প্রশাখার ঘননিবিড় ছায়াকে আশ্রয় করে কোন কোন অর্থহীন সংস্কার নির্ব্বিবাদে বসবাস করছে। উদার আকাশের শুভ্রআলোক তাদের উপর পড়লে তারা পালাবার জন্য ছুটোছুটি করে মরতো। প্রাচীন সংস্কারের সে কালিমা সামাজিক বন্ধুরতার উপর ছায়া ফেলে জীবনযাত্রার পথ অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব রকম ঋজু করে ফেলেছে।

উপমা জিনিসটি কাজ করে চমৎকার ততক্ষণ, যতক্ষণ ওকে ওর

সীমানার মধ্যে আটকে রাখা যায়। উপমার কাজ হচ্ছে জটিল বিষয়কে বুঝিয়ে সহজ করা ;– যুক্তির point বের করা নয়। ভূমণ্ডল কমলা-লেবুর মতো দু'দিক চাপা বলে, উক্ত ফলের ন্যায় টক বা মিষ্টি নয়। মনুষ্যদেহকে ব্যঙ্গ করে forked radish বলা হয়েছে বলে, উক্ত দেহ মুলোর মত মাটি ফুঁড়ে নির্গত হয় না।

সমাজমন বলে যে বস্তুতঃ কোন জিনিষের অস্তিত্ব নেই, তা আপনি পূর্ব্বে এই পত্রিকাতেই বলেছেন। Social organism জিনিষটিও যে আকাশকুসুমের চেয়ে খুব বেশী সত্য নয়, তা বুঝতেও বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। সুলেখক Sir Leslie Stephen বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশের ভিতর যে যোগ (abiding unity) থাকে, সমাজের ভিতর সেরূপ কোন যোগ নেই, যার জন্য তাকে social organism বলা চলে ; তিনি তৎ-পরিবর্ত্তে social tissue শব্দটি প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে আমাদের সামাজিক দুর্গতিকে যে উক্তপ্রকারে সমর্থন করা চলেনা, তা বলা বাহুল্য।

আসল কথা হচ্ছে যে, মানসিক জড়তার পরিমাণটা যখন বেশি হয়ে ওঠে, তখন যুক্তিধারার গতিটাও স্বচ্ছন্দ থাকে না ;—ব্যাধিভারে ঋজু হয়ে চলতে না পেরে তাকে বেঁকে চলতে হয়।

সত্য হচ্ছে আলোক—মনের searchlight। সে আলোক এত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ যে, যার উপর সে আলোক পড়ে তা একমুহূর্ত্তেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশুর মতো উন্মুক্ত, নির্ভীক, সরল দৃষ্টিতে তাকানো চাই। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সেই সহজ দৃষ্টির অভাবে সোজা জিনিষও বাঁকা হয়ে যায়। বিখ্যাত "সহজ"

পন্থী Charles Wagner সহজের গুনকীর্ত্তন করতে করতে বলেছেন—

Too many hampering futilities separate us from that ideal of the true, the just and the good, that should warm and animate our hearts. All this brushwood, under pretext of sheltering us and our happiness, has ended by shutting out our sun. When shall we have the courage to meet the delusive temptations of our complex and unprofitable life with the sage's challenge : "Out of my light" ?

চির অভ্যস্ত পথে বাঁধি-বোল আউড়ে চলা সোজা হলেও, সেটা সহজ অবস্থা নয়। "সোজা" আর "সহজ"—এ দুয়ের পার্থক্য বোঝানো সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। তপঃপরায়ণ উর্দ্ধবাহুর অভ্যস্ত অবস্থাটি যতই সোজা হোক্, ওটি যে তার সহজ অবস্থা নয়, তা বলা বাহুল্য।

সেই সহজ পথ আবিষ্কারের নিমন্ত্রণ নিয়ে সবুজ পত্র আবির্ভূত হয়েছে। Brushwoodগুলি কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করে, ভাঙা গড়ার ভিতর দিয়ে সত্যশিবসুন্দরের আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে এবং চিরকাল চলবে ;—বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। হঠাৎ চলা থেমে গেলে কি দুর্গতি হয়, আমরা সবুজ পত্রের পাতাতেই অনেকবার তা জানতে পেরেছি। তাইতো লেখা হয়েছে—

"যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি

উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ
বস্তুর পর্ব্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।"

মানবসভ্যতার এমন একটি স্তর নেই যেখানে পৌঁছলে বলতে পারা যায় "Thus far and no further।" কি মনোজগতের, কি জড়জগতের, সব চেয়ে যে ধর্ম্মটি সত্য, তা হচ্ছে চলার ধর্ম্ম। সৃষ্টি লীলার গোড়ার কথাটিই গতির কথা, তাই বলা হয়েছে "Action was the beginning of everything," এবং এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করেই দার্শনিকরা causality-কে category-র অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন, কেন না কার্য্যকারণসম্বন্ধ-বোধটি পরিবর্ত্তন-বোধ অর্থাৎ গতি-বোধ হতেই উদ্ভূত।

অতএব সবুজ পত্রের কাছথেকে যে চলবার আহ্বান আসছে, তাতে কর্ণপাত না করে যিনি আভিজাত্যগর্ব্বে চণ্ডী-মণ্ডপের স্তম্ভটাকে আশ্রয় করে স্থাণু হয়ে বসে থাকবার প্রত্যাশা করেছেন, তাঁর প্রতি নিবেদন এই যে, একদিন প্রত্যুষে যখন তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করবেন যে স্তম্ভটা অন্তস্তলে কীটদষ্ট হয়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে, এবং সে স্থানের মাটি ফুঁড়ে এক লক্ষ্মীছাড়া আগাছা অলক্ষিতে নির্গত

হয়ে তার কণ্টকাকীর্ণ দেহখানি সঞ্চালিত করে চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে,—তখন যেন তিনি অদৃষ্টকে ধিক্কার না দেন।

সংস্কার-কার্য্য নানা প্রকারে চলতে পারে,—ধর্ম্ম প্রচার করে, বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তন করে, মিশন স্থাপন করে, ইত্যাদি; কিন্তু এ সকল সংস্কার সে-পরিমাণে সার্থক হবে, যে-পরিমাণে তাদের গ্রহণ ও প্রচার করবার পক্ষে জনসাধারণের মন অনুকূল হবে। অতএব গোড়ার কথাটা হচ্ছে মনের সংস্কার। সেই সকলের-সেরা সংস্কার অর্থাৎ একেবারে vital point-এ হস্তক্ষেপ করেছে বলে সবুজ পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা উচিত। ইতি।

৩২শে শ্রাবণ, ১৩২৬।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

ইঙ্গ সবুজপত্র।

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু।

আজ তোমাকে একটি সুখবর দিচ্ছি।

সবুজপত্র এতদিনে বাতিল হবার উপক্রম হল। সম্প্রতি এই কলিকাতা সহরে, ইঙ্গ-বঙ্গ দল থেকে আর একটি তরুণ সবুজপত্র বেরিয়েছে, যার তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র যেমন আধ-পাকা, তেমনি আধ-মরা। এই নবপত্র প্রথমত আকারে ছোট, দ্বিতীয়ত ইংরাজিতে লেখা। তালপত্রের চাইতে তেজপত্র যেমন ঝাঁঝালো, বাঁশের চাইতে কঞ্চি যেমন দড়,—বাঙলা সবুজপত্রের চাইতে ইংরেজি সবুজপত্র তেমনি বেশি ঝাঁঝালো, তেমনি বেশি দড়।

তা ত হবারই কথা। কে না জানে বাঙলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার সেই তফাৎ, দেশী ওষুধের সঙ্গে বিলেতি ওষুধের যে তফাৎ। লোকে বলে আলোপ্যাথি হচ্ছে ফৌজদারী চিকিৎসা, ও কবিরাজি— দেওয়ানি। অর্থাৎ কবিরাজের ত্বর সয়, ডাক্তারের সয় না। কবিরাজ রোগ জিনিসটিকে মুলতবি রাখতে জানে, তারপর তার চিকিৎসার আপিল আছে, খাস আপিলও আছে, এমন কি শেষকাণ্ডে হোমিওপ্যাথি নামক বিলেত-আপিলও আছে।

ডাক্তারের কিন্তু সব তড়িঘড়ির ব্যাপার। আলোপ্যাথি যেমন-তেমন

ফৌজদারী আদালত নয়, একেবারে Martial Law Tribunal,—সেখানে মানুষ পায় হয় বেকসুর খালাস, নয় প্রাণদণ্ড—যার উপর আর আপিল নেই। এ ছাড়া আরও মিল আছে। ইংরেজি ওষুধ সব কটু কষায়, তারপর যেমনি স্বাদ তেমনি গন্ধ। কুইনিন আর কেষ্টরঅইল হচ্ছে ডাক্তারখানার সেরা ওষুধ। আর তার গন্ধ স্পর্শ রসের সঙ্গে সবারই পরিচয় আছে। ইউরোপের ধারণা—যে-বস্তু ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করে, সে-বস্তু শরীরকে অনুগ্রহ করতে বাধ্য। আমাদের ধারণা কিন্তু ঠিক উল্টো। আমাদের বিশ্বাস ইন্দ্রিয়ের উপর অত্যাচার করলে আত্মার উপকার হয়, কিন্তু দেহের হয় অপকার। আমাদের ওষুধের নাম শুনলেই কান জুড়িয়ে যায়—যথা রসসিন্দুর, স্বর্ণপট্পটি, মুক্তাভস্ম, মকরধ্বজ ইত্যাদি। তারপর এদের যেমন নাম তেমনি চেহারা,—কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি শুকশ্যাম, কোনটি হিঙ্গুলপারা; সব চিক্‌চিক্ করছে, চক্‌চক্ করছে, দেখবামাত্র মন নেচে ওঠে। ইংরাজিতে যাকে বলে love at first sight—কবিরাজি ওষুধের উপর চোখ পড়ামাত্র সকলেরই সেই মনোভাব হতেই হবে। তারপর দেশী ওষুধের অনুপান আছে, বিলেতি ওষুধের নেই। আর সে অনুপানের বালাই নিয়ে রোগীর মরতে ইচ্ছে যায়। স-মধু মরিচের গুঁড়া, মিছ্‌রির সরবৎ ও জামিরের রস, পানের রস প্রভৃতির সংযোগে পৃথিবীর কোন্ বস্তু না পান করা যায়, লেহন করা যায়, চিবোনো যায়, চোষা যায়। সমাজদেহকে রোগমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে, বাঙলা সবুজপত্র কবিরাজীর আশ্রয় নিয়েছেন—আর ইংরেজি সবুজপত্র মায় সার্জ্জারি আলোপ্যাথির। মহাকবি রাজশেখর সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের যে পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন, ইংরেজির সঙ্গে বাঙলার প্রভেদও তাই। সুতরাং তাঁর

ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে, ইঙ্গ সবুজপত্র হচ্ছে "পুরুষ-পরুষ", আর বঙ্গ সবুজপত্র "মহিলা-সুকুমার"।

এরূপ হবার কারণও আছে। বল্‌তে ভুলে গিয়েছি যে, এই নবপত্রের নাম হচ্ছে Bulletin of the Indian Rationalistic Society। এই নামই প্রমাণ যে, এ পত্র বৈজ্ঞানিক সত্য ছাড়া আর কিছুই মানে না। যেমন আলোপ্যাথির, তেমনি এ সাহিত্যের ভিত্তিই হচ্ছে Biology, Physiology, Botany, Chemistry প্রভৃতি। যে কোন সামাজিক সমস্যা উঠুক না কেন, এ পত্র এর একটি না একটির সাহায্যে তার হাত হাত মীমাংসা করে দেবে। অপর পক্ষে বাঙলা সবুজপত্র নিঙড়ে কি বেরবে?—কিঞ্চিৎ কাব্যরস। আর হামান-দিস্তেয় কুটলে?—কিঞ্চিৎ দর্শন-চূর্ণ। এবং এ দুয়েরই অনুপান হচ্ছে—হাস্যরস। খোঁজ নিয়ে দেখ বাঙলা সবুজপত্রের লেখকমাত্রেই সেই শিক্ষায়, শিক্ষিত ইংরেজিতে যাকে বলে literary education; আর ইংরেজি সবুজপত্রের লেখকেরা সব বিজ্ঞানবিৎ। শুনতে পাই যে, ইউরোপের জনৈক মহা-দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন—পৃথিবীতে আগে আসে কাব্য, তারপরে দর্শন, আর সর্ব্বশেষে বিজ্ঞান। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ইংরেজি সবুজপত্রের আবির্ভাবের পর বাঙলা সবুজপত্র যে পিছনে পড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে পত্র মহিরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত ভূমিষ্ঠ হতে না হতেই লড়াই সুরু করে দিয়েছে, সে পত্রের আর আর নেই,—অবশ্য যদি বেঁচে থাকে। আমি এই নবোদ্গত পত্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই আশীর্ব্বাদ করি যে, তুমি শতায়ুঃ হও, আর তোমার ইস্পাতের দোয়াত কলম হোক।

(২)

এখন এ পত্রের মতামতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। মনে আছে যে পাটেল-বিল নিয়ে দেশে যখন একটা পণ্ডিতের তর্কের সুরু হয়, তখন সনাতনপন্থীর দল অসবর্ণ বিবাহের বিপক্ষে eugenics নামক একটি নেহাৎ কচি ও কাঁচা বিজ্ঞানের দোহাই দেন। সে দোহাই আমরা অমান্য করতে পারি নি,—কেননা বিজ্ঞানকে আমরা রাজার মত মান্য করি এবং রাজার মতই ডরাই। তারপর এই নব সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহের প্রবন্ধে eugenics-এর ব্যাখ্যান পড়ে আমার চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল,—পণ্ডিত ম'শায়েরা পড়লে তাঁদের মস্তকের শিখা যে যথার্থই অর্কফলা হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। Eugenics-এর বাঙলা জানিনে, কিন্তু তার একেলে সংস্কৃত হচ্ছে সু-জনন বিদ্যা। এ বিদ্যার সঙ্গে শাস্ত্রমতের অর্দ্ধেক মিল আছে—কিন্তু বাকী অর্দ্ধেকের ফারাক আশমান-জমিন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এ সত্য সুজনন-শাস্ত্রীরাও মানেন; কিন্তু "পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্", এ বচন শোনামাত্র এ শাস্ত্রের সিংহব্যাঘ্রেরা মহা গর্জ্জন করে উঠবেন, এবং এ কথা যারা মুখে আনে, তাদের পিণ্ডি চট্‌কাতে প্রস্তুত হবেন।

এঁদের মত হচ্ছে "পুত্রষণ্ড প্রয়োজনম্"—কেননা তার কৃপায় জাত আপনাহতেই বড় হয়ে উঠবে, উঁচু হয়ে উঠবে। অর্থাৎ দেশের ছেলেমেয়েরা সব সুজন ও সুজাতা হয়েই ভূমিষ্ঠ হবে। এ বিজ্ঞান নরনারীকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দেখে না, দেখে শুধু জনক জননী হিসেবে; সুতরাং আমরা যাকে বিবাহ বলি, এ মতে সে হচ্ছে

শুধু জোড়কলম বাঁধবার হিসেব। যে শাস্ত্রমতে গৌরীদানের মাহাত্ম্য গরুদানের চাইতেও বেশি, সেই পুরোনো শাস্ত্রের হিসেবের সঙ্গে এই নতুন শাস্ত্রের হিসেবের যে কোনও মিল নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এদেশে কোন কথাই বলা বাহুল্য নয়। অতএব উক্ত পত্র হতে শ্রীযুক্ত আর, সি, মৌলিক মহাশয় কর্তৃক রচিত আর একটি প্রবন্ধ হতে ক'ছত্র উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Putrarthhé kriatê varjya"

(One marries a woman for begetting sons). Poor little thing ! She is forced into the bed of a hulking youth, and he inculcates on his "phantom of delight" on the propedeutics of the metaphysics of love, inside a comfortable curtain. Before reason and judgment gather strength, before any principles are formulated, the epitheumetic impulses are precociously provoked, by the presence of an object calculated to inflame them, and the shameful connivance of an agent interested in their premature development".*

এর চাইতে পরিষ্কার কথা আর কি হতে পারে?—এর লক্ষ্য এত সিধে আর এর বেগ এত বেশি যে, এ কাগজের নাম Bulletin না হয়ে Bullet হওয়াই উচিত ছিল!

---

*(Bulletin of the Indian Rationalistic Society. Vol I. No 3. p. 43).

(৩)

এই বিজ্ঞান-তান্ত্রিক বীরাচারীদের শাস্ত্রের কারবার যে শুধু রক্তমাংস নিয়ে তা নয়—তাঁরা মাদক দ্রব্যেরও সন্ধানে ফেরেন। এঁরা চতুর্ব্বেদ ঘেঁটে সোম যে কি পদার্থ, তার পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছেন। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণের" পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমি একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করি যে, পুরাকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা একা সঙ্গে সুরা ও সোম পান করতেন, তখন ব্রাহ্মণেরা এই স্বস্তি বচন পাঠ করতেন—

"ওহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক
পৃথকরূপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন।

তুমি তেজস্বিনী সুরা, আর ইনি রাজা সোম, তোমরা
আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর"।

সেই অবধি সুরা ও সোম যে এক বস্তু নয়, এ জ্ঞান আমারও ছিল; কিন্তু সোম জিনিষটি কি, তার সঠিক খবর আমি ইতিপূর্ব্বে পাই নি। এই নবপত্রের একটি অশেষ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে আবিষ্কার করলুম যে, সোম রসায়নের অধিকারভুক্ত নয়—ও পদার্থ হচ্ছে আসলে ভেষজ, যাকে আমরা ত্বরিতানন্দ বলে থাকি। কিন্তু এতে আমার মনে একটু খটকা লগল। আফিং ও মদ যে জুড়িতে চালানো যায়, সে ত সকলেরি দেখা-সত্য। এবং এ জুড়ি কদম কদম চলেও ভাল,

যেহেতু এর একটি আর একটিকে রোখে, ছাবৃতকে উঠতে দেয় না। তবে পঞ্জিকা ও সুরার ত এরকম জুড়ি মেলানো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একসঙ্গে এ দুয়ের এস্তমাল করলে মানুষে যে "বুঁদ হয়ে যাবে, বোঁ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, তারপর না হয়ে যাবে"! রস-তত্ত্বের পারদর্শী আমার জনৈক ম্যাসনালিষ্ট্ বন্ধু কিন্তু আমার এ সন্দেহের নিরাস করেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের মত মানুষ হলে, সে নিজ মস্তিষ্কে সকল ধর্ম্মের সমন্বয় করতে পারে, আর আমাদের বৈদিক পিতামহেরা, অর্থাৎ সত্যযুগের তাঁরা ত মানুষ ছিলেন না, ছিলেন সব demi-god, সুতরাং তাঁদের পক্ষে উক্ত উভয় রস যুগপৎ অবলীলাক্রমে আত্মসাৎ করাটা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। তাঁর কথা হচ্ছে এই যে, দেবতারা যে নন্দন কাননে চির-আনন্দে বাস করেন, সে একমাত্র কল্পতরুর প্রসাদে; কেননা কল্পতরু হচ্ছে সেই গাছ —যার পাতা সিদ্ধি, ফুল গাঁজা, ফল ধুতুরা, আঠা আফিম, ছাল চরস, রস মদ, আর শিকড় কোকেন। একথা শুনে আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি বল্‌লেন—"তুমি ভাবছ যে এমন গাছ থাকতে পারে না, যাতে এই সকল তেজস্কর দিব্য পদার্থ একাধারে পাওয়া যায়? অমরাপুরীর কথা ছেড়ে দাও, যদি Botany জানতে তাহলে এ সত্যও জানতে যে, এই ভারতবর্ষেই এক গাছ আছে, যার পাতা হচ্ছে পান, ফুল জয়িত্রী, ফুলের বোঁটা লবঙ্গ, কুঁড়ি এলাচ, ফল জায়ফল, ছাল দারচিনি, আঠা খয়ের, আর শিকড়চূর্ণ চুন"। আমি বিজ্ঞানকে রাজার মত মান্য করি ও রাজার মত ডরাই, সুতরাং ঐ botany-র দোহাই দেবামাত্র আমি বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিলুম যে, সোম হচ্ছে খয়িতানন্দ।

তবে ও বস্তু সিদ্ধি কি গাঁজা, সে বিষয়ে আমার মনে এখনও ধোঁকা রয়েছে—কেননা গঞ্জিকা মানুষে গুলে খায় না, টানে। অতএব আমি ধরে নিচ্ছি যে, সোম হচ্ছে সিদ্ধি। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তাহলে সকলকেই মানতে হবে যে বঙ্গ সবুজপত্রের রস হচ্ছে সোমরস। সিদ্ধির পাতার সঙ্গে উক্ত পত্রের ছুটি জবর মিল আছে। প্রথমত ও ছুয়েরি রঙ সবুজ, দ্বিতীয়ত ও ছুয়েরই রস পান করলে মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। অপরপক্ষে ইঙ্গ সবুজপত্রের রস যে সুরা, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই—কেননা ও হচ্ছে একদম বিলেতি মাল। অতএব আমাদের যুবকসম্প্রদায় যদি এই উভয় সবুজপত্রের রস একাধারে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে পান করতে ব্রতী হন, তাহলে প্রমাণ হবে যে তাঁরা সব সত্যযুগের লোক; এবং তাও আবার যে-সে লোক নয়—একদম ক্ষত্রিয়।

এ ক্ষেত্রে আমার প্রার্থনা শুধু এই যে—

"ওহে সুরা ও সোম! তোমাদের জন্য দেবগণ পৃথক পৃথক স্থান কল্পনা করিয়াছেন। তুমি তেজস্বিনী সুরা আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর"।

এ প্রার্থনা যে কতদূর সঙ্গত, ছুকথায় তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। সুরা যে তেজস্বিনী, এ কথা জগৎবিখ্যাত, আর ত্বরিতানন্দ রাজার নেশা না হলেও নেশার রাজা। তারপর দেবগণ সত্যসত্যই এ ছুয়ের জন্য পৃথক পৃথক স্থান কল্পনা করেছেন। সিদ্ধির গন্তব্য স্থান হচ্ছে cerebrum এবং সুরার cerebellum—অর্থাৎ এর একটি হচ্ছে জ্ঞানমার্গের, আর একটি কর্ম্মমার্গের নেশা।

এরা যদি পথ ভুলে এ ওর আর ও এর ঘরে গিয়ে ঢোকে, তাহলে মনোরাজ্যে যে কি উৎপাতের সৃষ্টি হয়, তা সকলেই আন্দাজ করতে পারেন। আর এ দুটি যদি মিলে মিশে এক হয়ে যায়, তাহলে এর রসে আর ওর রসে কাটাকাটি গিয়ে বাকী থাকে শুধু শূন্য।

বীরবল।

২৪শে অগষ্ট, ১৯১৯।

ঝুপ্ ঝুপ্-চুপ্।

—:*:—

(ঢাকা—মাণিক গঞ্জের মৌখিক-ভাষায় লিখিত)

আষাঢ় পার হৈয়া শাওন মাস পৈরচে, ঝিনই বিলের মাঠখান জলে নৈদাকার। আগৈর খ্যাতের আউসধান পরায়ই কাটা হৈচে, নামী খ্যাতের পাকা ধানের কালা কালা বাইল(১) গুলা তল হৈতে হৈতে কোন মতে জলের উপর জাইগা রৈচে মাত্র। তামান দুফুর গুরানি বিষ্টির পরে শেষ বেলার নিভাজ(২) আকাশে রুগীর মুখে হাসির সলকের(৩) রকম একটুখানি রৈদের জিল(৪) দেখা দিচে; তাতে আশার থিকা আশঙ্কাই হৈত্যাচে বেশি। তির্‌তিরা হাওয়ায় জলের ধলি চাক্‌লা(৫) জুইরা চেলা-ঢেউ(৬) উঠ্‌চে। মাঠের ইখানে-ওখানে গিরস্তগোরে পারা-গাড়া(৭) ডিঙ্গি নাও। কোন কোন নায়ের লগির মাথায় চাষালোকের শুকাব্যার-দেওয়া খাট-বহরের কাপর নিশানের রকম বান্ধা। বেবাক নাও খালি। চাষারা সকলেই জলে খারায়্যা ধান কাটত্যাচে; আইজ কেউর মুখ দিয়াই ভাইটাল গানের সুর বাইরয় নাই। সগলেই বাড়ন্ত জলের জোয়ারের মুখে থিকা

(১) শীস্। (২) পরিষ্কার্। (৩) আলোর রেখা। (৪) রশ্মি। (৫) সীমা। (৬) ক্ষুদ্র। (৭) বাঁধা (anchored)।

আপন আপন বছরকার মিহানতের ধন—পাকা আউস, ছিনায়্যা রাখনে ব্যস্ত।

চাইরদিগের থৈ থৈ জলের পুবপারে সেওরাতলি গাও। মাঠের মধ্যিখান থিকা দেইখ্‌লে মনে হয় য্যান গাওখান জলের উপর ভাস্‌ত্যাচে। ধনুকের মতন গাছের একটানা ব্যাকা(১) একটা সাইর(২), তারি আবডালের নীল ফাসা(৩) দিয়া খানকয়েক কুড়া ঘরের খোলা দুয়ার, চাষার মনের মমতা-মাখা চইখের(৪) মতন মাঠের দিগে একদিস্টে তাকায়্যা রৈচে।—আর, গেরাম-লক্ষ্মীর সবুজ গাছের সোয়াগ-আচল ছিরয়্যা দিয়া গায়ের বুকের উপর চাষাগোরে কলিজার রক্তে লাল হৈয়া-ওঠা মহাজনের দোতালা দালানটারে ঠিক একটা দেমাকি দৈত্যের মতন দেখা যাত্যাচে। তার খোলা দরজার মস্ত হা'র মধ্যে সে য্যান সারাটা মাঠের বৈবাক ফসল ভর্‌ব্যার চায়!

মাঠের ফস্‌লি খ্যাতগুলারে দো-আধ্‌লা(৫) কৈরা দিয়া নিলখের(৬) দিগে চৈলা-যাওয়া হালটের ধলিখান ঘুমের আলসের মতন নিভাজ হৈয়া পর্‌য়্যা রৈচে। তারি এক কিনারে পারা-গাড়া ডিঙ্গি নাও-খানের ধারে বুক-সমান জলে খারায়্যা ফজু সেক জলে তল্‌তল্‌-হওয়া আউস ধান কাটব্যার লাইগ্‌চে। তামান দিন না-নাওয়া-খাওয়ার আগুনের জ্বালা তার দেহের মধ্যে ধপ্‌ধপায়্যা জ্বৈলা উঠ্যা আপ্‌নেই নিব্যা গেচে,—কেবল মাথার আতেল্যা(৭) ভুল্‌কা(৮) চুল আর গাথায়(৯) পড়া-চইখে তার না-নাওয়া-খাওয়ার সকল তাপ মাখা। তার মন আর দেহে নাই, ধানের ঐ বাইলগুলার মধ্যে আইজ তার বাসা,

(১) বাঁকা। (২) সারি (Line)। (৩) ফাক। (৪) চক্ষু। (৫) দ্বিধা-বিভক্ত। (৬) দিক্‌চক্রবাল। (৭) তৈলহীন। (৮) ঝাঁকড়া। (৯) কোটরগত।

তার চইখের সবখানি নজর খালি ঐ খ্যাতের ব্যার টুকের মধ্যেই লাইগা রৈচে। গায়ের বেবাক জোর সে আইজ তার হাত দুইটির রগে রগে চালায়্যা দিচে। নাকের নিয়াসও(১) বিরাম মাইনা চলে, তার হাতে কামের আঁইজ আর থামন নাই। হায়রে—তার যদি আর দুইটা হাত থাইক্‌ত!

দুই রোজ এক্‌জায় ডাওয়রের(২) পর আইজকার বিষ্টি-থামা বিকালে বাবুগোরে ছোট্ট পান্‌সীখান মাঠে বাইর'চে। এতক্ষণ চকের(৩) দক্ষিণে বিলের আন্দাজলে(৪) বাইচ্-খেলা হালটের ধলি দিয়া বাড়ী ফিরনের মুখে নাওখান ফজুর খ্যাতের কিনারে আইসা পৈল। মাঝি-গোরে খালি হাতে বসায়্যা থুয়্যা মাইজা বাবুর ছাওয়াল পাছা-নায় হাইল ধৈর্‌চেন, আর বড় তরপের চশমা-আলা বাবুর লগে সেনেগো বাড়ীর আর মিত্তির বাড়ীর দুই ছাওয়াল আগা-নায়(৫) বৈঠা হাতে বসা।

মাজাজলে(৬) খারায়্যা উপুর হৈয়া ধান কাটনে-লাগা ফজু সেকেরে দেইখা মাইজা বাবুর ছাওয়াল তার নাম ধৈরা ডাইক্‌লেন। আইজ পাচ দিনও পারয় নাই ফজুর ম্যায়া(৭) তিনির কাছে থিকা বাপের লাইগা জ্বর ছাড়নের ওষুদ নিয়া গেচে!

ইদিগে—শেষ বেলার রৈদের জিল্‌টুক ঢাইকা কাজ্‌লা(৮) মেঘের মস্ত একটা খাণ্ডারা(৯) তামান্ আকাশ ছায়্যা ফেলাল্য। তার কালা-রং-এর ছাপে স্যরা পির্থিমি মসিমাখা(১০)। থেইতারা(১১) সগলে

(১) নিশ্বাস। (২) শ্রাবণ-বর্ষণ, ঘন-বর্ষা। (৩) মাঠ। (৪) স্রোতহীন (stagnant)। (৫) নৌকার সম্মুখ দিক। (৬) কোমর জল। (৭) মেয়ে। (৮) কাজল বর্ণ। (৯) খণ্ড। (১০) কালো রং। (১১) কৃষক ভৃত্য, যারা কৃষকদের মাঠে সহায়তা করে

সার্ সার্(১) কৈরা কাটা-ধান নায় ভরব্যার লাইগ্‌ল, কেউ ধান-বোঝাই নাও তরাতরি বায়্যা বাড়ী ফির‍্যা চৈল্ল। ফজুর আইজ আর কিছুতেই ভুর্‌খেপ্ নাই। সে ক্যাবল জলের উপর জাগা অন্ধকারে পরায় মিলায়্যা-যাওয়া কালা কালা ধানের বাইলগুলারে হাত্‌রায়্যা হাত্‌রায়্যা কাট্‌ত্যাচে,—এখনো যে তার অদ্ধেক খ্যাত বাকী।

মাইজা বাবুর ছাওয়ালের ডাকে সে তিনির দিগে মুখ ফির‍্যায়্যা তাকাল্য, ঠিক সেই লগে হাতের বৈঠা নামায়্যা রাখনের অব্‌সরে-ভরা ছয় ছয়খান হাতের উপরে তার চইখের বেবাক নজর অনার(২) হৈয়া লুটায়্যা পৈল। বাবুগোরে দেখন মাত্রেই তার হাতে রোজকার মতন সেলামটাও যে আইজ উঠ্‌ল না। মাইজা বাবুর ছাওয়াল যে তারে এম্নিভাবে জলে ভিজনের নিষেধ কৈর্‌লেন, নিয়ম মতন ওসুদ খায়্যা বেরাম ভাল করণের উপদেশ দিলেন, ই-সগলের কিছুই তার কানে ঢুক্‌ল না। জল দেইখ্যা তিষ্ণায়-ফাটা পরাণের মতন তার মন যে রৈচে—ক্যাবল ঐ নায়ের উপকার হাত ছয় খানির দিগে হাপুস্ হৈয়া তাকায়্যা!

ঝর্ ঝর্ কৈর‍্যা বিষ্টি পরায় নামে নামে, বাবুগোরে বাইচের নাও ফজুর খ্যাত ছারায়্যা খানিক তফাতে গেচে। আকাশ-জোরা নিশুতি(৩) আন্ধার আর বিষ্টির আঝইর(৪) ঝরায় দিগ্‌দিশা বেবাক বুজায়্যা(৫) দিল,—ক্যাবল, ফজুর খ্যাতের কালা কালা ধানের বাইলগুলা আন্ধারের

---

(১) অতিরক্তে। (২) অনড়। (৩) নিস্তব্ধ। (৪ অনবরত। (৫) ঢাকিয়া, আবৃত করিয়া।

সেই কষ্ঠি কাজলের মধ্যে থিকাও তার জলে-ভরা চইখের দিগে একদিষ্টে চায়্যা রৈচে !

* * * * *

খেইতারা সব চৈলা যাওয়নে সারা মাঠ নিটাল(১)—নিভাজ, জন-প্রাণীর কাসির আওয়াজটাও নাই, ক্যাবল দূরে শুনা যায় ছয় খান হাতের বৈঠায় জলের বুক আগ্‌লায়্যা-যাওয়া—ঝুপ্ ঝুপ্—চুপ !

(১) নিস্তব্ধ, জন মানব শূন্য।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

মানুষ ও সমাজ।

—:*:—

মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভগবান—আর সমাজকে গড়ে' তুলেছে মানুষ। সুতরাং মানুষের জীবন সমাজের দাবী চাইতে চিরকাল মহত্তর বৃহত্তর; ও শক্তিশালী হয়ে থাকবেই। কেননা মানুষ সর্ব্ব কালের কিন্তু সমাজের কোন একটা বিশিষ্ট দাবী কেবল একটা বিশেষ কালের—যা-গড়ে' উঠেছে বিশেষ একটা প্রয়োজনের তাগিদে—কিম্বা বিশিষ্ট একটা মনের ভঙ্গীতে।

কি আগে? মানুষ না সমাজ?—মানুষই আগে—মানুষই সমাজ গড়ে' তুলেছে--মানুষেরই প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ দানা বেঁধে উঠেছে। আজ আমরা সেই মানুষকেই খাটো করে' সমাজের বিধি নিষেধকেই বড় করে' তুলেছি—অর্থাৎ সমাজের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মন নিয়ে যে প্রয়োজনের তাগিদে জীবনের যেমন ভঙ্গিমা গড়ে' তুলেছিলেন, সেই ভঙ্গিমাটাকেই আজ আমরা বড় করে' দেখছি—কারণ সেইটেই যে আমরা চর্ম্মচোখে দেখতে পাই—সেই বিশেষ ভঙ্গিমার পিছনে যে একটা বিশিষ্ট মন ছিল তা আমাদের আলোচনার মধ্যেই আসে না—তাই সেই বিশেষ ভঙ্গিমাটা দিয়েই আজ আমাদের প্রয়োজনকে আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে যাচ্ছি। যাত্রা সুরু করবার সময়ে আমরা গরু দিয়েই গাড়ী টানিয়াছি, মাঝ পথে এসে

আজ আমরা গাড়ী দিয়ে গরু টানাবার পরামর্শ সভা বসালেম। এই পরামর্শ সভায় মন্ত্রনাদাতা তাঁরাই যাঁরা নিগুণ ব্রহ্মের সঙ্গে সারূপ্য লাভ করবার কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছেন, যাঁদের প্রাণ নির্ব্বাণের রাস্তা ধর-ধর। তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেন হলুদ বরণ প্রৌঢ় বটপাতাটা তার বোঁটা থেকে খসে পড়তে পড়তে, তার পাশেই নতুন বেরিয়ে-আসা সবুজবরণ কিশলয়টাকে চোখ উল্‌টে উপদেশ দিচ্ছে—দেখ্, তোর ঐ সবুজ রঙের কোনই মানে নেই—ঐ আকাশের পানে চাওয়া আর ঐ বাতাসের সুরে গাওয়া সে কেবল চোখের ও গলার ক্লান্তি—আর ঐ সবগুলোকে জড়িয়ে রয়েছে মনের একটা বিরাট ভ্রান্তি।

কিন্তু প্রাণ যে জান্‌বেই—সে ত "মোহমুদ্গরের" সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শঙ্করভাষ্য পড়ে নি। সে ত যুক্তি দেয় না, ন্যায়ের পাতা উল্‌টোয় না। কোন দিক থেকে একদিন সে মরা গাঙের-ডাকা বানের মতো হুড়মুড় করে' এসে পড়ে—তার সে উচ্ছল চলচঞ্চল নৃত্যশীল স্রোতের বেগ হাস্‌তে হাস্‌তে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—সে স্রোতের বেগে তার দু'পারে যেখানে যত আল্‌গা মাটির চাপ সব ঝুপ্ ঝাপ্ করে' জলে পড়ে' কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়। মানুষের প্রাণ যেদিন জাগে, সেদিন পুঁথির পৃষ্ঠার সঙ্গে সে প্রাণকে মিলিয়ে নেবার জন্যে সে মোটেই ব্যাকুল হয় না—কারণ সে জানে যে তার নিজের মধ্যেই প্রাণকে মঙ্গলের পথে নিয়ে যাবার দেবতা জাগ্রত হ'য়ে আছেন—সে সেদিন এক শাস্ত্রের শ্লোককে খণ্ডন করবার জন্যে আর এক শাস্ত্রের শ্লোক খুঁজে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করে না—তার যুক্তি নেই, প্রমাণ নেই—কারণ তখন যে তার সত্য আছে—তাই সে

আপনার মুখের ভাষায় সোজা কথায়, সহস্র বিপদ যুক্তি থাকলেও তার মাঝে নির্ভয়েই বলে' ওঠে—

"মনের পথে যাত্রা নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তিও,
লক্ষ্মী আছেন সিন্ধু মাঝে মুক্তাভরা শুক্তি ও।"

ডেকে যখন বান আসে তখন ত নদীর সেই সংকীর্ণ পুরোনো খাতেই আর চলে না। ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ তার সে দু'পাশেও পাড়ির পাড় ভেঙ্গে কতদিনকার জানাশুনো নিবিড় ঝাউয়ের তিমির বন উপড়ে ফেলে, কত শতাব্দী পরিমিত মাথায় জটা বটগাছটার গহন ছায়া মুছে নিয়ে, তখন নদীকে একটা বৃহত্তর খাত করে' দিতেই হয়। একটা জাতির অন্তরে যখন তেমনি প্রাণের বান ডেকে আসে তখন ত তার সেই পুরোনো মনের খাতেই আর চলে না—তখন সেই জমাট বাঁধা মনের খাতের আশেপাশের হাজার পরিচিত সামগ্রীর মায়া ছেড়ে, সে মনের খাতকে বড় করতেই হয়—সে মনের খাতকে বড় হতেই হবে—আর তবে হবে জাতির পক্ষে মঙ্গল। কেননা পুরোনো মনের খাতকে বড় করলে তার আশেপাশেরই কিঞ্চিৎ ভাঙাগড়া করতে হবে—কিন্তু সেই মনের খাতকে কিছুমাত্র বড় না করলে প্রাণের বান উপ্‌চে উঠে এমনি একটা লণ্ডভণ্ড করবে যে তাতে সে পুরোণো মনের খাতকে ত চেনাই যাবে না, অথচ তার জায়গায় আর কোন নতুন শৃঙ্খলাকেও আমরা পাব না। প্রাণ যেখানে জেগেছে সেখানে সংকীর্ণতাকে মাথা নত করতেই হবে, সঙ্কোচকে কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতেই হবে। প্রাণের এই সনাতন ধর্ম্মকে মেনে যে সমাজ এই প্রাণকে অভিনন্দিত করে' তাকে প্রশস্ত অর্ঘ্য-

পাইয়ে দেবে, সেই সমাজই মঙ্গলকে পাবে—নইলে ঐ প্রাণের স্রোতের ছলছল হাস্য কলকল অট্টহাস্যে পরিণত হ'য়ে মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকেও, অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকেও, অধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মকেও ভাসিয়ে নেবে—তখন আর কালিয়-নাগকে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যশীল চরণের তলে ফণা-বিস্তার করে' থাক্‌তে দেখব না—দেখব তখন তা রুদ্রের মস্তকে আসন নিয়েছে।

ভগীরথের শঙ্খরবে যেমন ভাগীরথী নেমে এসেছিলেন, তেম্‌নি করে শঙ্খরবে যে বাঙলার স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রাণের স্রোত চারিয়ে গেল—এটা ত আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই। অসংখ্য শুষ্ক পত্র, শুভ্র পত্র, পীত পত্রের ভিতর থেকে যে "সবুজ পত্র" জেগে উঠল, আকাশের ভরা আলোর দিকে চোখ মেলে দিল, বাতাসের খোলা সুরের পানে কান খুলে দিল—সেই জেগে-ওঠার পিছনে যে কার্য্য কারণ দুই-ই রয়েছে—বাঙালীর কবি যে জমাট-বাঁধা বিজ্ঞতার বয়েসে শরৎ-উষার মতো তাজা ঠোঁট নিয়ে "ফাল্গুনী"র বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে বসন্ত-উষার মতো তরুণ সুরে গাইলেন—

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবে ছিলেম ফিরব না রে।
এই ত আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।

এত কবির একলার কথা নয়—এর পিছনে যে সমস্ত দেশের নব-জন্মের বেদনায় আনন্দ রয়েছে—লক্ষ তরুণ তরুণীর মূক মুখের নীরব

তাবা কবি-হৃদয়ের শৃঙ্খল-হীন বিরোধ-হীন সহানুভূতির ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরে জমা হয়ে উঠে তাঁর বাঁশীর গানে মূর্ত্ত হল—তাই না ও-গানকে আজ আমরা সত্য করে' পাচ্ছি, অমৃত বলে মান্‌ছি। ঐ নবীন কিশলয়গুলোকে যে আজ বাড়তেই হবে। জমাট-বাঁধা পাকা পাতার রাশের ভিতরে যেখান দিয়ে একটুকু আলোর রেখা আসছে, একটুকু বাতাসের আভাস ভাস্‌ছে সেই দিক দিয়ে যে তাদের কচি কচি মাথা ঠেলে তুলতেই হবে। কিন্তু মানুষ ত উদ্ভিদ নয়। গাছের পাতাকে যেখানে একটুকু আলো একটুকু বাতাসের অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে—মানুষ সেখানে সেই আলো বাতাসের জন্যে আকুল হয়ে উঠলে তখনই তার চারিদিকের দেয়ালের গা ভেঙ্গে মস্ত মস্ত জানালা বসিয়ে দেবে। এই জানালা বসাবার কথা মুখে আনতেই ত বিজ্ঞ মহলে মহা মাথা নাড়ানাড়ি পড়ে গেল। তাঁরা অবস্থা সঙ্কীর্ণ বুঝে দু' আঙুলের বদলে চার আঙুলের ফাঁকে প্রকাণ্ড এক টিপ নস্যি নিয়ে বলতে সুরু করলেন—না, না, জানালা?—তা হতেই পারে না—এমনি নিরেট দেয়ালের মাঝে আমরা পাঁচ শ' সাত শ' হাজার বছর কাটিয়েছি, আর আজ কিনা সেখানে ম্লেচ্ছের অনুকরণে একটা বিশ্রী হাঁ-করা জানালা বসিয়ে দেবে—এ হতেই পারে না। আর ঐ জানালা দিয়ে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই কখন কি যে ঢুকবে তার ঠিক কি? আলো বাতাসের জন্যে ব্যাকুল যাঁরা তাঁরা বিজ্ঞ মহলের ও-কথা মোটেই কানে তুলছেন না—ও-কথা মান্‌বার তাঁদের উপায়ই নেই। তখন বিজ্ঞ-মহল সেই দেয়ালের ধারে ধারে হাজার হাজার শাস্ত্র-পুলিশকে মোতায়েন করে' দিলেন—বুক ফুলিয়ে বললেন এখন এসো দেখ দিখি কে এই সনাতন দেয়াল ভাঙ্গে। সেই

শাস্ত্র-পুলিশরা দাঁড়িয়েই রইল—ভারী ভারী মোটা মোটা জাঁদ্‌রেলি চেহারা—তাদের কাঁধে অনুস্বারের সঙ্গীন—পিঠে ঝুলোনো ব্যাগে বিসর্গের "গ্রেনাদ্"—দু'-গালে লক্ষ্য বছরের বর্দ্ধিত মিশমিশে কালো গালপাট্টা—গালপাট্টা দাড়ি গোঁফে তাদের চেহারা যে কেমন তা দেখাই যায় না—তারা দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করছে না অভয় দিচ্ছে তা বোঝবারই উপায় নেই—সে চেহারা দেখে বিজ্ঞ-মহলের সাহস বেড়ে গেল—বড় আর এক টিপ নস্যি নিয়ে নাথাটা তেজালো করে' জোরালো গলায় হাঁক্‌লেন—এইবার এসো দেখি কে এ দেয়াল ভাঙবে—এ আমার বাড়ী আমার ঘর—আমি এ কাউকে ভাঙতে দেব না। সবুজ পাতারা বসন্তের বাতাসে দোল খেতে খেতে অতি অপ্রতিভ ভাবে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌লে—মহাশয়রা গোড়াতেই একটা বড় ভুল করে' বস্‌বেন না—এ আমাদেরও বাড়ী বটে।

যুদ্ধ বাধল—অর্থাৎ বাকের। চক্রব্যূহ রচিত হল—অর্থাৎ তর্কের। প্রবীন দল নবীন দলকে চোখ রাঙিয়ে বললেন—তোমাদের প্রাণের স্রোত না অশ্বডিম্ব—আসল কথাটা হচ্ছে ছেলেমানুষী, উত্তরে নবীন দল প্রবীন দলকে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে—আপনাদের বিজ্ঞতা না হাতি—আসল রোগটা হচ্ছে আরামী মেজাজ। প্রবীণরা গেলেন চটে। তাঁদের মুখ দিয়ে তখন গাদা গাদা অনুস্বার বিসর্গ ছুটে বেরুতে লাগ্‌ল। নবীন তা মহা কৌতূহলী হয়ে এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিতে লাগল। মনে মনে প্রবীণদের উদ্দেশ্য করে' বল্‌লে—আপনারা অনুস্বার-বিসর্গেরই চর্চ্চা করুন, আমরা এদিকে জানালা বসাই।

কিন্তু নবীনরা যে শুধু গায়ের জোরেই জানালা বসাবে, এই এত

বড় অভদ্র কথাটা ত আজ কিছুতেই চোখ খুলে সমর্থন করা যায় না। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে—বাড়ীর রঙ্ ঢঙ্ কার ব্যবস্থানুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে? ঐ আরামী মেজাজের মতলবে? না—ছেলে-মানুষের খোস খেয়ালে? এর বিচার কেবলমাত্র একই উপায়ে হতে পারে। সেটা হচ্ছে এই যে, ঐ দু'দলকেই আলোচনার বাইরে রেখে ঐ বাড়ীর চিরন্তন মঙ্গলের পথ কি, নির্দ্ধারণ করা—ঐ বাড়ীর এক যুগের লোকের আরামের ব্যবস্থা নয়—কিম্বা এক দল লোকের খেয়ালের সার্থকতা নয়—সেটা হচ্ছে সকল যুগের লোকের কল্যাণের পথ। সুতরাং আমাদের সত্য দেখতে হবে কেননা একমাত্র সত্যেই কল্যান রয়েছে। দেখতে হবে আমাদের মানুষের সত্য, সমাজের সত্য—ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যেকার যে যোগ সেই যোগের সত্য-সম্বন্ধ।

(২)

মানুষের অন্তরে সবার চাইতে আদিম সম্পদ হচ্ছে তার স্বাধীনতা। একদিন মানুষ ছিল বাতাসের মতোই স্বাধীন—কিন্তু না—বাতাসের চাইতেও বেশি। কেননা বাতাসের মন বলে' কোন জিনিস নেই—কিন্তু মানুষের ছিল। বাতাসের চলা-ফেরা নির্ভর করে অনৈসর্গিক কারণের ওপরে—কিন্তু মানুষের চলাফেরা নির্ভর করে তার নিজের উপরেই—তার ইচ্ছা, তার will-এর উপরে। সেই আদিম-কালে মানুষের যে কেমন জীবন ছিল, তার ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগ্‌ল, ততই দেখা গেল যে মানুষের অন্তরে এই স্বাধীনতার পাশে পাশে আর একটা নতুন জিনিস গড়ে'

উঠছে—সেটা হচ্ছে অপর মানুষের সঙ্গলাভের ইচ্ছা। নিতান্ত একা থাকাটা তার কাছে ধীরে ধীরে রসহীন হ'য়ে উঠল। এমন কি তার যদৃচ্ছা স্বাধীনতাও সেটার ক্ষতি পূরণ করতে পারলে না। নিজেকে সে অন্যের ভিতরে দেখতে চায়—নিজের মনের ভাব সে অন্যকে জানাতে চায়। তার সুখে দুঃখে আমোদে আহ্লাদে একজন অংশীদার না হ'লে আর তার চলে না। যেদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হ'ল সেই দিন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হল। সেদিন নিশ্চয় দেবলোকে দুন্দুভি বেজে উঠেছিল—স্বর্গ থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করেছিলেন। কেননা সেই যে কোন্ আদিম কালে কোন্ গহন ঘন অরণ্যের অন্তরালে দুটি মানুষের মিলন, সে হচ্ছে মানব-সভ্যতা-সৌধের প্রথম প্রস্তর-স্থাপনা। ঐ দুটি মানুষের একদিন মিলন হয়েছিল বলে' জঙ্গল কেটে পল্লী বসল, পল্লী ক্রমে নগর হল, নগর নগরী ক্রমে রাজ্য হল, রাজ্য ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হ'য়ে মানুষের মনুষ্যত্বের বিচিত্রতম বিলাসের পথ করে' দিলে—বিচিত্রতম বিকাশে সার্থক করে তুল্‌লে।

কিন্তু ঐ যে অসীম স্বাধীনতার অধিকারী দুটি মানুষ—যে মুহূর্ত্ত থেকে সেই দুটি মানুষ একত্র বসবাস করতে আরম্ভ করল—সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাদের সেই অসীম স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাতেই হল। কেননা তখন তাদের ঐ একত্র বসবাস চিরকাল সম্ভব করে' তুলতে চাইলে তাদের দুজনকেই পরস্পরের মন রেখে চলতে হবে—পরস্পরের সুখ সুবিধা দেখতে হবে—পরস্পরের রুচি বিশ্বাস ভাব সমস্তকে সম্মান করে' চলতে হবে। প্রতি মুহূর্ত্তে যদি তাদের পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে' চলতে হয়, তবে তাদের একত্র

বসবাস যে রাত্তিরও পোয়াবে না এটা নিশ্চয় করে' ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। আঘাতের উপরে কিছুই গড়ে ওঠে না, তার নীচে যা কিছু সবই ভেঙ্গে যায়। সুতরাং ঐ দুটি মানুষ যদি বাস্তবিকই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গলাভের একান্ত অভিলাষী হন তবে তাদের মনের ভাব প্রাণের বেগ ইত্যাদিকে একটা সংযমের মধ্যে আবদ্ধ করতেই হয়—এক কথায় তার যদৃচ্ছা স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাতেই হয়। অপরের সঙ্গলাভের ইচ্ছা সার্থক করতে চাইলে মানুষকে ঐ মূল্যই দিতে হয়। এই হচ্ছে সমাজ সম্বন্ধে ভিতরের আসল কথাটা।

সুতরাং আমরা যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনটাকে একটা সংযমের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাই—আমাদের মনকে প্রাণকে বাক্‌কে কার্য্যকে একটা সংযমের বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করি, সে-সবের আদিম সত্যটা—অর্থাৎ যে-সত্য থেকে তা উদ্ভূত হয়েছিল - সেটা নৈতিক শিক্ষাও নয় বা আধ্যাত্মিক দীক্ষাও নয়—সেটা হচ্ছে কেবল মানুষের একটা ইচ্ছার সার্থকতা সাধন করবার জন্যে, আর একটি ইচ্ছার সঙ্কোচ। রামের সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব করবার নিতান্তই গরজ হয়ে থাকে তবে অবশ্য রামের পাকা-ধানে মই দেওয়াটা তার প্রকৃষ্ট পন্থা নয়—এটা বোঝবার জন্যে পদ্মাসন করে' ধ্যানে বসে যেতে হয় না।

কিন্তু সেই প্রথম যেদিন দুটি মানুষের মিলন হয়েছিল, সে দিন থেকে আজ কত লক্ষ লক্ষ বৎসর কেটে গিয়েছে—আজ মানুষের সমাজ দুটি মানুষের নয়—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের। এতদিন বেঁচে এসে আজ আমরা মানুষ নামক জীবটিকে অনেক পরিমাণেই জানি—তার মনের ভাব, প্রাণের ভঙ্গী, বুদ্ধির গতি ইত্যাদি অনেক রহস্যই

আজ আমাদের চোখের সাম্‌নে খুলে গেছে। আজ আমরা জানি তার দুঃখ কিসে, সুখ কোথায়। এই মানুষকে আজ আমরা জানি বলে' আজ আমার প্রতিবেশী কিসে আমার প্রতি বিরূপ না হয় তার জন্যে প্রতি পদে পদে আমাকে আর চিন্তা করে' করে' পা ফেলতে হয় না—তার সম্বন্ধে আমার একটা ব্যবহার জমাট বেঁধে উঠেছে। কিন্তু আমাদেরই এই জমাট-বাঁধা ব্যবহারের পিছনকার আসল সত্যটা সবাই ভুলে গিয়েছি—আজ আমরা ঐ ব্যবহারের পিছনকার একটা মানসী মূর্ত্তিকে সত্য-দেবতা রূপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি—এই দেবতারই নাম হচ্ছে নীতি। কিন্তু ঐ যে বলেছি আমাদের জমাট-বাঁধা ব্যবহার, এ আমাদের এমনি অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে—এমনি second nature হ'য়ে উঠেছে যে, ঐ ব্যবহারের অন্তরালে যে আমাদের স্বাধীনতার সঙ্কোচ রয়েছে তা আমরা কেউ মনেও করতে পারি নে—কেননা সেই আদিম মানুষের মতো সেই উদ্দাম স্বাধীনতা আজ আমরা কেউ অনুভব করতে পারি নে—অশিষ্ট মনের চাঞ্চল্যও আজ আর আমাদের জীবনে নেই। এ-সব অত্যন্তই ভাল কথা সন্দেহ নেই—কিন্তু—

এই "কিন্তু"টাকে নিয়ে যত মুস্কিল। কেননা সমাজের উপরে যেমন ব্যক্তিবিশেষের অত্যাচার আছে তেমনি ব্যক্তি বিশেষের উপরেও সমাজের অত্যাচার বলে' একটি পদার্থ আছে। আর এ দুই অত্যা-চারের দ্বিতীয় আত্যাচারটিই ভীষণ। কেননা একটা মানুষ যখন সমাজের উপরে অত্যাচার করে' তখন তাকে শাস্তি দেবার জন্যে ত লক্ষ লোকের মন বুদ্ধি হাত পা রয়েছেই—যার শক্তি অব্যর্থ। কিন্তু যখন লক্ষ লোকে মিলে একটা ব্যক্তির উপরে অত্যাচার করে

তখন আর তার কোন আপিল্ নেই। এই ব্যষ্টির উপরে সমষ্টির অত্যাচারের সম্ভাবনা ও সুবিধা বর্ত্তমান হিন্দুর সমাজে অনেক। হিন্দুর সমাজে মানুষের মনে নীতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতিও এসে যোগ দিয়েছে—এই রীতিনীতিই বর্ত্তমানে ধর্ম্ম নাম নিয়ে হিন্দু সমাজে একাধিপত্য রাজত্ব বিস্তার করেছে—এই ধর্ম্ম যেমন তেমন ধর্ম্ম নয় একেবারে সনাতন ধর্ম্ম। এই সনাতন ধর্ম্মের দু'পাশে দুই অসুর দাঁড়িয়ে মোটা মোটা দু'জোড়া গোঁফ পাকিয়ে চোখ লাল করে মানুষের আত্মা নামক জিনিসটিকে একেবারে চেপ্টা করে' ছেড়ে দিচ্ছে—এই দু'-অসুর হচ্ছে সমাজ-চ্যুতি ও স্বর্গচ্যুতির ভয়।

(৩)

এখন পূর্ব্বে যা বলে' আসা গেল সেই কথাগুলো যদি স্বীকার করি তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটাও মানতে হয় যে, আমাদের যে প্রতি-দিনকার আচার ব্যবহার—তা সে আচার ব্যবহার আমাদের মনে অধিষ্ঠিত নীতি-গুরুমহাশয়ের বেতের ভয়েই সোজা চলুক, বা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত রীতি-দেবতার মুরুব্বিয়ানার আদরেই "বৃন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" বলে' মাটি গেড়ে বসুক —সে রীতিনীতির একটা মুসাবিদা মনুই লিখুন বা রঘুনন্দনই করুন— সে সবের একটা কোন বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক মূল্য বা অর্থ নেই—অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে spiritual significance ও intrinsive value, তা নেই। আর এ কথাটা এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল যে, সকল জিনিসেরই আধ্যাত্মিতার দিকটাই হচ্ছে মানুষের দিক থেকে সবার চাইতে বড় দিক।

উপরের ঐ কথা শুনে সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই বলে' উঠবেন, ওটা হচ্ছে একটা অতি সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত—ও সিদ্ধান্ত সত্যিও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। মিথ্যা যদি হয় তবে ত ও-কথা বলাই পাপ, আর যদি সত্যি হয় তবে অমন সব সাংঘাতিক সত্য দশজনের সমুখে প্রকাশ করার মতো অবিবেচনার কাজ আর কিছু হ'তে পারে না। কেননা আমরা যদি রীতির পিছন থেকে নীতি ও নীতির পিছন থেকে নরক-ভয়কে খারিজ করে' দেই, তবে সমাজের রামশ্যামহরি অমনি সবাই উশৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে—কাউকেই আর ঠেকান যাবে না। কিন্তু আসলে কোন ভয় পাবার দরকার নেই। কেন?—তা বলছি।

প্রথমত, এ-কথা সত্য নয় যে রামশ্যামহরি আজ সবাই উশৃঙ্খল হবার জন্যেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে—এবং তারা তাদের সে রোখকে সংযম করে' রেখেছে কেবল পরলোকের ভয়ে। সামাজে উশৃঙ্খল হবার অর্থ—অন্তত যে উশৃঙ্খলতায় সমাজের আর দশজনের প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু আসে যায়—সেটা হচ্ছে সমাজের অপর সভ্যদের আঘাত করা—দেহে বা মনে। কিন্তু অপর মানুষকে আঘাত করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। যদি বল যে সমাজে কেউ কাউকে কি আঘাত করে না?—অবশ্য করে। কিন্তু সেইটেই হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রত্যেক সমাজের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে যারা আঘাত করে তাদের সংখ্যা যারা আঘাত করে না তাদের চাইতে অনেক কম।

দ্বিতীয়ত, মানুষ সাধারণত শান্তিপ্রিয়—অ-সাধারণত সংগ্রাম-প্রিয়। যে উশৃঙ্খল সে সমাজে অশান্তি আনবার সঙ্গে সঙ্গে আপনারও অশান্তি ঘটায়—সুতরাং আপন গরজেই তাকে সংযমী হতে হয়।

তৃতীয়ত, মানুষের অপর মানুষের সঙ্গলাভের ইচ্ছা এমনি একটা প্রবল ইচ্ছা, এমনি একটা সত্য ইচ্ছা যে, কেবল ওর তাগিদেই তাকে অন্য দশজনের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে চলতে হবে। মানুষের পক্ষে অপর মানুষের শ্রদ্ধা প্রীতি ইত্যাদি আকর্ষণ করবার ইচ্ছাও একটা অতি স্বাভাবিক ইচ্ছা—এই ইচ্ছাই মানুষকে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবান প্রীতিমান হ'তে শেখায়, কেননা এক প্রীতিই প্রীতিদান করতে পারে। অবশ্য এমন লোকও দেখা গেছে যারা প্রীতিরও ধার ধারে না বা শান্তি-শোয়াস্তিরও তোয়াক্কা রাখে না—কিন্তু দেখা গেছে এমন লোকদের রীতির পিছনে নীতি ও নীতির পিছনে আধ্যাত্মিকতার লম্বা বক্তৃতা জুড়ে দিয়েও তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। সুতরাং নতুন কোন একটা সামাজিক প্রলয়ের কারণ সৃষ্টি করা হবে না, যদি একথা বলা যায় যে আমাদের আচার ব্যবহারের পিছনকার অর্থটা আধ্যাত্মিক নয়, সেটা হচ্ছে নিছক সামাজিক—অর্থাৎ ওর Significance spiritual নয়—Sociological.

আসলে মানুষ দেবতা না হলেও দানব নয়—মানুষের মধ্যে ভাল হবার ইচ্ছা নিজ গুণেই বর্ত্তমান। নিট্‌সশ সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে দয়া মায়া স্নেহ প্রীতি ইত্যাদি চিরকাল বর্ত্তমান হ'য়ে রয়েছে এবং আশা করা যায় চিরকাল থাকবেও। মানুষের মধ্যে যদি এই নিজে ভাল হবার ইচ্ছা, পরের ভাল করবার ইচ্ছা না থাকত তবে এতদিনে মানুষের হাতে পায়ে বড় বড় ধারাল নখ দেখতে পাওয়া যেত। মানুষ এঞ্জিন নয় যে তাকে "রিলিজনের হাপরে পুড়িয়ে নীতির হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে গড়ে তোলা যাবে। মানুষের অন্তরে এমন একজন কেউ আছেন যিনি আপন আনন্দেই মানুষকে

চালিয়ে নিয়ে, চলেছেন। মানুষকে অতিরিক্ত objective করে' দেখাই ভুল দেখা। মানুষের আসল সত্যই হচ্ছে যে, সে Subjective—কারণ সে চৈতন্যময় পুরুষ। মানুষের অন্তরের ঐ পুরুষকে অন্ধ করে' যখন আমরা বাইয়ের নিয়ম কানুনকেই চক্ষুষ্মান করে' তুলি, তখন আমাদের ব্যবহারটাও সঙ্গে সঙ্গে হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রীর মতো হ'য়ে পড়ে। রাজা হবচন্দ্র একদিন ফাল্গুনের শেষে প্রচণ্ড বিরক্ত ও বিমর্ষ হ'য়ে উঠেছিলেন। মন্ত্রী গবচন্দ্র তৎক্ষণাৎ দশহাজার লোক লাগিয়ে দিলেন রাজবাগানের হাজার আম গাছে উঠে তাদের ডালপালা ভীষণ ভাবে ঝাঁকাঝাঁকি করতে। বলা বাহুল্য উক্ত উপায়ে কোন বাতাস সৃষ্ট হয়ে গ্রীষ্মকে শীতল করে' নি—লাভের মধ্যে সেবার রাজার আমবাগানে একটি আমগাছেও আম ফল্‌ল না।

কেউ কেউ এইখানে বলে' উঠতে পারেন যে মন্ত্রী গবচন্দ্র যাই করুন-না কেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক যেমন সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করে' তাকে "ইলেকট্রণ"-এ পরিণত করেন, তেমনি নীতি জিনিসটাকে অমন করে' বিশ্লেষণ করে' আকাশে উড়িয়ে দেবার প্রয়োজনটা কি? রীতির পিছনে নীতি, নীতির পিছনে স্বর্গলাভের লোভ থাকলই বা—ওই ভয়ে আর ওই লোভেই যদি সমাজে দু' একজনাও শিষ্ট হ'য়ে উঠে তবে ক্ষতিই বা কি আর মন্দই বা কি? অবশ্য কথাটা অত্যন্ত সমীচীন।

কিন্তু আমাদের সমাজমনকে চারিদিক থেকে যে বহুদিন হ'ল নানা ব্যাধি আক্রমণ করেছে এটা আজ আমরা আমাদের শরীর একটুকু নাড়াচাড়া করতেই টের পেয়েছি। আজ আমরা বিশ্ব মহারাজের

রাজপথে একটুকু সজোরে পদক্ষেপ করে' দু' এক পা যেতেই আমাদের মনের নানা দিক থেকে মুমুর্ষুর যন্ত্রনার "উহু উহু" শব্দ শুনতে পেয়েছি। ঐ "উহু উহু"-তে আমরা আজ সন্তুষ্ট। কারণ ওটা হচ্ছে এরি প্রমাণ যে আমাদের মন একেবারে অসাড় হয় নি—অর্থাৎ মরে নি—তবে ব্যাধি-আক্রান্ত। কিন্তু রোগমুক্ত হবার ইচ্ছা মানুষের একটা স্বভাবিক ইচ্ছা। আমাদের সমাজ মনকে আমরা সকল প্রকার ব্যাধি হ'তে মুক্ত করতে চাই-ই। চিকিৎসা শাস্ত্রের এই কথাটা আজ সবাই জানেন যে রোগীকে ভাল করতে হ'লে সর্ব্ব-প্রথমে দরকার তার সর্ব্ব-প্রকার ভয় ভাঙ্গান। আমাদের সমাজ-মন থেকে সর্ব্ব-প্রথমে দরকার সকল প্রকারের ভয় তাড়ান। নীতির পিছনের যে সত্যটা সেটা যে মানুষের প্রতি মানুষের প্রীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহলোক বা পরলোকের ভীতির উপরে নয়—একথাটা তাই আজ আমাদের পরিষ্কার করে দেখতেই হবে। যে ছেলেটা অতিরিক্ত রকমের দুর্দ্দান্ত সে-ছেলেটার পক্ষে দু' একটু জুজু-বুড়ির ভয় থাকাটা হয়ত মন্দ নয়—কিন্তু যে পিলেপেটা রোগা ছেলেটি বাতাস একটু জোরে বইলেই ভয়ে কেঁকিয়ে ওঠে তার মনের পিঠে আরও দু'-একটা ভূতের ভয়ের পুলটিস্ লাগিয়ে দিলে সে যে অতি শীঘ্রই পঞ্চভূতের সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে তার কোন সন্দেহ নেই। সকল রোগীরই যে এক পথ্য নয় এটা কি আয়ুর্ব্বেদ কি হোমিওপ্যাথি কি এলোপ্যাথি সকল শাস্ত্রেই বলে। আর আমাদের সমাজের, দুর্দ্দান্ত ছেলেটার চাইতে পিলে-পেটা ছেলেটার সঙ্গেই যে বেশি সাদৃশ্য আছে তা নেহাৎ অপ্রত্যক্ষ নয়।

এখন উপরে যে সব কথা বলা গেল সেই সব কথার সিদ্ধান্ত

স্বরূপে এই কথাটা নির্ব্বিঘ্নে বলা যেতে পারে মনে করি যে, যিনি সমুদ্রযাত্রা করেন আর যিনি করেন না, তাঁদের দু'জনের মধ্যে স্বর্গলাভের সম্ভাবনার কোনই তারতম্য নেই। যে-কোন সমাজের যে-কোন আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সুতরাং হিন্দুর সামাজিক আইন কানুনের, মানুষকে বিশেষ করে' ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়ে দেবার, কোন ভগবানদত্ত ক্ষমতা নেই।

সুতরাং এই কথাটা আজ আমরা নির্ভয়েই মনে করব যে আমাদের বাপ দাদারা টিকটিকিটাকে যতখানি সম্মান করে' চলতেন, আমরা যদি ততখানি সম্মান করে' না চলি, তবে আমাদের আত্মার অধোগতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যে টিকটিকিটাকে সম্মান না-করবার স্বাধীনতা এই-ই হচ্ছে মানুষের আত্মার স্বাধীনতা;—প্রাচীনের কবল থেকে, গতানুগতিকের শৃঙ্খল থেকে, অর্থাৎ অপর মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি, তা হোক্ সে "অপর মানুষ" নিজেরই বাপ-দাদা। এই স্বাধীনতা যেখানে অস্বীকৃত হয়েছে সেখানে মানুষের প্রাণের গতি মরে' এসেছে, মন জমাট বেঁধে উঠেছে, বুদ্ধি অল্প হ'য়ে গিয়েছে—মানুষ ধীরে ধীরে সেখানে হয়ে ওঠে মেষ। ঐ অবস্থায় তারপর একদিন যখন এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতে আমাদের মনুষ্যত্বের ডাক পড়ে তখন অন্তরের চারদিকে হাত্ড়ে হাত্ড়ে দেখি সেখানে কোন খানেই এক ছটাক মনুষ্যত্বও আর অবশিষ্ট নেই।

এই মনুষ্যত্বের ডাক পড়েও—কেন পড়ে? তা বুঝলেই ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কার হয়ে আসবে।

(৪)

যে-মানুষ বলে জগতে যা-কিছু জানবার আছে তা তার জানা হ'য়ে গেছে—এবং সে যা জানে তাই হচ্ছে সকল জানার সেরা জানা—এ-জগতের একেবারে শেষ খবরটা পিতামহ ব্রহ্মা তার কাছে পাঁচ হাজার বছর পূর্ব্বে তারহীন টেলিগ্রাফের কোডের সাহায্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তার আর কিছু জানবারও নেই বোঝবারও নেই, শোনবারও নেই শোনাবারও নেই—সেই মানুষটাকে আজ আমরা এই হাজার প্রশ্ন হাজার সমস্যার মাঝে অবশ্য কৃপার চক্ষেই দেখি এবং তার তুল্য হাস্যাস্পদ জীব আর আমরা খুঁজে পাই নে। কিন্তু একটা ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যা হাস্যাস্পদ মাত্র একটা সমাজের পক্ষে ঠিক সেইটেই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

মানুষের উপরোক্ত মনোভাব, দুটি কারণে ঘটতে পারে। একটি হচ্ছে তার মস্তিষ্ক নামক স্থানটিতে বুদ্ধি নামক পদার্থটির কিঞ্চিৎ অভাব—দ্বিতীয়টি তার হৃদয় নামক জায়গাটিতে আত্মম্ভরিতা নামক জিনিসটির প্রচুর সদ্ভাব। ঐ দুয়ের পরিণাম ফলই হচ্ছে মানুষের পতন। সমাজ ও জাতির দিক থেকে ফল একই।

সেই প্রথম-যেদিন দুটি মানুষের প্রথম মিলন হয়েছিল—সেদিন থেকে লক্ষ বৎসর কেটে গেছে—আজ মানুষের সমাজ যে কেবলই লক্ষ লক্ষ মানুষের, শুধু তাই নয়—আবার লক্ষ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন সমাজও বটে—যা গড়ে' উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মভেদে জাতিভেদে বা দেশভেদে। এই সব বিভিন্ন সমাজের মধ্যেও আদান প্রদান চলেছে। মানুষের ও মানুষের মধ্যে যে আদান প্রদানের ইচ্ছার সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে

মিলন হয়—ব্যষ্টির বৃহত্তর রূপ সমষ্টিগত সমাজেও সেই সত্যই ফুটে উঠছে। ব্যষ্টিতে যা আছে সমষ্টিতেও সেই ধর্ম্মই ফুটে ওঠে। ব্যষ্টিগত ভাবে সবাই সামাজিক জীব—আর সমষ্টিগত অবস্থানে সবাই মৌনী-বাবা হন না। আবার অপর পক্ষে ব্যষ্টিতে যা মোটেই নেই সমষ্টিতে হলেই তা গজিয়ে ওঠে না। ব্যক্তিগত ভাবে সবাই উড়ে-মালি—আর তারা সমষ্টিগত হলেই নেপোলিয়ান বা চেঙ্গিস্‌খাঁর মত পৃথিবী জয় করে' নিয়ে এলো—এমনটা হয় না।

সে যা হোক্, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সমাজে সমাজে এই যে আদান প্রদান তা হতে পারে—এবং চিরকাল যা হ'য়ে আসছে—দুটি রকমে। হয় প্রীতির ভিতর দিয়ে মিলনে, নয় দ্বন্দের ভিতর দিয়ে সংঘর্ষে। এই দ্বন্দের পিছনে আছে সমাজবিশেষের স্বার্থ বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বেষ। এই সংঘর্ষ যে কেন হয়, মানুষের স্বার্থ যে কত রকমের সে আর এক লম্বা ইতিহাস। বলা বাহুল্য তার জায়গা এখানে নেই। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই সংঘর্ষ হয়ই—এটা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য।

এই দু'-রকমের আদান প্রদানে মানুষের দু'-রকম মনের ভাব হতে বাধ্য। যখন কেউ প্রীতি সঙ্গে নিয়ে মিলন প্রত্যাশী হ'য়ে আমাদের দ্বারে আসে তখন আর তাকে আমরা ফেরাতে পারি নে—মানুষের সে স্বভাব নয়। কিন্তু যখন কেউ স্বার্থ বা দ্বেষ সঙ্গে নিয়ে আমাদের আঘাত করতে আসে, তখন আমরা সে আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে প্রাণ কবুল করি—মানুষের এও স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই দ্বেষের সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড়িয়ে আমাদের বাধ্য হ'য়ে দেশের কথা কইতে হয়।

একটা দেশে জাতি বা সমাজের প্রতি আর একটি দেশ জাতি ব
সমাজের যে আঘাত—এ আঘাতের দুটো দিক আছে—একটা অন্নে
দিক আর একটা আত্মার দিক—হয় দেহ দিয়ে দেহকে আঘাত, ম
মন দিয়ে মনকে আঘাত। আমরা হিন্দুরা দেহের চাইতে আত্মাকে
বড় বলে' মানি—সুতরাং সমাজে সমাজে এই দ্বন্দে মনের পরাজয়
বড় পরাজয়।

এই পরাজয় থেকে বাঁচবারও আবার দুটী উপায়। তার মধ্যে
প্রথমটি হচ্ছে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে দশদিকের দিকপাল
গণকে সাক্ষী রেখে আততায়ীর কাছে হাতেকলমে প্রমাণ দেওয়া
যে, আমার দেহ তার দেহের চাইতে দৃঢ়; আমার মন তার মনের
চাইতে বলিষ্ঠ—দেহের ধ্বংস ঘটতে পারে কিন্তু আমার আত্মা
স্বাতন্ত্র্য তার আত্মার নিকট মাথা নত করবে না—করবে না। আর
ঐ করতে গেলেই তখন ডাক পড়ে মানুষের মনুষ্যত্বের। কিন্তু আমি
আগেই বলেছি এই মনুষ্যত্বই বজায় থাকে না, যদি না মানুষের মনের
দিকটা মুক্ত থাকে।

আর দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে সমাজের চারিদিকে প্রকাণ্ড "অচলায়
তনের" দেয়াল তুলে দিয়ে অবরুদ্ধ দুর্গবাসীর মতো বাস করা। হিন্দু
এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেছিল।

কিন্তু ঐ দ্বিতীয় উপায়টি একটা উপায় হলেও, ওই উপায়ের
ভিতরে একটা মস্ত বিপদ আছে—যদি না সব সময়ে সজাগ থাক
যায় তবে সেই বিপদ মানুষকে জড়িয়ে ধরেই। কারণ "অচলায়
তনের" ঐ দুর্গের মাঝে মানুষকে বাস করতে হয় সমস্ত বিশ্বকে
বাইরে রেখে—তাকে চলতে হয় সমস্ত বিশ্বমানবের সংস্পর্শ থেকে

আপনাকে বাঁচিয়ে। তার সামনে আর তখন কোন নতুন সমস্যা নেই, নতুন চিন্তা নেই, নতুন প্রশ্ন নেই—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই "থোর বড়ি খাড়া" আর "খাড়া বড়ি থোর"—ঐ অবস্থায় সব কিছুই পুরাতন হয়ে আসে—সেই পুরাতনে সব একঘেয়ে হয়ে ওঠে—তখন আর মানুষের নতুন উৎসাহ নতুন উদ্যম থাকে না—ঐ অবস্থায় মানুষের প্রাণ নিস্তেজ হয়ে আসে, বুদ্ধি জমাট-বাঁধা পাথরের মতো হয়ে যায়—চারিদিকে তার আরামের আবেশ ঘিরে আসে—তখন সে চৈতন্যময় শক্তিময় আনন্দময় পুরুষ নয়--সে হচ্ছে তখন অভ্যাসের চাবি দিয়ে দম-দেওয়া কলের এঞ্জিন—মানুষের ঐ খানে জীবন্ত সমাধি—ঐ খানে মানুষের আত্মা আপনাকে প্রকাশ করবার কোন পথই পায় না।

এই মৃত্যু থেকে বাঁচতে হ'লে চাই বিশ্বের সঙ্গে সমাজের সংযোগ—সমাজের মাঝ দিয়ে বিশ্বের আলোকের মুক্ত ধারা বিশ্বের বাতাসের মুক্ত প্রবাহ—যে আলোক যে বাতাস সমাজমনকে নিত্য নব নব স্বপ্ন দিয়ে নিত্য নব নব কর্ম্মে নিয়োগ করে' নব নব উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে' রখবে; সুতরাং চাই চারিদিকে মুক্ত বায়ু মুক্ত আলোক, কাজেই চাই সনাতন দেয়ালের গায়ে সারি সারি ওম্‌নি সনাতন জানালা।

আর যদি জানালা না বসাই তবে মানুষ ঐ নিরেট দেয়ালের মাঝে একদিন চোখ কচ্‌লিয়ে জেগে উঠবে, জেগে উঠে শিউরে উঠ্‌বে, বল্‌বে—এ কি করেছি—এ কি কর্‌ছি—কোন্ মৃত্যু থেকে বাঁচতে গিয়ে আবার কোন্ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি। সেদিন জাগবে মানুষের আত্মার বিদ্রোহ। না না, চাই নে এই মৃত্যু—পলে পলে

তিলে তিলে এই মৃত্যু। সেদিন মানুষকে হাজার দেয়ালও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না—সেদিন সমাজের পাথর-বাঁধা শক্ত উঠানের বুক চিরেই "সবুজপত্র" গজিয়ে উঠবে—"ফাল্গুনী"র বাঁশী বেজে উঠবে—"পঞ্চকের" গলা কেঁপে উঠবে। সেদিন মানুষ দুর্ব্বার ভরসা নিয়ে বলে উঠবে—আমার যদি বাস্তবিকই কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে তবে বিশ্বের হাজার বিরোধের মধ্যে তা আপনাকে স্পষ্টই করে' তুল্‌বে উজ্জ্বলই করে' তুল্‌বে—আমি ভয় কর্‌ব না—ভয় করে' আমার সেই স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার কর্‌ব না—আমি ভয় কর্‌ব না—কারণ আমি জানি যে আমার মধ্যে যে পরম দেবতা আছেন তিনি মাটি নন পাথর নন—তিনি শাশ্বত তিনি অমৃত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভাইবোন।

——:•:——

জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর-বেলা ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে দিব্য আরামে ঘুমোচ্ছিলাম। কানের কাছে চেচামেচিতে ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল—বুঝলাম পাড়ার ছেলেরা জাম কুড়ুতে এসেচে। গাছে উঠতে পারে না অথচ জাম খাবার লোভ আছে, ছোট ছোট এমন পাঁচ সাত দশ জন ছেলে মেয়ে মিলে একটু বড় একজন কাকেও মুরুব্বি ধ'রে সময় নেই অসময় নেই এই জামতলায় জমায়েৎ হয়। গাছে উঠে মুরুব্বি বাছা বাছা জাম দিয়ে নিজের থলি ভর্ত্তি করে এবং কখনো বা দয়া কখনো বা রাগ করে পায়ের নীচের বা হাতের নাগালের একটা ডাল নেড়ে দেয়। তাতে কাঁচা পাকা যে সব জাম তলায় পড়ে ধুলো মেখে অখাদ্য হয়ে যায়, তাই কুড়োবার জন্য এই নিস্তব্ধ নিদাঘমধ্যাহ্ন নিত্য তারা কোলাহলে মুখরিত ক'রে তোলে। বারণ করলে তারা শোনে না—ধমক দিলে তখই চলে যায় বটে কিন্তু একটু এদিক ওদিক করে আবার ফিরে আসে ও নিঃশব্দে ইঙ্গিতে ইসারায় কাজ আরম্ভ করে দেয়। ক্রমে চাপা গলার আওয়াজ ও সতর্ক চাপা গলার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় ও শেষে জামতলা আবার তেমনি গুলজার হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তখন আবার ধমক দিতে মমতা হয়।

প্রতিবারই এই রকম হ'য়ে আসচে। এবার জাম নাবি, এখনো তাতে ভাল পাক ধরেনি। এখন থেকে গাছের ওপর নিত্য এই উপদ্রব চললে পাকবার আগেই জাম নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। তাই একবার মনে করলাম উঠে একটা তাড়া দিই কিন্তু আবার ভাবলাম তাতেই বা লাভ কি? জামতলায় ত পাহারা বসাতে পারব না।

শেষে পাশফিরে শুয়ে আবার ঘুমের সাধনা করাই সমধিক লোভনীয় মনে হল, কিন্তু গোলমালে ভাল ঘুম হল না যদিও সে আশা একেবারে ছাড়তেও পারা গেল না। সেই আধঘুম আধজাগার অবস্থায় বেকার মন যে কখন জামতলার বিচিত্র কোলাহলে আকৃষ্ট হয়ে পড়েচে বুঝতে পারি নি—আড়ি, ভাব, আবদার অভিমানের আভাষ কানে আসছিল এবং এবং বোধ হয় ভোলা যায় না এমন সব দিনের কথা মনে জাগিয়ে তুলছিল ব'লে ভালও লাগছিল।

শেষে হঠাৎ কান্নার শব্দে চমক ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্তম্ভিত ভাব ও পরক্ষণেই ঘোরতর কোলাহল। ব্যাপার কি জানবার জন্য তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দেখলাম—তিনচার বছরের মণ্টু মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর কাঁদচে এবং পাশে দাঁড়িয়ে তার দিদি খেঁদী অন্য দলের সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে ঝগড়া করচে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েচে রে?

আমার গলার আওয়াজ পেয়ে ছেলে মেয়ের দল একবাক্যে নালিশ করলে—খেঁদী মিছিমিছি মণ্টুর গালে চড় মেরেচে—যা'র সামান্য হলেও মনে হল মারামারিটা ভাল নয় তাই ভাবলাম একটু শাসন করে দেওয়া দরকার। অতঃপর গম্ভীরভাবে খেঁদীর দিকে চেয়ে বললাম—

"ওকে মেরেচিস কেন" ? খেঁদী কোন উত্তর করল না বরং যেন বেশ করেচে এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দেখে আমি চেঁচিয়ে আবার বললাম —"তুই ও'কে মারলি কেন"—বল শিগ্‌গীর—

এবার খেঁদী কথা কইল কিন্তু সে প্রায় নিজের সঙ্গে। শুধু আমার ধমক শুনে অন্য সকলে একেবারে চুপ করেছিল বলেই আমি শুনতে পেলাম খঁদী বলচে—কেন ও কাঁচা জাম খা'বে কেন ?

কাঁচা জাম খেয়েচে ? তা তোর ভাইকে তুই কোন দুটো ভাল জাম কুড়িয়ে দিলি ? "ছেলেমানুষ কি হুটোপুটির মধ্যে—ওরে দেবার জন্যেই ত আমি কুড়োচ্ছি নয়"—

ছেলেরা কেউ কেউ ব'লে উঠল—না অনিল দাদা, ভাল ভাল জাম ও নিজেই কুড়িয়ে খাচ্ছিল।

শুনে যুদ্ধং দেহির ভাবে তাদের দিকে ফিরে খেঁদী ব'লে উঠল—বেশ্ করেচি খেয়েচি—তোদের কি ? আমার জাম আমি খেয়েচি—আমার ভাইকে আমি মেরেচি। বেশ করেচি—

আবার ঝগড়া করতে' বসল—আরে মোল যা! যা সব তোরা এখান থেকে চ'লে যা। ফের যদি আজ জামতলায় আসবি ত দেখবি মজা—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম সকলে আস্তে আস্তে চলে যাচ্চে আর শুনলাম গালদুটো ফুলিয়ে মণ্টু দিদিকে শাসাচ্চে—মা'কে আমি ব'লে দেব কিন্তু।, তার কান্না ইতিমধ্যে থেমে গিইছিল।

শুয়ে শুয়ে বিচারকের বিড়ম্বনার কথা ভাবতে ভাবতে বেলা প'ড়ে এল। মুখহাত ধোবার জন্য উঠে অন্যমনস্ক ভাবে পেছনের দিকের জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম জামতলা নিস্তব্ধ শুধু একধারে

মণ্টু মাটিতে পড়ে ঘুমুচ্চে আর ঘুমন্ত ভাইটার মুখের ওপর থেকে পড়ন্ত-রোদ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে খেঁদী নিজ অঞ্চল বীজনে মাছি তাড়াচ্চে।

আমার তখন মনে পড়ে গেল এরা ভাইবোন—এতক্ষণ যে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

প্রবোধ ঘোষ।

"যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই আমি ছিলেম অন্যমনে!"

—রবীন্দ্রনাথ।

কথিকা।

—:*:—

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে,—মাটির কাছে ধরা দেবে বলে'। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্য অল্প জায়গার জগৎ, অল্প মানুষের। ঐটুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই—আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

*   *   *   *

কিন্তু কোন্ দেবতার কৌতুকহাস্যের মত অপরিমিত। নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোট মেয়েটির জন্ম? মা তাকে রেগে বলে "দস্যি," বাপ তাকে হেসে বলে "পাগ্‌লী"।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেণুবনের উপরডালের পাতা, কেবলি ঝির্ ঝির্ করে কাঁপচে।

আজ দেখি সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে—বাদলশেষের ইন্দ্রধনুটি বল্লেই হয়। তার বড় বড় দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানা-ভেজা পাখীর মত।

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর ; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ ; গাছের হতাশ্বাস পাতাগুলো শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ কাল আলুথালু পাগ্‌লা মেঘ্‌ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেল্‌লে। সূর্য্যাস্তের একটা রক্ত-রশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মত বেরিয়ে এল।

অর্দ্ধেক রাত্রে দেখি দরজাগুলো খড়্‌খড়্‌ শব্দে কাঁপ্‌চে। সমস্ত সহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মত দেখতে। আর গির্জ্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।

সকালে জলের ধারা আরো ঘনিয়ে এল—রৌদ্র আর উঠ্‌ল না।

* * * *

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তার বোন এসে তাকে বল্লে, 'মা ডাক্‌চে'। সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বেণী দুলে উঠ্‌ল। কাগজের নৌকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধরে টান্‌লে। সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তবু তার ভাই খেলার জন্যে টানাটানি করতে লাগ্‌ল। তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

* * * *

বৃষ্টি পড়চে। অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।

আদি যুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণ বিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদ্‌লার কলস্বরে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড় কাল, কত বড় জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীব-লীলা। সেই সুদূর সেই বিরাট, আজ এই দুরন্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল, মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির কলশব্দে।

ও তাই বড় বড় চোখ মেলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল,—যেন অনন্ত-কালেরই প্রতিমা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন রহস্য।

—:*:—

শ্রীযুক্ত সবুজপত্র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

এই আজ দু'তিন দিন হল একখানি স্বদেশী ইংরাজি-মাসিকপত্রে পড়লুম যে, আপনি পথ-চলতি ভাষাকে সাহিত্যে চালাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। শুনে খুসি হবেন যে, উক্ত পত্রের লেখক-সম্পাদক উভয়েরি মতে আপনার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। চলতি ভাষার চল নাকি এখন সকল কাগজেই হয়েছে—শুধু তাই নয়, যে সকল কাগজ মুখে চলতি ভাষার অতি বিরোধী, তারাও নাকি এমন সব লেখা প্রকাশ করে, যা আসলে গলিঘুঁজিতে চলতি হলেও রাজপথে অচল। এ কথা সম্ভবত সত্য, কেননা ইংরাজিতে বলে extremes meet,—অর্থাৎ দু-মুড়োতে ঠেকাঠেকি হয়।

কিন্তু এর থেকে মনে করবেন না যে, সাধুভাষার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। ভাল কথা, ভাষা সম্বন্ধে সাধু বিশেষণটা কি শুদ্ধ? আমার মতে ওটি সাধু না হয়ে সাধ্বী হওয়া উচিত। তাতে কেতাবী-ভাষার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলের—অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরাজি উভয় ভাষারই মর্য্যাদা সমান রক্ষিত হয়। সেদিন অনেক

বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনলুম যে, আপনার ভাষার রূপলাবণ্য, বেশভূষা, হাস্যলাস্য সবই থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রধান দোষ এই যে, তা chaste নয়।

সে যাই হোক্, আমি ঐ সাধু বিশেষণটিকে একেবারে বাদ দিতে চাই নে, কেননা আমি সাহিত্য থেকে কোনও চল্‌তি কথাকে বহিষ্কৃত করবার পক্ষপাতী নই। তবে সেই সঙ্গে "সাধ্বী" বিশেষণটিও স্থলবিশেষে ব্যবহার করব।

বাজে বকুনি ছেড়ে, এখন কাজের কথায় ফিরে আসা যাক্। সাধুভাষা এখন মাসিক পত্রের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তার পৃষ্ঠে ভর করেছে। এক কথায়, সাধুভাষা এখন সাহিত্যকে ত্যাগ করে বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিয়েছে। এই বিজ্ঞাপনের ভাষারই উচিত নাম হচ্ছে সাধ্বী। "আশ্রয় নিয়েছে" বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না, কেননা বিজ্ঞাপনের দেশে এই সাধ্বীভাষা এখন রাণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপ্রতিহত প্রভাবে দেশের লোকের মনোরঞ্জন করছে। সাধুভাষাকে লোকে কেন সাহিত্যের ভাষা বলে ?—এই কারণে যে, লোকের বিশ্বাস সাহিত্যের যা আসল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ পাঠককে কাঁদানো হাসানো ইত্যাদি—তা একমাত্র উক্ত ভাষার দ্বারাই সাধ্য হয়। আপনি যদি একসঙ্গে কাঁদ্‌তে ও হাস্‌তে চান, তাহলে এই পূজোর বিজ্ঞাপনগুলি পাঠ করুন, তাহলেই সাধ্বীভাষার শ্রী হ্রী ধী সম্বন্ধে আপনার সম্যক জ্ঞানলাভ হবে। আর এ ভাষার জ্যোতি! সূর্য্যের পাশে দীপ যেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, বিদ্যুতের পাশে খদ্যোত যেমন মিট্‌মিট্ করে, এই বিজ্ঞাপনের সাধ্বীভাষার পাশে সাহিত্যের সাধুভাষার অবস্থাও তদ্রূপ হয়। এমন কি ঢাকা

জেলার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, সাধুভাষার অদ্বিতীয় লেখক ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'প্রভাত চিন্তা' ও নিস্প্রভ হয়ে পড়ে, 'সন্ধ্যা চিন্তা' মিট্‌মিট্‌ করে।

যদি বলেন যে আপনি ওসব পড়তে চান না, তার উত্তর এই,—

"উপেক্ষার উপায় নাই, অবজ্ঞার সুযোগ নাই। জানিতেই হইবে, পড়িতেই হইবে, বুঝিতেই হইবে, অশ্রুবর্ষণ অনিবার্য্য! কে আছ ব্যথিতের বন্ধু, আর্ত্তের অবলম্বন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, —এসো, তোলো, জাগো, এ ক্রন্দন, এ নিবেদন, এ হা-হুতাশ শুনিতেই হইবে"—

উপরোক্ত বাক্যাবলী "পতিতা" নামক সামাজিক উপন্যাসের বিজ্ঞাপন হতে উদ্ধৃত। এ উদ্ধারের কারণ—"পতিতা" সম্বন্ধে যা সত্য, বিজ্ঞাপনের সাধ্বীভাষা সম্বন্ধেও ঠিক তাই সত্য। আমি এ স্থলে উক্ত ভাষার কোনও বিশেষ নমুনা তুলে দিতে পারছি নে, কেননা আপা-গোড়া বিজ্ঞাপন ঐ একই ভাষায় লিখিত,—পড়া শেষ করবার আগে বিজ্ঞাপিত বস্তু ওষুধ কি জুতো, শাড়ী কি সাহিত্য, কিছুতেই ধরা যায় না। আমি দুটি একটি উদাহরণ দিচ্ছি:—

"রৌপ্যমণ্ডিত রেশ্‌মী কিংখাপে মোড়া হইয়া অতুলন স্বর্ণ সংস্করণ।"

এই বস্তুটি কি জানেন?—শাড়ী নয়, উপন্যাস। তারপর বলুন ত বক্ষ্যমান পদার্থটি কি?

"অতি মোলায়েম রঙিন রেশমের ক্রেপ পোতের ডুরেদার চাকচিক্যমান।"

এ জিনিষটি কিন্তু অপূর্ব্ব উপন্যাস নয়, "আহামরি শাড়ী"; তাহলেও জিনিষটি পাওয়া যাবে কিন্তু বীণাপাণি দেবীর কাছে। সাহিত্যের

গৌরব অবশ্য নির্ভর করে তার অলঙ্কারের উপর, আর অলঙ্কারের সেরা হচ্ছে উপমা আর অনুপ্রাস। এ দুই বিষয়েও বিজ্ঞাপনের কৃতিত্ব অপূর্ব্ব। প্রথমে অনুপ্রাসের একটি নমুনা দিইঃ—

"মৃত্যুযবনিকা, পরিণয় প্রহেলিকা, ভ্রান্তি কুহেলিকা, হত্যা বিভীষিকা, লুব্ধমরীচিকা, রহস্য কণিকা।"—উক্ত সাহিত্যের রচয়িতা কে জানেন?—মল্লিদার! মল্লিদার কে জানেন?—"বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক নক্সা" লেখক। আপনি মল্লিদারের "আপন পর"খানি কিনে এনে নয়ন মন সার্থক করুন, কেননা বইখানি "উপহারের রাজা" কিন্তু "না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই"। দামও সস্তা—মূল্য এক টাকা মাত্র। এ ক্ষেত্রে "আপন পর" কি সূত্রে আবদ্ধ জানেন?—"বিলাত হইতে কেবলমাত্র আমাদের জন্য আনীত অপূর্ব্ব রেশমী ফিতায়"। উক্ত নমুনার অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখতে পাবেন। এখন উপমার গুটি দুই তিন উদাহরণ দিইঃ—

(১) মল্লিদারের "বিভ্রাট," পাকা হাতের পাকা লেখা—ঠিক যেন রসের ফোয়ারা।

(২) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের "পতিতা", নারীর ত্যাগের নায়েগ্রা প্রপাত"।

(৩) "বঙ্গীয় উপন্যাসলেখকশিরোমণি প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত, রেশমী কিংখাপে মোড়া "পাষাণী", বিরহের বিসুবিয়াস অথচ প্রেম প্রতিদানের এমন গোলকুণ্ডার মতির মালা,"—অথচ দাম একটাকা। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে উপমা হচ্ছে অলঙ্কারের শিরোমণি, যেমন গহনার ভিতর মালা আর কুটুম্বের

মধ্যে শালা। এ মত যে সত্য, উক্ত উপমাগুলির সাক্ষাৎ লাভ করে সে কথা কি আর কেউ সন্দেহ করতে পারেন ? উপরোক্ত কবি-প্রতিভার চরম সৃষ্টিগুলি সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু সাবধান!—শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের "পোকা মাকড়" যেন সেই সঙ্গে কিনবেন না, তাহলে দুদিনেই ও সব রেশমী বই কেটে রেশমী মিঠাই বানিয়ে দেবে।

(২)

আমি বিশেষ করে এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্যে যে, আপনি গত পাঁচ বৎসর এ সাহিত্যকে সবুজপত্রে স্থান দেন নি। আপনি বলতেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা, আর বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য মিথ্যা প্রচার করা। অতএব উভয়ের স্থান এক পত্রে হতে পারে না। আপনার কথা ছিল এই যে, বিজ্ঞাপনমাত্রেই মিথ্যাবাদী,—যেখানে তা স্পষ্ট মিথ্যে কথা বল্‌তে সঙ্কুচিত হয়, সেখানে তা suggestio falsii-র আশ্রয় গ্রহণ করে। ঔষধ সম্বন্ধে যাই হোক, সাহিত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে আপনি যে উক্তিকে suggestio falsii-র দোষে দোষী করতেন, সেটি যে একটি আলঙ্কারিক গুণ, অর্থাৎ তা যে অতিশয়োক্তি, এ জ্ঞান আপনার ছিল না। "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি", সে রচনা যে গৌড়ী রীতিতেই রচিত হওয়া কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সে রীতির একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

"অল্পং নির্ম্মিতমাকাশম্ নালোচ্যৈব বেধসা
ইদং এবংবিধং ভাবি ভবত্যা স্তনজৃম্ভনম্" ॥ (কাব্যাদর্শ)

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন এবম্বিধ মহাকবিত্ব করে গেছেন, তখন আমরাই বা কেন না বিরহের Vesuvius এবং ত্যাগের Niagara Falls-এর সৃষ্টি কর্‌ব? শাস্ত্রেই আছে:—

"বাপ্ কো বেটা সিপাহি কো ঘোড়া
কুছ্ নহি ত থোড়া থোড়া।"

এতদিনে আপনার ভুল আপনি যে বুঝতে পেরেছেন, সে কথা মুখে স্বীকার না কর্‌লেও কার্য্যত আপনি তার প্রমাণ দিচ্ছেন। 'সবুজপত্র' এখন বুকে পিঠে বিজ্ঞাপন নিয়ে বেরচ্ছে। তবে বইয়ের বিজ্ঞাপনের পাঁচরঙা ছাপ আপনার কাগজ আজও অঙ্গে ধারণ করে নি,—অবশ্য আপনার স্বরচিত পুস্তকের ছাড়া। এই সম্বন্ধেই আমি আপনার কাছে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। ঘুরিয়ে মিথ্যে কথা দু'রকম করে বলা যায়,—এক suggestio falsii-র সাহায্যে, আর এক suppressio verii-র সাহায্যে। 'সবুজপত্র' জন্মাবধি বাঙলা সাহিত্যের বিজ্ঞাপনকে প্রত্যাখ্যান করে, সত্যগোপনের দোষে দোষী হয়ে রয়েছে। এ যে কত বড় দোষ তার প্রমাণ, আমার মত মাত্র-সবুজপত্রের পাঠকেরা বাঙলা সাহিত্যে যে কত অমূল্য রত্ন আছে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অপরাপর মাসিক পত্রের কৃপায় জানতে পেলুম যে, বাঙলা ভাষায় এমন অসংখ্য কাব্য আছে, যার প্রতিখানি একসঙ্গে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়। আমি এর মধ্যে খানকতকের পরিচয় দিচ্ছি:—

(১) নিরুপমা পুরস্কার—"সরস ভাবোজ্জ্বল ভাষাসম্পদে অতুলনীয়, বাজারের কেনা গল্পপুস্তকে একত্র এমন সৌন্দর্য্যসমাবেশ কোথায়ও পাইবেন না।"—

(২) মঞ্জুরী—"সুরেন বাবুর ছোট গল্প না পড়িলে ছোট গল্প পড়া অসম্পূর্ণ থাকে। প্রত্যেকটি গল্প যেন রাফেলের জীবন্ত চিত্র"।—

(৩) পল্লী-সংসার—"বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ভাবে ভাষায় চরিত্র-চিত্রণে ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণে সর্ব্বাংশে অতুলনীয়।"

(৪) বন্দিনী—"ভাষায় ভাবে চরিত্রচিত্রে অতুলনীয়।"

(৫) দগ্ধকচু—"এমন অপূর্ব্ব উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যে আর কখন হয় নাই।"—

(৬) গৃহলক্ষ্মী—"বাঙলা উপন্যাসে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।"

(৭) অভিসার—"এমন বিয়োগান্ত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বহুকাল বাহির হয় নাই।"

আর কত নাম করব?—"মাতৃদেবী", "সহধর্ম্মিণী", "নববধূ" প্রভৃতি সবই অপূর্ব্ব, সবই অতুলনীয়, সবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিশ্বাস না করেন, এর মধ্যে অন্তত দুটি জাঁকড়ে কিনতে পারেন, যাচিয়ে নেবার জন্যে। বিজ্ঞাপনদাতা কথা দিয়েছেন যে "নববধূ মনোনীত না হইলে ফিরাইয়া আনিবেন, মূল্য ফেরত দিব"। "বন্দিনী" সম্বন্ধেও ঐ একই করার—"কিনুন, ভাল না হয় মূল্য ফেরত দিব"। এর চাইতে সাধু প্রস্তাব আর কি হতে পারে? অপরখানি সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতা আদেশ করেছেন—"সহধর্ম্মিণী ক্রয় করিতে ভুলিবেন না",—তবে ক্রেতার তা অপছন্দ হলে ফেরত নেবার কথাটা উহ্য রয়ে গিয়েছে।

বাঙলা ভাষার ঐশ্বর্য্য কিরকম বেড়ে গেছে, তার পরিচয় পেয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ত নানা সাহিত্যের পল্লবগ্রাহী। কি ইংলণ্ড, কি ফ্রান্স, কি ইতালি, ইউরোপের কোন দেশ দেখাকৃত এত অসংখ্য উপন্যাস, যা যুগপৎ 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' এবং 'অতুলনীয়'। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চাইলে তারা এক এক যুগের বড় জোর এক একখানি গ্রন্থ বার করতে পারবে।

এই বিজ্ঞাপন পাঠে প্রথমেই মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়—

"একি স্বপ্ন! একি মায়া! একি বাস্তব! একি বাস্তবের ছায়া?" কেননা, এই সব অপূর্ব্ব উপন্যাসের লেখকেরা কে?—এ প্রশ্নের উত্তর "উপন্যাস সিরিজ" দিয়েছেন। সিরিজের বক্তব্য এই ঃ—

"বাণীমন্দিরের একনিষ্ঠ পুজারীগণের বঙ্গবিশ্রুত সেই সকল সাহিত্যরথীবৃন্দের নামের একত্রীভূত তালিকা দৃষ্টে যুগপৎ বিস্ময়ে সকলকেই বলিতে হইবে—ইহারা করিয়াছে কি? ধন্য!"

"ইহারা করিয়াছে কি"? এ প্রশ্ন আমার মনেও উদয় হয়েছিল—এবং উত্তর পেয়ে আমিও বলছি—ধন্য। উত্তরটি তবে শ্রবণ করুন—

"বিশ্রামের অবসর নাই—কেবল কার্য্য,—সারাটি বৎসর ধরিয়া নিত্য-নব পূজার উদ্বোধন"।—এর পর আপনি আমি সকলেই বলতে বাধ্য—ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য বঙ্গ-সরস্বতী।

অতঃপর আর একটি প্রশ্ন এই মনে আসে যে, এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায়?—বিজ্ঞাপনের কথা বিশ্বাস করতে হলে—অতি নীচে, প্রায় লাষ্ট কেলাসে। তাঁর "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের মন্তব্য এই—"প্রকৃতপক্ষে ইহা বাঙ্গালীর রহস্যমুকুর, এরূপ উপন্যাস আর কখনও বাহির হয় নাই"।—মল্লিদারের "আপন-পরের" বিজ্ঞাপিত

গুণাগুণের সঙ্গে তুলনা করলেই আপনার বুঝতে বাকী থাকবে না যে "ঘরে বাইরের" স্থান কোথায়। এখন দেখছি ও উপন্যাসের বাইরে না বেরিয়ে ঘরে থাকাই উচিত ছিল। সে যাই হোক, এ বিষয়ে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নেই যে "বঙ্গ-বিশ্রুত সাহিত্যরথীবৃন্দের" পাশে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বেজায় অপ্রতিভ দেখাচ্ছে। এ স্থলে আমি একটা কথা না বলে থাকতে পারছি নে। সবাই জানে যে, চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই, অপরপক্ষে রাঁধুনে বামুনদের যে ও সার্টিফিকেটের দরকার আছে শুধু তাই নয়, সে সার্টিফিকেট তারা দেখাতে বাধ্য— নইলে কেউ তাদের পাক-স্পর্শ করবে না। এখন বিজ্ঞাপন দাতা-মহাশয়দের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই বৃদ্ধবয়সে নূতন করে পৈতা দেবার কি আর কোনও দরকার ছিল?

এ ক্ষেত্রে, আমার নিজের একটা জবাবদিহি আছে। আজ থেকে ঠিক সাত বৎসর আগে, পূজোর বিজ্ঞাপন পাঠে উত্তেজিত হয়ে আমি "মলাট সমালোচনা" নামক একটি প্রবন্ধ হাতঝেড়ে লিখি। সে প্রবন্ধ পড়ে পুস্তক-ক্রেতার দল শুনতে পাই খুসি হয়েছিলেন, কিন্তু বিক্রেতার দল বিরক্ত হয়েছিলেন।

আজ আমি বাঙলার লেখক পাঠক উভয় দলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, সেকালে আমি বিজ্ঞাপনসাহিত্যের মাহাত্ম্য মোটেই বুঝতে পারি নি; কিন্তু এ বিষয়ে আজ আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে।

দার্শনিকেরা বলেন যে বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, অতএব সাহিত্যের যুগ নয়। আমি এর প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ মানি—কিন্তু শেষ কথাটি ষোলআনা মানি নে। যদি কেউ বলেন যে বিজ্ঞানের

যুগে সেকেলে সাহিত্য চল্‌বে না, চলবে শুধু বিজ্ঞানজড়িত স , তাহলে আর কোনও আপত্তি থাকে না।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিশেষ করে জানা, কিন্তু কোনকিছু বিশেষ করে জেনে কোনই ফল নেই, যদি না সেই সঙ্গে তা' অপরকে বিশেষ করে জানানো যায়। এই উদ্দেশ্য সাধন করে বিজ্ঞাপন, কেননা ও শব্দের অর্থই হচ্ছে, বিশেষ করে জানানো। আমার এ যুক্তি যদি অকাট্য হয়, তাহলে সকলকে মানতেই হবে যে, এ যুগের উপযুক্ত সাহিত্য হচ্ছে বিজ্ঞাপনসাহিত্য। যাঁরা অন্যপ্রকার সাহিত্য রচনা করেন, তাঁরা যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন, অতএব তাঁদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

তারপর সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলেও দেখা যাবে যে, এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের স্থান কত উপরে। আজ শ'-খানেক বছর ধরে ইউরোপের সাহিত্যজগতে Classic আর Romantic দলের ভিতর একটা মহা লড়াই চলেছে। Classic দল বলেন সাহিত্যের উপকরণ হচ্ছে বাইরের সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে চোখে-দেখা ভাষা; আর Romantic দল বলেন সাহিত্যের উপকরণ হচ্ছে ভিতরকার সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে কানে-শোনা ভাষা। সংক্ষেপে Classic দল গ্রাহ্য করেন শুধু মাথার ভাব আর বইয়ের ভাষা; আর Romantic-দের কাছে গ্রাহ্য শুধু বুকের ব্যথা আর মুখের কথা। ইউরোপে এ দুয়ের আজও মিল হয় নি। কিন্তু বাঙলার বিজ্ঞাপনসাহিত্য এই দু-পক্ষের মিলনরূপ অসাধ্য সাধন করেছে। এ সাহিত্যের ভাষা যেমন খাঁটি সংস্কৃত—অর্থাৎ Classic, এর ভাবও তেমনি খাঁটি বাঙালী—অর্থাৎ Romantic। ব্রাহ্মণের ভাষায় এমন "রসের ফোয়ারা"

বাঙালী লেখক ছাড়া আর কে তুলতে পারে? খাঁটি বাঙালী মনোভাবটি কি জানেন?—সহৃদয়তা। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমাদের হৃদয়ে যে কতটা রসভার হয়েছে, তা কে না জানে? এই ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মাতৃভূমির প্রতি মাতৃভক্তি যে কি পর্য্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, তার জোর প্রমাণ ত আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রের সাবেগ ও সকাতর অম্বারব। সেই সঙ্গে দেবীর প্রতিও আমাদের মাতৃভক্তি যে সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে মাটিতে দেশ তৈরি, সেই মাটিতেই ত আমাদের দেবীও তৈরি। আমাদের দেবীভক্তি যে কতটা বেড়ে গেছে, তার প্রমাণ—সেকালে আমরা বিজয়ার দিন শুধু ভাঙ খেতেম, আর একালে আমরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেশসুদ্ধ লোক যে ঘটস্থাপনার দিন থেকে শুধু ভাঙ নয়, গাঁজাও খেতে সুরু করি—তার পরিচয় এই পূজোর বিজ্ঞাপন। ইতি—১লা আশ্বিন।

বীরবল।

পুঃ—এ পত্র আপনাকে ভয়ে ভয়ে পাঠাচ্ছি। আশা করি আমার উপর এ সন্দেহ করবেন না যে, আমি পুস্তকবিক্রেতাদের কাছে ঘুষ খেয়ে এই প্রবন্ধের ছলে বিনা পয়সায় তাঁদের বইয়ের বিজ্ঞাপন সবুজপত্রে প্রকাশ করবার ফন্দি করেছি। আমার উদ্দেশ্য আপনার মারফৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের এই সুসংবাদটি জানানো, যে text-book লেখবার উপযুক্ত ভাষা বিজ্ঞাপনদাতারা ইতিমধ্যে নির্ম্মাণ করে বসে আছেন কেননা—এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি যে, এর চাইতে একাধারে chaste এবং elegant ভাষা বঙ্গসাহিত্যে আর কোথায়ও খুঁজে পাবেন না।

ভারতের নারী।

—:*:—

কয়েক দিন হলো বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী 'ভারতের নারী' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে সে-সভায় লর্ড সিংহ বলেছিলেন—যতদিন রমণীদের প্রতি ভারতের পুরুষদের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন না হবে, ততদিন তার উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। যদিচ মন্তব্যটি আমাদের আত্মসম্মানের গায়ে আঘাত করে—তথাপি সেটি যে সত্য, সারবান এবং আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লর্ড সিংহ যে সাহস করে আমাদের জাতির একটা মহা কলঙ্কের দিকে সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তজ্জন্য মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদও দিয়েছিলাম। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, যিনি যে-ভাবে যে-ক্ষেত্রে যতই কেন চেষ্টা না করুন এবং আগ্‌ড়ুম বাগ্‌ড়ুম যাই কেন না বকুন—জাতিভেদ ও স্ত্রীজাতির পরাধীনতা—এ দুটি মহাব্যাধি যতদিন না আমাদের সমাজদেহ থেকে বিতাড়িত হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে জাতির বা জাতীয় উন্নতির কথা মুখে আনা বাচালতা মাত্র।

(২)

এখন দেখছি—মুর্খ আমরা, সব ভুল বুঝেছি। স্বদেশী-মন্ত্র প্রচারের আদি-গুরু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সেদিন বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বে তারস্বরে বক্তৃতা করে বলে গেছেন যে, লর্ড সিংহের উক্তির দ্বারা ভারতের নরনারীর প্রতি অযথা অবমাননা প্রকাশ করা হয়েছে, এবং যার কিছুমাত্র আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান আছে, তার পক্ষে এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানান উচিত। তিনি আরও বলেছেন, ইংরাজদের রমণীসম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা, তা sex-ভাব দ্বারা সীমাবদ্ধ; আর আমাদের সকল ধারণা মাতৃত্বের মহান্ ও পবিত্র কেন্দ্র হতে বিকশিত। তাঁর মতে ১৮৮২ সনে Married Woman's Act প্রবর্ত্তিত হবার পূর্ব্বে ইংরাজ-নারী নাকি chattel-এর সামিল ছিল; এবং লর্ড সিংহের এসব বিষয়ে, অর্থাৎ বিলাতের আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য তিনি তাঁর প্রতি দয়া প্রকাশ না করেও থাকতে পারেন নি। দয়ারই পাত্র বটে, কারণ দুর্ভাগ্য তাঁর—ঈদৃশ দেশ-হিতৈষীগণের তিনি স্বদেশবাসী!

(৩)

পোড়ো বাড়ীতে একটি শৃগাল ডেকে উঠলে, রাজ্যের যত শেয়ালের হুকাহুয়াস্বরে কণ্ঠকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করার আকাঙ্ক্ষা যেমন অকস্মাৎ জেগে উঠতে দেখা যায়—সেইপ্রকার পাল মহাশয়ের বক্তৃতার কম্পন থামতে না থামতেই 'অমৃতবাজার' প্রমুখ তাঁর শিষ্য ও

ভক্তবৃন্দের চীৎকারে আকাশ বাতাস পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে। এবং পাল মহাশয় "যেমন আশা দিয়ে গেছেন—তাতে বিলাত-বাসীদের কর্ণকুহরও যে শীঘ্রই তাঁর কণ্ঠ-সঙ্গীতের দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে, তারও সন্দেহ নেই"।

এখন কথা হচ্ছে আমরা জনসাধারণ—অর্থাৎ যারা রাজনীতি বা সমাজসংস্কার দুটির কোনটিকেই জীবনযাপনের ব্যবসা করে তুলতে পারি নি, সুতরাং এসব বিষয়কে তেমন অনাবশ্যক জটিলতার জালে আবৃত করে দেখবার অভ্যাস করি নি—আমরা কোন্ পথে যাব? নারী সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ মহান্ ও সর্ব্বোচ্চ; তাদের অবস্থার কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নেই; কোন পাশ্চাত্য ভাবের সংযোগে তাদের জীবনকে উদ্বেলিত করার দরকার নেই; এবং পূর্ব্বাপর যেমন পুরুষের সঙ্গিনী অপেক্ষা তাদের দাসীস্বরূপেই তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে অশিক্ষিতা বন্দিনী অবস্থায় তারা জীবন যাপন করে আসছে, সেইভাবেই তাদের রাখবার চেষ্টা করা উচিত—পাল মশায়ের সাথে একযোগ হয়ে কি আমরা এইকথা প্রচার করে বেড়াব? না, লর্ড সিংহের মতে মত দিয়ে বলব—রমণীও পুরুষেরই ন্যায় স্বাধীন জীব; স্বাধীনভাবে তাকে বাড়তে দাও, শিক্ষা দাও; পুরুষ তার যে-সকল অধিকার জোর করে করতলগত করে রেখেছে, তা তাকে ছেড়ে দাও; অন্যত্র সুসভ্য দেশে যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে তারাও মানুষ হয়ে, জীবনযাত্রায় পুরুষের প্রকৃত সঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াক। এ স্থলে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, লর্ড সিংহের উক্তির সরল অর্থ এই যে, এ-দেশের পুরুষ, নারীর উন্নতি সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা, এবং অন্যান্য

দেশের স্ত্রীলোকেরা যে-ভাবে চলে' উন্নত হয়েছে, নিজ স্বার্থের দিকে চেয়ে আমরা তাদের সে পথে চলতে দিতে অনিচ্ছুক।

(৪)

পুরাকালে ভারতবর্ষে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল—সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবার কি প্রয়োজন আছে? বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য, সতীদাহ প্রথা, অবরোধ প্রথা প্রভৃতি ত আমরা উত্তরাধিকারীসত্ত্বে অতীতের কাছথেকেই পেয়েছি। এ-ছাড়া সেকালে নিয়োগ প্রথা, রাক্ষস বিবাহ (কন্যাহরণ), আসুর বিবাহ (কন্যাক্রয়) প্রভৃতি ত শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার ছিল। একালে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ত আসুর বিবাহ আজও বজায় রয়েছে। আর সতীদাহ যে অপ্রচলিত হয়ে গেছে, সে ত ইংরাজের আইনের তাড়নায়। আজ একশ' বৎসর পূর্ব্বে এ-হেন প্রথাকেও সমর্থন করবার জন্য কখনো লোকের অভাব হয় নি, এবং বর্ত্তমান কালেও অশিক্ষিতা সহায়শূন্য বালবিধবা স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কায় বা মৃত্যুর পর উদ্বন্ধনে বা বস্ত্রে অগ্নিসংযোগের দ্বারা প্রাণত্যাগ করলে স্বামীর প্রতি হিন্দুনারীর জন্মগত প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে সাময়িক সংবাদপত্রে যে প্রশংসা উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, তাতে মনে হয় যদি ইংরাজরাজ ধর্ম্মের অঙ্গ বলে সতীদাহের প্রতি নিরপেক্ষতার ভাব অবলম্বন করে বসে থাকতেন—তাহলে এখনো এ প্রথা সজোরে প্রচলিত থাকত, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশী বক্তাদের বিলেত গিয়ে এরও মাহাত্ম্য প্রচারের কোন বাধা থাকত না।

(৫)

বাবু বিপিনচন্দ্র ১৮৮২ সালের পূর্ব্বে ইংরাজ রমণীগণের দুরবস্থার বিষয় বলেছেন ; কিন্তু এদেশে স্ত্রীলোকদের সম্পত্তি অর্জ্জন ও দান করবার অধিকার সম্বন্ধে যাঁরা একটু বিশেষ ভাবে চর্চ্চা করেছেন—তাঁরা জানেন, কি দুরবস্থা তাদের। প্রথমত, অশিক্ষিত অবস্থায় আজীবন গৃহে আবদ্ধ থাকার দরুণ, কোনও প্রকারে জীবিকা অর্জ্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। বাল্যকাল হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তারা পরমুখাপেক্ষী। এক সামান্য স্ত্রীধন লক্ষে একজনের কপালে জুটে ওঠে কিনা সন্দেহ, এবং তাও যদি যৌতুকস্বরূপ বিবাহকালীন দানে পাওয়া গিয়ে থাকে—তাতেই কেবল আছে তাদের দান বিক্রয়ের অধিকার। তা ব্যতীত প্রায় কোনও সম্পত্তিতেই তাদের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব আছে বলা যেতে পারে না। যতদিন স্বামী বর্ত্তমান, স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী ; তার অবর্ত্তমানে সে দুর্ম্মুখ আত্মীয় বা পুত্রের মুখাপেক্ষী—আপন বলতে তার কোনও সম্পত্তিই নেই। একেও কি আদর্শ সুখের অবস্থা বলতে হবে ?

পূর্ব্ববর্ণিত বিধিব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে—নিতান্ত স্বার্থান্ধ এবং 'শুধু পুরুষের সুখের জন্যই জগৎ সৃষ্ট' এই মন্ত্রের উপাসক-ব্যতীত কেউ কি বলতে সাহসী হবে যে, ভারতে রমণীর প্রতি পূর্ব্বাপর সদ্ব্যবহার হয়ে আসছে ?—মাতৃত্বের মহান ভাবকে কেন্দ্র করে যে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকারের ভাব সকল সমাজে বিকশিত হয়েছে—তারই বা প্রমাণ কোথায় ? মোট কথা, নারীর অধিকার বলে একটা জিনিস আমাদের সমাজে স্থান পায় নি বল্লেও অত্যুক্তি হবে না।

অন্যত্রও যেমন, ভারতেও তেমন—মানুষ নিজের স্বার্থের দিক থেকেই

রমণীকে দেখেছে। রমণী যে chattel সদৃশ ক্রয় বিক্রয় ও অর্জ্জন করবার জিনিস—এ ভাব কি ভারতে, কি রোমে, কি গ্রীসে, কি অন্যত্র প্রত্যেক সমাজেরই আদিম অবস্থায় যে বিরাজ করত - ইতিহাসে তার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। মানুষ মেরুদণ্ডবিশিষ্ট (Vertebrate) প্রাণীশ্রেণীর অন্তর্গত—পশুপক্ষী যে-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা এসব বিষয়ে পর্য্যালোচনা করেছেন, তাঁরা একমত যে, আদিম অবস্থায় পুরুষ ও রমণীর মিলন-বিষয়ে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তবে সমাজের উন্নতির সঙ্গে এবং প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি ভাবের ক্রম-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মানব ও ইতর প্রাণী সমাজের ভিতর নানা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। প্রাচীন সমাজসকলের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে, কি ভারতে, কি অন্যত্র, বিপিন বাবু যাকে Sex ভাব বলেন—অর্থাৎ পুরুষ ও রমণীর মিলনের ভাব, তা হতেই কালক্রমে পরিবার পরিজন সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভাবসমূহ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এক-স্ত্রীগ্রহণ সভ্য সমাজের একটি বিশিষ্ট প্রথা কিন্তু এ প্রথা যে আমাদের দেশে এখনও তেমন বদ্ধমূল হতে পারে নি,—বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং কৌলিন্য প্রথার অস্তিত্বই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, কালক্রমে ভারতীয় সমাজে মাতৃত্বের ভাবটি যেমন ফুটে উঠেছে—এমন বোধহয় কোনও সমাজেই হয় নি। সর্ব্বত্রই মা ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু ভারতে তিনি শুধু তা নন,—তিনি প্রত্যক্ষ দেবী, ভগবতী; তিনি এবং পিতৃদেব প্রীত হলেই সর্ব্বদেবতা প্রীত হন। এই মাতৃত্বের ভাবটি কালে এমন ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে এখন নারীমাত্রেই ভারত-বাসীর চক্ষে মাতাবিশেষ। স্ত্রী আমাদের ধর্ম্মপত্নী—ধর্ম্মকার্য্যে

সঙ্গিনী। মনুতে লিখিত আছে, যে-গৃহে স্ত্রী যথোপযুক্তরূপে পূজিত না হয়ে থাকে, সেখান হতে লক্ষ্মী পলায়ন করেন—স্ত্রী শ্রীরই রূপান্তর। এইসবের দিকে দৃষ্টি করেই মনকে আমরা বোঝাচ্ছি যে, নারীর প্রতি ব্যবহারে আমরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা হৃদয়ের উদারতা দেখিয়ে আসছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই? মাকে আমরা বিশেষ একটু ভক্তি করি বলেই, এবং 'পর-স্ত্রীষু মাতৃবৎ' ইত্যাদি শ্লোক নীতি-শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে বলেই যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আমরা উদারমনা—প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ ও দেশহিতৈষী কে সে কথা বলবে? মাকে ইউরোপীয়গণও কি ভক্তি করে না?—ইংরাজরা সাধারণত রমণীদের প্রতি গৃহে ও রাস্তাঘাটে যাদৃশ সম্মান দেখিয়ে থাকে, তার দিকে দৃষ্টি করে অনেকসময়ই কি আমাদের নিজ বিপরীত ব্যবহারের দিকে চেয়ে হেঁট-মুখ হয়ে থাকতে হয় না?

শাস্ত্রলিখিত শিক্ষা বিনাযুক্তি ও বিনা আপত্তিতে গ্রহণের ফলে এ দেশের রমণীদের অবস্থা কি শোচনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে! নেই বলতে কিছুই নেই তাদের। অর্থোপার্জ্জনের কোন সুযোগ নেই স্বাধীনতা নেই; এবং আজীবন রুদ্ধবায়ু-গৃহে বাসহেতু স্বাস্থ্য সামর্থ্যেরও অভাব। এক সতীত্বরূপ ডেমক্লেসের তলোয়াল সব সময়েই মাথার উপর ঝুলছে, যার দিকে চেয়ে চলতে ফিরতে তারা সর্ব্বক্ষণ সন্ত্রস্ত।

যা প্রাচীন তাকে প্রশংসা করাই এখনও সর্ব্বত্রই স্বদেশহিতৈষণার প্রকৃষ্ট পরিচয়, এবং যশোলাভের সহজ উপায়। তার উপর দুই এক জন ইংরাজ পুরুষ বা রমণী আমাদের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ করে বাহবা বলে' মাঝে মাঝে পিঠ চাপড়িয়ে দিচ্ছেন, আর আমরা

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মনে করছি—আমাদের যা ছিল বা যা আছে, এমন কারো ছিল না বা হবে না। পতিত বা পতনোন্মুখ জাতির সর্ব্বত্রই এ অবস্থা—অতীতের দিকে অত্যধিক দৃষ্টি। আমরা কিন্তু লর্ড সিংহের সঙ্গে এক মত হয়ে বলবো—যতদিন না রমণীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে, ততদিন ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, লম্ফঝম্ফ সবই নিষ্ফল। মা'র চরণে প্রণত হলেই তাঁর প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের পরাকাষ্ঠা হল, তা' আমরা মনে করি নে। পরিচ্ছদ ও গহনায় ভূষিত করলেই স্ত্রীর প্রতি সম্যক আদর দেখানো হয় না। এ সব হচ্ছে পুতুল-খেলা দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা। তাদের প্রকৃত মানুষ হবার জন্য আমরা কি করছি? লজ্জার ক্ষোভের বিষয় নয় কি—আমাদের স্বার্থ-যজ্ঞে তাদের শক্তি, বুদ্ধি, সুখ, মনুষ্যত্ব, আগাগোড়া ভস্মীভূত হয়ে আসছে? বনের পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা এবং মানুষের ভিতর পুরুষ—স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে সকলেরই জীবন পূর্ণশ্রী লাভ করে, শুধু ভারতের নারীই নাকি শ্রীভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়। ভারতের পুরুষ! দেশ-শাসন ব্যাপারে সামান্য স্বাধীনতাটুকু লাভ করবার জন্য মাথা কুটে তুমি মরছ, ছটফট্ করে সাগরের ও-পারে যাচ্ছ আসছ;—কিন্তু নিজের ঘরের ভিতর তোমার আর এক মূর্ত্তি। সেখানে পূর্ণ আঁধারের ভিতর, অজ্ঞানতার ভিতর, তোমার মা, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নাকে আবদ্ধ রেখে স্বদেশ-সেবার তুমি প্রকৃষ্ট পরিচয় দিচ্ছ! স্বদেশ তোমারই কেবল, তাদের কিছু নয়? প্রকৃতিদত্ত গুণে যারা তোমার অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়, তাদের স্বাধীনতা না দিয়ে মানুষ হবে—বৃথা এ জল্পনা কল্পনা তোমার। অশিক্ষিত মা'র পুত্র তুমি—অশিক্ষিত স্ত্রীর স্বামী—ঘর তোমার অজ্ঞানতার আঁধার,—

কুসংস্কারের স্তূপ। এবং সেই কারণে তুমি নিজেও যে কুসংস্কারের জড়পিণ্ড। অতীতের দিক হতে মুখ ফেরাও; মনু যাজ্ঞবল্ক্য ভুলে জগতের সঙ্গে চল; তবেই তুমি বড় হবে—নচেৎ নয়। সকল সুসভ্য দেশেই, নানাবিধ কুসংস্কার জয় করে রমণীর অধিকার বিস্তার লাভ করছে—শুধু ভারতেই কি তারা চিরকালের জন্য পতিত হয়ে থেকে তার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে রাখবে?

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত।

২৫।৮।১৯

মেয়ের বাপ।

—:০:—

রাত প্রায় ১০টার সময় ট্রামে শ্যামবাজার থেকে ফিরছিলাম। রাস্তায় লোকচলাচল কমে এসেছিল—গাড়ীতেও ভিড় ছিল না। যত জোরে গাড়ী চলছিল তত জোরেই দখিণ হাওয়া মুখের উপর এসে লাগছিল। আরামে চোখ বুজে আসছিল।

হাতিবাগানের মোড়ে একটি ভদ্রলোক উঠে আমারই পাশে তাঁর পরিচিত একজনকে দেখে আলাপ আরম্ভ করে দিলেন।

—এই যে কিরণ বাবু! নমস্কার মশাই, কেমন আছেন?

—নমস্কার নবীন বাবু! তারপর আপনাদের খবর সব—

—ভাল আর কই? মেয়ের বিয়ের ঠিক আজও কোথাও করে উঠতে পারি নি, সেই ধান্ধায়ই ঘুরচি। আপনি ত কাজ জিতে নিয়েছেন মশাই।

—আপনাদের কল্যাণে কোনরকমে দু'হাত এক হয়ে গিয়েছে।

একটু থেমে নবীন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

—তা খরচপত্র কত হ'ল?

—সব সুদ্ধ আড়াই হাজারের উপরে বই নীচে নয়। মেয়ে জামাইকেই ত দু'হাজার দিতে হয়েছে।

—আঃ, তার কমে কি আর মেয়ের বিয়ে হয় এখনকার দিনে? সে যাহোক, নির্ভাবনা হয়েছেন আপনি, বেঁচেছেন, বুকের পাথর নেবে গিয়েছে।

খিন্নস্বরে কিরণ বাবু বল্‌লেন—তা আর নামল কই মশাই—

নবীনবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মেয়ে জামাই ভাল আছে ত?

—বেঁচে আছে বটে, কিন্তু ভাল নেই। পয়সাকড়ির যেখানে অনটন, সেখানে ভাল থাকা যায় কি?

—কেন আপনার জামাই ত B.A., আর শুনেছি চাকরি-বাকরিও করেন।

—তা করেন, কিন্তু—

—এত কিন্তু করলে চলবে কেন ভাই, চাকরি ছাড়া জমিদারী আর ক'জনের থাকে?

—কিন্তু বাড়ীটা ঘরটা ত থাকে।

—তা নেই না কি?

—সে না থাকারই মধ্যে। পুরোণো সরিকি বাড়ী একটু আছে, তাও দেনায় ডোবানো।

—বেহাই দেনা করে রেখে গিয়েছেন বুঝি?

—সে অনেক কথা ভাই, আর সে সব কথা আলোচনা করলে ত এখন কোন লাভ নেই।

—তা সত্যি। কিন্তু বিয়ের আগে এই দেনার বিষয় কিছু জানতে পারেন নি?

—তা পারলে কি আর এমন কাজ করি? দেখলাম ছেলেটি ভাল। পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি করেই বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌লাম। কে জানে তার ফলে এই হবে?

—না মশাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার মেয়ের বিয়ে ভালই হয়েছে। ছেলে ভাল দেখে দিয়েছেন ত—বাস্ আপনার কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন মেয়ের বরাৎ।

—কিন্তু তা বলে ত মন বোঝে না।

—কিন্তু এ রকম ভাবাও ঠিক নয়। আর তাও বলি, বিয়ে ত দিয়েছেন এই সে দিন, এরই মধ্যে জামাই কি মাতব্বর হয়ে উঠবে? এখন তার বয়সই বা কি?

—বয়স কম হয়নি—চুল-টুল পেকেছে দু'একটা।

—চুল পাকার কথা আর বলবেন না। আমার সম্বন্ধীর ছোট ছেলে—তার বয়স এই ১৫ কি বড়জোর ১৬ হবে, কিন্তু এরই মধ্যে তার মাথার অর্দ্ধেক চুল পেকে গিয়েছে।

তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য্য হই কি না দেখবার জন্যই বোধ হয় নবীন বাবু গল্প শেষ করে' একবার চকিতের মত আমার দিকে চাইলেন, এবং তখনই মুখ ফিরিয়ে একটু মুরুব্বিয়ানা করে কিরণ বাবুকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনার জামাইয়ের বয়স ২৫।২৬ হবে, কেমন?

—তার বেশি হবে। দ্বিতীয় পক্ষ কি না, বয়স একটু বেশিই হয়েছে, বোধ হয় বছর ত্রিশেক হবে।

—আঃ, ত্রিশ বছর আবার বয়স! কত লোকের যে ও বয়সে প্রথম বিয়েই হয় না। দ্বিতীয় পক্ষ যা বলচেন তা—

—সে ত আমি জেনেই দিইচি।

—ছেলে পিলে আছে কি সে পক্ষের?

—একটি মেয়ে আছে।

—তা সে জন্যই বা ভাবনা কি? মেয়ে—বিয়ে হলেই পরের ঘরে যাবে। ভাবনা হ'ত যদি একটা ছেলে থাকত।

—সে জন্যও আমি ভাবছি নে নবীন বাবু। আমি ভাবছি এই দিনকাল, তাতে সামান্য চাকরি করে' সে সংসারধর্ম্ম করবে কি করে? তার উপর দেনা যা আছে সে ত গোকুলে বাড়ছে।

—আপনি মিছিমিছি ভাবছেন এই দেনার জন্য। এ ত আপনার ভাববারই নয়, তার উপর দেখুন, দেনা নেই কার? রাজা মহারাজারা পর্য্যন্ত দেনদার। শরীরটা ঈশ্বর ইচ্ছায় ভাল থাকলে, ছেলেমানুষ ও-দেনা শোধ দিতে ওর ক'দিন লাগবে?

—তাই শরীরটাই কি ছাই ভাল? অম্বলের অসুখ ত লেগেই—

—অম্বল ত আমরা অসুখের মধ্যেই ধরি নে, মশাই। অম্বল নেই কার? ঠক্ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে—কি বলেন মশাই আপনি?—বলিয়া মধ্যস্থ মানার ভাবে ভদ্রলোক আমার দিকে চাইলেন। কোন উত্তর না করে আমি শুধু বিজ্ঞের মত হাসতে লাগলাম। সেই হাসির ইঙ্গিত অনুমান করে প্রসন্নমনে ভদ্রলোক তখনই কিরণ বাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—জামাইরা আপনার ক' ভাই?

—ভাই-টাই আর কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে এক মামা, কিন্তু তার সঙ্গেও বনিবনাও নেই।

—আজকালকার ধরণই হয়েছে ঐ, নিজে নিজে থাকতে চায়, মামা কি বাবাকে পর্য্যন্ত কেয়ার করে না।

কিরণ বাবু চিন্তিত ভাবে বললেন—সেই সব দেখেশুনেই ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। তাই ত এখন ভাবি, সেই অত দেরীই

যখন হয়েছিল, আরও না হয় দু'মাস দেরী হত! মনের মত একটি ছেলেও পাওয়া গিয়েছিল—আজও তার বিয়ে হয় নি।

—আচ্ছা দেখুন কিরণ বাবু, সে সম্বন্ধটা আমায় করে দিতে পারেন?

—আপত্তি কি, সে ছেলে পছন্দ করবেন?

—কি যে বলেন আপনি? কানা খোঁড়া না হয়, এমন একটি পেলেই বাঁচি আমি, আর আপনি বলচেন কি না অমন ছেলে পছন্দ করব কি না?

—তা ছেলেটি ভাল, পছন্দ হওয়ার মত বটে। এদিকে পয়সা কড়িও চায় না তারা।

—দেখো ভাই কোন দোষ টোষ নেই ত লুকোন? এখনকার দিনে যে—

—দোষ থাকবে কোথায়? ছেলে দেখতে শুনতে ভাল—অবস্থার ত কথাই নেই—

—স্বভাব চরিত্র?

—বলছি যে তেমন ছেলে শতকরা একটা পাওয়া যায়। তামাকটি পর্য্যন্ত ছোঁয় না সে—

—চাকরি বাকরি করে ত?

—চাকরি করতে যাবে কেন? বাপ তার যা রেখে গিয়েছে, বুঝে চলতে পারলে তিন পুরুষ চাকরি কর্‌তে হবে না।

—বুঝে চল্‌তে পারবে ত?

—পারবে না? এই ত দু'বছর বাপ মরে' গিয়েছে, এরই মধ্যে কত আয় বাড়িয়েছে জানেন?

—আচ্ছা লেখাপড়া কতদূর করেছে?

—তা পাশ টাশ কিছু করে নি, তবে লেখাপড়া জানে। এখনো পড়াশুনো করে শুনেছি।

—বাঙলা নভেল নাটক পড়ে বোধ হয়।

—তা জানি নে, কিন্তু শুনেছি সেই উদ্যোগ করে একটা নূতন ইংরাজি স্কুল করিয়েছে দেশে।

—দেশে?—কোথায় সে?

—এই হুগলী জেলায়—

—ও হরি! কলকাতায় নয়?

—না, কলকাতায় নয়।

—ওঃ, সেই পাড়াগাঁয় ম্যালেরিয়ার মধ্যে—বাপ রে!—বলতে বলতে ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে ট্রাম থামাবার জন্য শিকল টানতে টানতে বললেন—মাপ করবেন কিরণ বাবু, কথায় কথায় বাড়ীর রাস্তা অনেক দূর ফেলে এসেছি দেখছি। অনুমতি হয়ত এইবার নামি—নমস্কার কিরণ বাবু, নমস্কার মশাই!—ভদ্রলোক নেমে পড়লেন। কিরণ বাবু অবাক হয়ে তাঁর পথের দিকে চেয়ে রইলেন—এতক্ষণের মুলতুবি হাসিটাও আমার মনের মধ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

মিলনাকাঙ্ক্ষা।

—:*:—

তোমারে বেসেছি ভাল—এই কথাটুক
ধ্বনিয়া উঠিছে মোর সুখে, বেদনায় ;
জন্মান্তের বাসনাটী প্রেম-সাধনায়
স্মৃতি রূপে জাগি' মোর জ্বলি' উঠে বুক।

তোমারে বেসেছি ভাল—তাই চাহি আজ
স্বপ্ন সাথে বাস্তবের নিবিড় মিলন,
অশরীরি শরীরির গাঢ় আলিঙ্গন—
নগ্নতার আবরণে ঢাকি দিয়া লাজ।

রূপেতে অরূপ পূজা—মিলন-দুয়ারে,
নব সৃষ্টি তরে দিব বলি আপনারে।

খোল দ্বার—আজি মোর সাধনার শেষ,
পূর্ণাহুতি দিব আজি সর্ব্ব ভয় লাজ।
দেবতা—পরাব তারে কামনার বেশ,
সৃজন-রহস্যে ঘেরা মন্দিরের মাঝ।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

বিরহাকাঙ্ক্ষা।

——:*:——

তোমারে বেসেছি ভাল—তাই জাগে ভয়,
মিলনের রজনীতে যদি বাহু ডোর
শ্লথ হ'য়ে খ'সে পড়ে কণ্ঠ হ'তে মোর,
অবসাদ-খিন্ন প্রেম পায় যদি লয়—

প্রণয়েতে করি তাই বিরহ আরোপ,
তৃপ্তি কেবা খুঁজি ফিরে অতৃপ্তির পুরে ?
মিলনের মূর্চ্ছনাতে কোন্ নব সুরে
আসন্ন বিরহভয় করি দিবে লোপ।

বিরহ-সাধনে চাহি করিবারে জয়
মিলনের অবসাদ, বিরহের ভয়।

তবে আসিও না আজ কমমূর্ত্তি ধরি',
দূরে রহি' বাঞ্ছিতেরে শুধু ভালবেসো ;
মিলনে ক্ষণিক তৃপ্তি,—দিবা বিভাবরী
অমূর্ত্ত রূপেতে তুমি কল্পনাতে এসো।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

সোহাগ।

—:০:—

কুরূপ কেন বলিস্ তোরা আমার খোকায় বল্ ?
রূপ ত তোরা চিনিস্ নারে নিন্দুকেরি দল।
রঙটি কালো, বয়েই গেল, ওই ত ভাল ঠিক,
কালো তোদের কৃষ্ণ কালী, ভ্রমর এবং পিক।
নাক্‌টি চাপা, শোন্‌রে ক্ষেপা, দেখেই দিগম্বর,
গরুড় পাখা আস্‌তে নারে, পলায় পেয়ে ডর।
শুনবি তোরা, নাইক কেন, ইহার চোখে টান ?—
টান কে দেবে, ধনুক ফেলে মদন পেলে প্রাণ।
কানটি নহে গৃধ্রসম, তাতেই যত দোষ,—
অমঙ্গল যে দেখলে পরে বাড়বে শিবের রোষ।
দন্ত নহে মুক্তাপাঁতি, তাতেই যত দায়,—
কুবেরকে দেয় মাণিক ফেলে, মুক্তা সে কি চায় ?
নয়কো কটি সিংহসম, তাই কি কভু হয় ?—
সিংহ তাহার চিরদিবস পায়ের তলে রয়।
সদাই কাঁদে, ক্ষণে ক্ষণে, করে নূতন ছল,—
জটায় শুধু ধরবে কেন মন্দাকিনীর জল !
বলচি আমি—যতই পারিস নিন্দা তোরা কর,
কর্‌ছে উমা তপস্যা ঘোর, কিন্‌তে এমন বর !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কবি

—:*:—

কিশোর-কবির তন্দ্রালস চোখের সামনে স্বপ্নদেবী তার প্রিয়ার রূপটীকে একটু একটু ক'রে ফুটিয়ে তুললে। তারপর পাপড়ি-খসা ফুলের মতো রূপটী শূন্যে মিলিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু একটী মাধুর্য্যের স্মৃতি—ঝরা ফুলের গন্ধটুকুরই মতো।

কবি জেগে উঠল। কল্পনাদেবী তখন তার কানে কানে ব'ললে—কবির তৃষিত হৃদয় সে স্নিগ্ধ করে দেবে—তার প্রেমে; কবির দৈন্য, লজ্জা, ভয় সে দূর ক'রে দেবে—তার ত্যাগে; কবির জীবন পূর্ণ ও সার্থক হ'য়ে উঠবে—একমাত্র তারই সঙ্গে মিলনে।

কবি সেই স্বপ্নলব্ধার সন্ধানে বেরুল—অরণ্যে নয়, পর্ব্বতে নয়, স্রোতস্বিনীর তীরেও নয়, নির্ঝরিণীর ধারেও নয়—তাকে খুঁজে ফিরতে লাগল—পৃথিবীর পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে, সমাজের বিলাস-ব্যসনের মধ্যে, শ্মশানের শোক-নীরবতার মধ্যে।

কিন্তু কোথাও তার দেখা মিল্‌ল না।

* * * *

এমনি ক'রে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। কবি কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনে প'ড়ল।

তার খোঁজার বিরাম ছিল না।

কত বরাননী কবির পথে এসে দাঁড়াত। ব'লত—আমিই তোমার সেই প্রিয়া।

সন্ধান-ক্লান্ত কবি মনে ভাবত—হয়ত বা এ-সেই। মুখে ব'লত—দেবি! আমার জীবন সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল।

দিনের পর দিন—হয়ত বা মাসের পর মাস কেটে যেত।

নারী একদিন ব'ল্‌ত—তৃষ্ণা মিটেছে কি?

কবি ব'ল্‌ত—না।

নারী ব'ল্‌ত—আমার মিটে গেছে। তুমি এইবার যাও।

কবি চ'লে যেত। তার ভাঙা বুকের চোয়ানো রক্তে গোলাপ লাল হয়ে উঠত; তার বিষন্ন মুখের করুণ হাসিতে জ্যোৎস্না ম্লান হ'য়ে আস্‌ত।

সমাজ গলা উঁচু ক'রে ব'ল্‌ত—ছিঃ ছিঃ!

কবি মাথা নীচু ক'রে ভাবত—তাইত!

* * * *

কবির যৌবনও ফুরোল, কবিও শয্যা গ্রহণ ক'রলে।

মৃত্যুদেবী শিয়রে এসে ব'স্‌ল।

কবি জিজ্ঞাসা ক'রলে—এইবার তাকে পাব ত?

মৃত্যুদেবী ব'ললে—এখনও নয়।

কবি ক্লান্তস্বরে ব'ললে—আর কতদিন তাকে খুঁজে ফিরতে হবে?

মৃত্যুদেবী শান্তস্বরে উত্তর ক'রলে—সৃষ্টি যতদিন।

কবির চোখ বুজে এল। তার শেষ নিঃশ্বাসটা সৃষ্টিরই মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

উন্মাদয়ন্তী জাতক।

(জাতকমালা হইতে অনূদিত)

—:*:—

"তীব্র দুঃখে অভিভূত হয়েও সাধুজন আপনার অটুট ধৈর্য্যবলে নীচমার্গের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হয়ে থাকেন"—লোকমুখে এইরূপ শোনা যায়। যথা:—

একসময় বোধিসত্ব শিবিদের রাজা ছিলেন। তাঁর মধ্যে সত্য, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণের আতিশয্য থাকায়, তিনি লোকহিত সাধনে চির উদ্যোগী ছিলেন। মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম ও বিনয়রূপী সেই রাজা সর্ব্বদা প্রজাবর্গের উপকারে প্রবৃত্ত থাকতেন।

প্রকৃতিপুঞ্জের চিতে দুষ্টভাব না আসিতে দিয়া,
গুণের গরিমাবশে হৃদয় তাদের বিকাশিয়া,
পিতা যথা তনয়েরে উভলোকে আনন্দিত করে,
সেইমত ক্ষিতিপতি পালিতেন প্রকৃতিনিকরে।

দণ্ডনীতি ছিল তাঁর চিরকাল ধর্ম্ম-অনুগামী,
পরিজন পরজন দুয়েরি সমান শুভকামী।
অধর্ম্মের পথ সদা আবরিয়া সকল প্রজার,
হইয়াছিলেন তিনি স্বর্গের সোপান সবাকার।

ধর্ম্মপালনেতে মাত্র লোকহিত ঘটে জানি মনে,
অনুরক্ত ছিলা তাই চিরকাল ধর্ম্ম-আচরণে।
সকলপ্রকারে সদা ধর্ম্মপথে করি বিচরণ—
অপরে লঙ্ঘিলে ইহা, কভু নাহি সহিত রাজন॥

সেই রাজার একজন পৌরজনের পরম রূপলাবণ্যবতী একটি কন্যা ছিল। তাকে দেখলে শ্রী, রতি, অথবা অপ্সরাগণের একজন বলে মনে হত। সবার মতেই, সে ছিল পরম দর্শনীয়া স্ত্রীরত্ন।

বীতরাগ জন ছাড়া, আঁখিপথে আর সবাকার,
অনুপম তনু সেই চকিতে পড়িলে একবার,
নয়ন অমনি সেই রূপের রসিতে বাঁধা পড়ে—
নড়িবে কি, শক্তি নাই তারাটি যে এক তিল নড়ে!

সেইজন্যে বান্ধবেরা তার নাম রাখলে উন্মাদয়ন্তী। তার বাপ একদিন রাজাকে গিয়ে জানালেন—"দেব! আপনার রাজ্যে একটি স্ত্রীরত্ন প্রাদুর্ভূতা হয়েছে, আপনি ইচ্ছামাত্রেই তাকে গ্রহণ বা বর্জ্জন করতে পারেন"।

রাজা স্ত্রী-লক্ষণবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আদেশ করলেন—"আপনারা গিয়ে দেখে আসুন মেয়েটি আমার গ্রহণযোগ্যা কি না"। মেয়ের বাপ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। বাড়ী গিয়ে তিনি উন্মাদয়ন্তীকে বল্লেন—"ভদ্রে, তুমি নিজ হাতে এঁদের পরিবেশন কর"। বাপের আদেশমত সে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করতে প্রবৃত্ত হল। তখন সেই ব্রাহ্মণদের—

চাহিয়া সেই বয়ান পানে নয়ান নিশ্চল !
মদনহত ধৈর্য্য সবে অবশ বিহ্বল।
মাতাল সম সংজ্ঞাহারা হইল একেবারে,
আপন আঁখি মনেরে তারা সম্বরিতে নারে !

খাওয়া ত দূরের কথা—ধীরস্থিরভাবে বসে থাকতে পর্য্যন্ত তাঁরা পারলেন না। তখন গৃহস্বামী মেয়েকে তাঁদের সুমুখ থেকে সরিয়ে দিয়ে, স্বহস্তে পরিবেশন করে তাঁদের খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করলেন।

পথে এসে ব্রাহ্মণেরা বিচার করতে লাগলেন—মেয়েটির রূপ ঠিক যেন প্রতিমার মতন, দেখ্‌বামাত্রই মোহিত হতে হয়। এক্ষেত্রে, পত্নীরূপে গ্রহণ করা ত দূরের কথা—একে দেখাও রাজার উচিত নয়। এর এই রূপচাতুর্য্য রাজার হৃদয় উন্মত্ত করে তুলবে, আর তিনি সেই রূপশোভায় মত্ত থেকে ধর্ম্মকার্য্য ও রাজকার্য্য সম্পাদনে শিথিলপ্রযত্ন হয়ে পড়বেন ; এইরূপে রাজকার্য্যসাধনে কালাতিক্রম হওয়ায়, প্রজার সুখোদয় ও হিতসাধনের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইহারে দরশ করিবামাত্র মুনিরও সাধনে বিঘ্ন হয়,
রাজা ত যুবক, সুখেরি সেবক, আগে হতে ভাবে মজিয়া রয়।

এইরূপ মনে মনে স্থির করে তাঁরা উপযুক্ত সময়ে রাজার সঙ্গে দেখা করে বল্‌লেন—"মহারাজ ! মেয়ে ত দেখে এসেছি। মেয়েটির রূপচাতুর্য্য যথেষ্টই আছে, কিন্তু তার অপলক্ষণও আছে ;—এবং সে লক্ষণের ফল হচ্চে, অপঘাত। সেইজন্যে মহারাজের তাঁকে চোখে দেখাও অবিধি—পত্নীত্বে গ্রহণ করা ত দূরের কথা।

যেমন করিয়া সমেঘা যামিনী চাঁদেরে লুকায়ে রেখে,
ধরা আকাশের শোভা শৃঙ্খলা একেবারে দেয় ঢেকে,
ঠিক সেইমত নিন্দিতা হয় রমণী যে দেয় নাশি
স্বামী ও শ্বশুর উভয় কুলেরি যশ ও বিভূতিরাশি।

এইসব শোনবার পর, "এই অলক্ষণে নারী আমার কুলের অনুরূপ হবে না" ভেবে রাজা তার প্রতি নিরভিলাষ হলেন।

এদিকে সেই গৃহস্থ, রাজা তাঁর মেয়ের প্রার্থী নন জেনে, অভি-পারগ নামক রাজারই একজন অমাত্যকে কন্যাসম্প্রদান করলেন। তারপর একদিন কৌমুদী-উৎসবের কাল আগত হলে, নিজ রাজ-ধানীতে উৎসবশোভা দেখবার জন্য রাজার মন উৎসুক হল,—চমৎকার একটা রথে আরোহণ করে তিনি নগরভ্রমণে বেরলেন। বেরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন—রাজপথসকল জলসেচনে সিক্ত ও সুমার্জিত হয়েছে, চারপাশের দোকানগুলি ধ্বজপতাকায় সুসজ্জিত হয়েছে, নিক্ষিপ্ত ফুলে পথের মাটি সাদা হয়ে গিয়েছে ; ফুলের মালা, মদিরা, ধূপ ও স্নানীয় অনুলেপনের (প্রভৃতির) গন্ধে বাতাস সুরভিত, হাস্যে লাস্যে-ও বাদিত্রের ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত, বিবিধ পণ্যরাশিতে ভরা প্রসারিত রাজপথ উজ্জ্বলবেশধারী পুষ্টদেহ তুষ্ট নাগরিকগণে আকীর্ণ হয়েছে। এই সব দেখতে দেখতে রাজা সেই অমাত্যের বাড়ীর সুমুখে এসে পড়লেন।

এদিকে অলক্ষণে বলে রাজা তাকে ত্যাগ করায়, উন্মাদয়ন্তীর মনে বেশ একটু রাগ ছিল। রাজদর্শনেই যেন একান্ত কুতূহলী—এই ভাব দেখিয়ে, আপনার রূপশোভা যাতে রাজার চোখে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে,

মেঘের শিখরে বিদ্যুতের মত হর্ম্যতল উদ্ভাসিত করে সে দাঁড়িয়ে ছিল,—আর মনে মনে ভাবছিল, আচ্ছা দেখি একবার এই অলক্ষণে-কে দেখে ইনি স্মৃতি ও ধৃতি অবিচলিত রেখে নিজেকে ধারণ করতে পারেন কি না। রাজা সেই বাড়ীটার শোভাসন্দর্শনে কুতূহলী হবামাত্রই সহসা তাঁর দৃষ্টির অভিমুখে স্থিতা উম্মাদয়ন্তীকে দেখলেন। তখন—

আপন অন্দরে নিতি সুন্দরীদলের
শরীরবিলাসে যাঁর তিরপিত আঁখি,
ধর্ম্মে চির অনুরাগী, ইন্দ্রিয়বলের
বিজয়ে নিরত যিনি, অনুদ্ধত থাকি;
সুবিপুল ধৃতিগুণ যাঁহার ভিতর,
পরযুবতীতে যাঁর নয়ন বিমুখ—
এ হেন রাজাও হয়ে মদনে কাতর,
অনিমেষ চোখে তারে নেহারে উৎসুক!

আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন—

এ বালা কি ঐ গৃহেরি দেবতা, অথবা জমাট চন্দ্রকর?
মানবী ত নহে, দেবী কি দানবী আসিয়াছে এই ধরণী 'পর?

তাকে দেখে অতৃপ্তনয়ন রাজা যখন এই ভাবে মনে মনে আলোচনা করছিলেন—তখন রাজরথ তাঁর মনোরথের একটুও অনু-কূল না হয়ে সে স্থান অতিক্রম করে চলে গেল। সেই রমণীর প্রতি একাগ্রমনা রাজা, শূন্যহৃদয়ে স্বভবনে উপনীত হয়ে, গোপনে সারথী সুনন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন—

"শ্বেত প্রাচীরেতে বেষ্টিত সেই গৃহটি কি তুমি চেন ?
কেবা সে, দাঁড়িয়েছিল যে শুভ্র মেঘেতে বিজলি হেন ?"

সারথী বল্‌লে—'দেব ! অভিপারগ নামে আপনার একটি অমাত্য আছেন, ওটি তাঁরই বাড়ী। আর যাঁকে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন তাঁরি স্ত্রী, কিরীটবৎসের মেয়ে। নাম উন্মাদয়ন্তী।' এই কথা শুনে তাকে পরস্ত্রী জেনে রাজার মন ব্যাকুল হল, চিন্তাভারে তাঁর চোখ নিমীলিত হয়ে পড়ল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তদর্পিতমনা রাজা আত্মগত হয়ে বল্‌তে লাগলেন—

মৃদু সুমধুর হাসিতে যে মোরে উন্মাদসম করেছে,
রম্য আখরনিকরে ভরিয়া যেইজন আহা গড়েছে
'উন্মাদয়ন্তী' এ নাম তাহার, করেছে যা হওয়া উচিত তাই,
পাগল যে জন করে, নাম তার কিছু আর নাহি খুঁজিয়া পাই।

পাশরিতে ইচ্ছা করি বটে,
হৃদয়ে দরশ তারি ঘটে !
অথবা আমার এই মন
তারি মাঝে রয়েছে মগন !
আবার কখনো মনে লয়—
এ মনের প্রভু সে নিশ্চয় !

পর-রমণীতে মম এত অধীরতা,—
উন্মাদ হয়েছি আমি হায় !
ঘুম ত গিয়েছে মোরে একেবারে ছেড়ে,
লজ্জাও কি ত্যেজিল আমায় ?

দেহের বিলাসে তার, হাসিভরা চাহনীর মাঝে,
অনুরাগে ভরা মম মন যবে বিরাজে নিশ্চল,
তখন অপর কাজে ডাকিতে কাঁসর যেই বাজে—
সে কাজের প্রতি মোর মন হয় বিদ্বেষ-বিকল।

এইরূপে মদবিচলিত-ধৈর্য্য হলেও রাজা তাঁর চিত্তকে ব্যবস্থিত করলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীর দিন দিন ক্ষীণ ও পাণ্ডু হতে লাগ্‌ল। চিন্তাকুলিত ভাব আর দীর্ঘশ্বাসত্যাগ প্রভৃতিতে তাঁর আকৃতিতে কামকাতরের ভাব ব্যক্ত হয়ে পড়ল।

যদিও,

মহান্ ধৈর্য্যের বলে আপনার মনের বিকার
গোপন করিলা নরবর,
চিন্তায় স্তিমিত আঁখি, শরীরের কৃশতায় তাঁর,
ব্যক্ত তাহা হইল সত্বর।

আকার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে লোকের মনের ভাব বুঝে নিতে রাজার সেই অমাত্য অভিপারগ ছিলেন খুব একজন নিপুণ ব্যক্তি। রাজাকে দেখে, কি যে তাঁর ঘটেছে তা অভিপারগের বুঝতে বাকী রৈল না। রাজার এ অবস্থা হবার কারণটি তাঁর বোধগম্য হওয়ায়, এতে রাজার অনিষ্ট ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর মন শঙ্কিত হ'ল; কারণ রাজাকে তিনি স্নেহ করতেন, এবং অতি বলশালী মদনের প্রভাবে মানুষকে যে কি হতে হয়, তাও তাঁর জানা ছিল। তারপর রাজাকে গোপনে কিছু জানাবার জন্যে তাঁর কাছে তিনি উপস্থিত হলেন, এবং রাজাকর্ত্তৃক কৃতাভ্যনুজ্ঞ হয়ে বলতে লাগলেন—

দেব আরাধনে, হে নরদেবতা, আজিকে যখন আছিনু রত,
অম্বুদ-আঁখি যক্ষ সে এক হইল আমার সমীপগত।
'কহিল আমারে, ওগো তুমি কেন দেখিছ না আঁখি মেলিয়া চাহি,
উন্মাদয়ন্তীপ্রতিনিবিষ্ট নৃপের হৃদয়ে শান্তি নাহি।

এই কথা বলে যক্ষ চকিতে হইল তিরোহিত,
সেই হতে, ওহে দেব, বিষাদ ঘিরেছে মোর চিত।
যাহা সে বলিয়া গেল, যদি প্রভু ঘটে থাকে তাই,
প্রসাদপ্রয়াসীজনে আজো তবে কেন বল নাই ?

অতএব আমাকে অনুগৃহীত করবার জন্যে উন্মাদয়ন্তীকে এখন আপনার গ্রহণ করা উচিত। তাঁর এই প্রস্তাবে রাজা লজ্জানতবদন হলেন। মদনবশগত হলেও চিরাভ্যস্ত ধর্ম্মবলে তিনি কখনো ধৈর্য্যচ্যুত হন নি। তিনি স্পষ্টাক্ষরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বল্‌লেন—না, তা হতে পারে না, কেন না :—

আমিত অমর নহি,—পুণ্য হতে হইব পতিত,
তারপর পাপ এই সবাকারই হইবে বিদিত।
আর, তার বিরহেতে হিয়া তব পুড়ে হবে ক্ষীণ,
জ্বলিয়া জ্বলিয়া যথা তৃণ হয় অনলে বিলীন !

উভয় লোকেরি ঘটে অহিতসাধন
যেহেতু, অবোধে শুধু করে হেন কাজ।
একমাত্র সেইহেতু ভ্রমে কদাচন
নাহি করে সেই কর্ম্ম পণ্ডিতসমাজ।

অভিপারগ বল্‌লেন—দেব! এতে আপনার ধর্ম্ম অতিক্রমের কোনই আশঙ্কা নেই, কেননা :—

আমি যে করিব দান, তাহাতে সাহায্য বিতরিয়া
ধর্ম্মলাভই হইবে তোমার,
না করি গ্রহণ তারে, বিঘ্ন মম দানে আচরিয়া
অধর্ম্মই হইবে সঞ্চার।

হে দেব! এতে আপনার কীর্ত্তির উপরোধকও আমি কিছু দেখছি নে।

আমি আর তুমি ছাড়া এ বিষয়
জানিবে না কভু অন্য কেও,
অতএব, জন-অপবাদ ভয়,
করিতে হবে না শঙ্কা সেও।

আর এ কার্য্যে আমাকে পীড়া দেওয়া ত হবেই না, অনুগৃহীতই করা হবে। কারণ—

প্রভুর স্বার্থচর্চ্চাজনিত তুষ্টিভরা যে চিত্ত,
আঘাত বেদনা কোথায় সেখানে রয়,
অতএব দেব, নিভৃতে কামের সুখভোগ কর নিত্য,
মোরে পীড়নের শঙ্কা সে কিছু নয়।

রাজা বল্‌লেন—ছিছি, এ পাপ কথা আর নয়!

সকল দানেতে ওগো ধর্ম্মের সাধন নাহি হয়,
মোর প্রতি অতি স্নেহে তুমি না ভাবিছ এ বিষয়।

আমার উপর যেবা অতিশয় স্নেহে
নাহি চায় পানে আপনার,
এ হেন পরম বন্ধু, এ হেন যে সখা,
তার প্রিয়া সখী যে আমার।

অতএব আমাকে এরূপ প্রতারণা করা আপনার উচিত নয়। আর এ বিষয় অপর কেউ জানবে না বলেই কি পাপ হবে না?

আদেখায় নিসেবিত বিষের সমান
গোপনে আচরি পাপ, কেবা সুখ পায়?
দেবতা ও যোগী, যারা নির্ম্মল-নয়ান,
তারা নাহি দেখে—হেন কি আছে ধরায়?

আরো দেখুন—

নহে সে যে তব প্রিয়া, হায়,
প্রত্যয় করিতে কেবা পারে!
ত্যেজি তারে তুমি বেদনায়
দহিবে না, বুঝাইবে কারে?

অভিপারগ বল্‌লেম—

দারাপুত্র সহকারে আমিত তোমারি দাস,
দেবতা আমার তুমি প্রভু
সেও ত তোমারি দাসী, অতএব ধর্ম্মনাশ
ইথে তব না হইবে কভু।

হে কামদ, দিছ তুমি মোরে বহু কামনার ধন,
আমার প্রিয়ারে আজি তোমারে করিব সমর্পণ।
ইহলোকে প্রিয় যাহা তাহাই করিয়া দান, নরে,
রমণীয় প্রিয় যাহা পরলোকে তাহা লাভ করে।

অতএব, হে দেব, আপনি তাকে গ্রহণ করুন।

রাজা বল্‌লেন—না, তা, হ'তে পারে না, কোনক্রমেই না। কেন?—

লেলিহান হুতাশনে মরিব পুড়িয়া,
অথবা মরিব খর তরবারি ঘায়,
যেবা শ্রী লভিনু চির ধর্ম্ম আচরিয়া,
শক্তি নাহি মোর করি পীড়ন তাহায়।

অভিপারগ বল্‌লেন—আমার ভার্য্যা বলেই দেব, যদি তার প্রতি-গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তার প্রতি সর্ব্বজনের অভিলাষের অবিরোধী বেশ্যাব্রতের আদেশ করব, তারপর তাকে আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা বল্‌লেন—আপনি কি পাগল হয়েছেন!

দণ্ড দিব, বিনা দোষে
ত্যজিলে কলত্রে।
ধিককৃত হইবে পুনঃ
হেথায়, পরত্রে।

অতএব এরূপ কার্য্যে আমাকে প্রবৃত্ত করতে বিরত হয়ে, যা ন্যায় তারই প্রতি অভিনিবেশ প্রদান করুন।

অভিপারগ বল্‌লেন—

স্বখের বিলোপ মম, জন অপবাদ, আর ধর্ম্মের অত্যয়,
তব সখ্য-সুখ-পাওয়া হৃদয়ে হবে না বোধ এই সমুদয়।
মহীতে মহেন্দ্র তুমি, দানের আহবে কোথা হেন হুতবহ?—
পুণ্যহেতু মোর, যথা ঋত্বিকে দক্ষিণা লয়, তারে তুমি লহ।

রাজা বল্‌লেন—অবশ্য আমার উপর অতি স্নেহবশতঃই আপনি নিজের হিতাহিত উপেক্ষা করে আমার স্বার্থ পরিচর্য্যায় উদ্যত হয়েছেন। বিশেষ করে এই জন্যেই আমি আপনার স্বার্থ উপেক্ষা করতে অক্ষম। তারপর, জনাপবাদের বিষয়েও নিঃশঙ্ক হওয়া যায় না। কেন যায় না, তা বল্‌ছি—

লোক-অপবাদে যারা আদর না করে,
নাহি ভাবে পরকাল, ধর্ম্ম উপেখিয়া,
বিশ্বাস থাকে না কারো তাহাদের 'পরে
অচিরে লক্ষ্মীও যান তাদের ত্যেজিয়া।

অতএব আপনাকে বলি—

ধরমের অতিক্রমে দোষ যাহা—সেত সুনিশ্চিত,
যেবা অভ্যুদয় তাহে, সে কেবলি সন্দেহজড়িত।
জীবনেরও লাগি যদি ধর্ম্মত্যাগে হয় প্রয়োজন,
তবুও তাহাতে যেন রুচি তব না হয় কখন।

কি আর বল্‌ব—

নিন্দা আদি দুখ মাঝে অপরেরে ফেলিয়া,
নিজ সুখে রত নাহি রহে সাধুজন,
পরে নাহি নিপীড়িয়া, ন্যায়পথে চলিয়া,
বেদনা আমার একা করিব বহন।

অভিপারগ বল্‌লেন—“প্রভুর উদ্দেশ্যে ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমি যে কাজ করছি, তাতে করে আমার পক্ষে, আর দেব, দীয়মানাকে প্রতিগ্রহণ করে আপনার পক্ষে অধর্ম্ম সঞ্চারের অবকাশ আমি ত কিছুই দেখছিনে—পরন্তু শিবিগণ, সামন্ত ও জানপদগণ সবাই ‘এতে অধর্ম্ম কোথায়’ এই কথাই বলবে। অতএব দেব, তাঁকে গ্রহণ করুন।

রাজা বল্‌লেন—“দেখুন, আমার স্বার্থচর্য্যায় আপনি অতিমাত্র আসক্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে বেশ ভাল করে একটু চিন্তা করে দেখুন। আর সামন্তগণ, জানপদবর্গ, শিবিগণ এবং আপনি আমি,—এদের মধ্যে ধর্ম্মবিত্তম কে?

অভিপারগ অমনি সসম্ভ্রমে রাজাকে বল্‌লেন—

শ্রুতিতে তোমার প্রভু অতি অধিকার,
বুধজনে সেবি (তব জ্ঞান যে অপার)।
অতি পাঠকারী তুমি করি বহু শ্রম,
ত্রিবর্গ বিত্তার তত্ত্বে বৃহস্পতি সম।

রাজা বল্লেন—তাই যদি হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনি আর আমাকে প্রত্যাখ্যিত করবেন না। কেন না—

নয়ের (স্বভাব) আর হিতাহিত যত,
হয়ে থাকে নৃপতির চরিতানুগত।
কীর্ত্তিমান যেই রাজা, প্রজা তারে পূজে,—
ন্যায়পথে রব আমি এই সব বুঝে।

সুপথ কুপথ কিছু না ভাবিয়া মনে
গাভী যথা বৃষভের অনুগামী হয়।
নৃপে অনুসরি তথা চলে প্রজাগণে
শুভ কি অশুভ কারো মনে নাহি লয়।

তারপর আপনি আরো দেখুন—

নিজেরে শাসনে রাখি—সে শকতি নাহি যদি হয়,
মোর হাতে মানুষের কি ঘটিবে কহন না যায়।

অতএব হয়ে চির প্রকৃতির হিতমোক্ষমান,
নিজেরও লাগিয়া চাহি ধর্ম্ম আর যশ সুবিমল,
প্রজার নেতা যে আমি, গাভীদলে বৃষভপ্রধান,
আমি কি লভিতে পারি বাসনার বশের কবল?

রাজার এই অবস্থা দর্শনে প্রসাদিতমন অভিপারগ অমনি রাজাকে প্রণাম করলেন, আর কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন—

কি ভাগ্যসম্পদশালী এ রাজ্যের প্রকৃতিনিকর,
পালনে নিরত তুমি যাহাদের, হে নরদেবতা!
বিসর্জ্জিয়া সুখসাধ, ধর্ম্ম-অনুগমনে তৎপর—
বনবাসী তাপসেও তোমা হেন সাধু মিলে কোথা!

'মহৎ' শব্দটি এই আজি মহারাজ,
তোমাতেই অর্থসহ করিছে বিরাজ।
অগুণীর যদি কেহ গুণগান করে
রূঢ় অতি ঠেকে তাহা আখরে আখরে।

মহৎ তোমার এই আচরণে আছে বল বিস্ময় কি আর,
সমুদ্র যেমন নানা রতনের, তুমি তথা গুণের আধার।

তাহলেই দেখা গেল তীব্রদুঃখে অভিভূত হয়েও সাধুজন আপন অটুট ধৈর্য্য আর সুঅভ্যস্ত ধর্ম্মের বলে নীচ মার্গের প্রতি উপেক্ষাপরায়ণ হয়ে থাকেন। অতএব ধৈর্য্য-ধর্ম্মের অভ্যাসের জন্য যোগসাধন কর্ত্তব্য। ইতি—

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

মহাদেব।

—:*:—

ভগীরথ-স্তুতিবাদে সুরধুনী যবে
বাহিরি' বৈকুণ্ঠ হ'তে বিশাল গর্জ্জনে
চলিল মহীর পানে—কাননে কাননে
মূর্চ্ছা গেল বিহঙ্গম পলকে, নীরবে
শুনি' সে গর্জ্জন; বনে বনে ফুকারিয়া
মৃগেন্দ্র শার্দ্দুল যত মার্জ্জারের মত
লুকাইল—হিমাদ্রির শৃঙ্গ শত শত
তুচ্ছ বালিরাশি যেন পড়িল খসিয়া।
হুঁ হু হু হু শব্দে ছুটি' আসে বেগবতী,
মাতা বসুন্ধরা শুনি' কাঁপে থর থর—
মহী বুঝি ধ্বংশ হয়—কাহার শকতি
ধরিবে সে ভীমস্রোতে?—তুমি গঙ্গাধর!
আপনার শির পাতি' সে কলুষ-হরা
ধরিয়া রক্ষিলে এই দীন বসুন্ধরা।

(২)

তোমারে ডাকে নি কেহ, সুরাসুরে যবে
দোঁহে মিলি আরম্ভিল সাগরমন্থন,
তোমারে ভুলিয়া কেহ চাহে নি, গরবে
যবে তারা করি' নিল অমৃত বণ্টন।
অবশেষে উঠি' এল তীব্র হলাহল!—
দেব যক্ষ রক্ষ নর কিন্নরের প্রাণ
গেল কাঁপি' মহাত্রাশে; পৃথ্বী কম্পমান,
স্বর্গ মর্ত্ত্য বুঝি আজি যায় রসাতল!
কোথা যাবে কি করিবে নাহি জানে কেহ—
দেব যক্ষ রক্ষ সবে শঙ্কিত বিহ্বল!
তুমি আসি' অবহেলে রক্ষিলে সকল,
পান করি কালকূটে; ত্রিদিবে অজেয়,
দেব মাঝে মহাদেব নীলকণ্ঠ তুমি,
অপ্রমেয়, অরিন্দম, জ্ঞানশক্তি-ভূমি!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নবীনের প্রতি।

—:❋:—
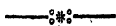
হে নবীন, হে তরুণ! পশ্চিম-অচলে
যেথা ধীরে ডুবিতেছে অস্তগামী রবি,
আঁখি সেথা বদ্ধ করি' বিষণ্ণ বিরলে
নাহি ফেল অশ্রুজল; নবারুণ-ছবি
উদয় অচলে যেথা বিশ্ব-মহাকবি
আঁকিয়া দিতেছে চির পুলক-হিল্লোলে
সেথা খোঁজ সত্য তব; প্রাণের কল্লোলে
যেথা যত উঠিতেছে লয় তান, সবি
বিশ্বকবি-গীত গান; মোরা তারি সুরে
পুষ্পসম ফুটি' উঠি' পলকে পুলকে
সোহাগে সুবাস টানি' দিগন্ত-আলোকে,
মূরছিয়া পড়ি পুনঃ অন্তরীক্ষ-পুরে;—
পশ্চিম-অচলে শ্রান্ত ঢলি' পড়ি' সুখে
আবার উদয়াচলে জাগি' হাসিমুখে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

———

নতুন রূপকথা।

—:০:—

এক যে ছিল রাজা। রাজার নাম জীবনগুপ্ত, রাজার রাজ্য শাকদ্বীপ, রাজার রাজধানীর নাম মনে নেই। রাজার ধনৈশ্বর্য্যের অন্ত নেই, লোকজনের ইয়ত্তা নেই। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দেউড়ীভরা দরোয়ান, বাগিচাভরা ফুল। রাজার সাত-মহলা পুরী পৃথিবীর বুক আঁকড়ে ধরে' আকাশ ফুঁড়ে একেবারে কোথায় উঁচু হ'য়ে উঠেছে—উপরে তাকিয়ে দেখলে দেখাই যায় না কোথায় তার চূড়া কোন্ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেছে। সাত-মহলা পুরী—তার মহলে মহলে দাস দাসী, মহলে মহলে চন্দন-কাঠের দরজা, মেহগনি কাঠের জানালা, দুধের মত সাদা শ্বেত পাথরের থামের উপরে উপরে আবীরের মত লাল রক্তপাথরের গম্বুজ—একেবারে কতদূর থেকে দেখা যায় যেন পলাশবনে পলাশ ফুটে আছে। সেই সব থামে থামে আবার কত কারু-কার্য্য, তার ইয়ত্তা নেই। কোথাও ময়ূর তার পেখম ফুলিয়ে রঙ্ বাহার খেলছে, কোথাও হাতী তার শুঁড় ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিংহ তার প্রকাণ্ড থাবা পেতে বসে আছে; বাঘ রাগে বসে' গর্ গর্ করছে—এমনি সব কত কত শ্বেতপাথরের থামে থামে খোদাই করা। দেয়ালে দেয়ালে কত চিত্র। কোথাও সীতার বনবাস, কোথাও পঞ্চবটী, কোথাও মায়ামৃগ, কোথাও অশোকবন—এমনি সব কত কত

চিত্র নিপুণ তুলিতে চিত্রিত হয়ে দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। গম্বুজের ছাদে ছাদে সব-প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শতদল আঁকা—তারই পাশে পাশে আবার কতরকমের পাখী লতা পাতা। সাত মহলে রাজার সাত রাণী। সাতরাণীর গলায় মুক্তোর মালা, নাকে হীরের ফুল, কানে পান্নার দুল; তাদের মাথাভরা চক্‌চকে মিশমিশে কালো রেশমী চুলে গজমোতির হার; হাতে সোনার কাঁকন রাণীদের গায়ের রঙের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেছে, আঙুলে আঙুলে লাল ডগ্‌ডগে চুণি-বসান আংটী; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত হীরে চুণি পান্না জহরতে সাত রাণীর রূপ একেবারে জ্বল্ জ্বল্ করছে। সাতমহলা পুরীতে সাত রাণীকে নিয়ে রাজা সুখে রাজ্য করেন।

রাজা প্রতি বৎসর বসন্ত এলে বনোৎসব করেন। যখন প্রথম ফাল্গুনের হাওয়ার মাঝের মদের গন্ধ শীতবুড়ির নাকে ঢোকে, তখন শীতবুড়িটা যেন কিসের স্মৃতিতে শিউরে ওঠে, কিসের বেদনায় জেগে ওঠে। তার পরণের সাদা থানের কাপড়ে ধীরে ধীরে সবুজের আমেজ লাগে, মুখের বুকের হাতের ঢিলে চামড়া সব নিটোল হ'য়ে আসে, চোখের শুক্‌নো চাউনি বিদ্যুৎভরা মেঘের মত হ'য়ে আসে—মাথায় কাশফুলের মত সাদা চুলের রাশ ভ্রমরের দলে ছেয়ে যায়—ফাটা পা দুটো কমলদলের মত হ'য়ে আসে, হাতের কাঠির মত আঙ্গুলগুলো চাঁপার কলি হ'য়ে জেগে ওঠে। তখন শীতবুড়িকে চেনে কার সাধ্য; তখন তার কালো চোখে বাঁকা চাউনি, পাকা ডালিমের কোয়ার মত লাল টুক্‌টুকে ঠোঁটের ফাঁকে যূথীর কলির মত দাঁত-দেখান হাল্‌কা হাসির রেখা, জরি-পেড়ে চুণি পান্নার বুটিদার গাঢ় সবুজ রঙের সাড়ীতে আর তার শরীর যেন ধরেই না;

সে সবুজ সাড়ীর চাইতেও যে সে অনেকখানি বেশি—এই কথাটা সে ভরা-বুক নিয়ে যেন জানিয়ে দিতে চায়। প্রতি ফাল্গুনে এমনি করেই শীতবুড়ির নবজন্ম হয়, আর রাজাও তাঁর সাত রাণীকে নিয়ে এমনি সময়েই বসন্তোৎসব করতে রাজধানী ছেড়ে চলে যান।

সেবার প্রথম ফাল্গুনের সঙ্গে সঙ্গে "ফাল্গুনী"র বাঁশী বেজে উঠল। বনে বনে গাছে গাছে পাতায় পাতায় পুলক লাগল। কোথা থেকে একটা ভূঁইচাঁপা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার কচি মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে আধ আধ কথায় গান সুরু করে' দিলে:—

"বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফির্‌ব না রে"।

কোথা থেকে একটা ছোট্ট চড়াই তার ছোট্ট বুক ফুলিয়ে গলায় গিটকিরি কেটে গান জুড়ে দিলে—

"আকাশ আমায় ভর্‌ল আলোয়
আকাশ আমি ভর্‌ব গানে"।

আমের মুকুলের গন্ধ ছোটার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি দলের ব্যস্ত ব্যাকুলতা জেগে উঠল, ঘন পাতার আড়াল থেকে স-তান কোকিল-ডেকে উঠল, বুল্‌বুল্ লতার গায়ে দোল খেতে খেতে পিউ পিউ করে' গলা সাধতে লাগল, দোয়েল ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে নতুন গোঁফ-ওঠা ছোক্‌রার মত শিষ দিতে লাগল, শালিখেরা পর্য্যন্ত হলদে ঠোঁট দিয়ে তাদের গিরিমাটির গা ঠোক্‌রাতে ঠোক্‌রাতে মহা আনন্দে তাদের বেসুরো গলায় কিচিরমিচির করতে লাগল। বনে

বনে লতা দুলল—পাতা কাঁপল—বাতাস ছুটল—চারদিকে মহাসাড়া পড়ে গেল। রাজা বললেন—"বসন্ত আগত, বনোৎসবের আয়োজন কর"।

রাজা বসন্তোৎসবে যাবেন। সাতমহলা পুরীর সাত মহল ডাক হাঁকে ভরে' উঠল। রাজপুরীর চার তোরণের নহবতে সানাইয়ের বুক চিরে ভৈরবী সুর ফুটে বেরল। কাড়া নাকাড়া দামামা মৃদঙ্গ রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী করতাল জয়ঢাক সব একসঙ্গে বেজে উঠল। ঘোড়াশালে লক্ষ ঘোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে চিঁ হিঁ হিঁ করে' তাদের আনন্দ জানাল, হাতীশালে হাজার হাতী তাদের শুঁড় আকাশে তুলে বিশাল নাদ করে' রাজার জয়ধ্বনি করে' উঠল। রাজা দুধের মত সাদা একটা ঘোড়ার উপরে সোয়ার হলেন; সাত মহল থেকে সাত রাণী বেরিয়ে এসে সাত দোলায় উঠলেন। রাজপুরীর বিশাল সিংহদ্বার খুলে গেল। রাজা সাদা ঘোড়ায় ঘোড়-সোয়ার হ'য়ে সাত দোলায় সাত রাণীকে নিয়ে সিংহদ্বার পথে বেরলেন—এমন সময় সেই সিংহদ্বার দিয়ে এক পরম সুন্দর পুরুষ প্রবেশ করে' রাজাকে অভিবাদন করে' দাঁড়াল।

—ওরে থামা থামা কে কোথায় আছিস! থামা সব কোলাহল, সব গীতবাদ্য, সব ডাক হাঁক, সব হাসি গান! ইঙ্গিতে সব থেমে গেল—কাড়া নাকাড়া দামামা মৃদঙ্গ রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী করতাল জয়ঢাক সব যেন যাদুমন্ত্রবলে নীরব হ'য়ে গেল। নহবতে নহবতে সানায়ের হৃদয়-গলান সুর কানে কানে রেশ রেখে মিশিয়ে গেল, তুরঙ্গ সব বাঁকান-ঘাড় সোজা করল, হাতীর দল শুঁড় আস্ফালন বন্ধ করল। বাহকেরা সাত রাণীর সাত দোলা কাঁধ থেকে

মাটিতে নামালে; রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। রাজার আর বনোৎসবে যাওয়া হ'ল না।

রাজা দেখলেন, পরম সুন্দর পুরুষ। দীর্ঘ শরীর, উন্নত শির, তেজভরা চোখ, স্বাস্থ্যভরা দেহ; গায়ের রঙ, সে যেন গলিত কাঞ্চন—গায়ের কোনখানে টিপি দিলে যেন আঙ্গুলের দু'পাশ দিয়ে রক্ত ছুটে বেরবে, এমন স্বাস্থ্য। মাথা মুখ মুণ্ডিত। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোন আবরণ নেই, কেবলমাত্র একটুকু কৌপীন। রাজা বিস্মিত হ'য়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—"মহাশয়! আপনি কে"?

আগন্তুক উত্তর দিলেন—"মহারাজ! আমি সন্ন্যাসী"।

রাজা বললেন—"মহাশয় অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন। সন্ন্যাসী কি? সন্ন্যাসী কে"?

সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ! সন্ন্যাসী সেই, যে সৎ অসৎ নাশ করে' নির্ব্বিকার হয়েছে। সেই পরম সত্য একই সত্য—সেই সত্য হচ্ছে ব্রহ্ম। এক ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা। মহারাজ, এই যে জগৎ দেখছেন, এ কেবল আমাদের মায়ার সৃষ্টি—আমাদের দৃষ্টির বিভ্রম"।

রাজা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন—"মহাত্মন! এ জগত সব মিথ্যা? এই যে সংসার, ঐ যে আকাশ, এই যে ঘোড়া, ঐ যে হাতী—সব মিথ্যা"?

—"স্বপ্ন, মহারাজ, স্বপ্ন, ছায়াবাজী। হাতী কি থেকে বলছেন? ঘোড়া কোন্‌টাকে দেখছেন? আপনার যদি দৃষ্টি থাকত তবে দেখতে পেতেন, ও হাতীও নয়; ঘোড়াও নয়—খালি "ইলেকট্রনের" পুঞ্জীভূত সমষ্টি।

সুন্দর ফুল, সুন্দরী নারী, সুস্বাদ সোম—কোথায় মহারাজ ?—আমি দেখছি কেবল ঈশ্বর। এই মিথ্যাকে চরম করে' মেনে পরম সত্য থেকে আমরা দূরে রয়েছি।”

রাজা এমন সব কথা কোনদিন শোনেন নি। তাই এ সব কথা শুনে উতলা হলেন। তারপর কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন—“মহাত্মন, ক্ষমা করবেন—আমার এখন সময় নেই—বসন্তোৎসবে বনে যেতে হবে। এ রাজ্যের এই রাজবংশের কোটি বছরের উৎসব এ—যা কোটি বছরের প্রত্যেক বছরটিতে সম্পাদিত হ'য়ে এসেছে। আমার পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, আবার তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন—আবার তাঁর পূর্ব্বে তাঁর পূর্ব্বে তাঁর পূর্ব্বে—এমনি লক্ষ রাজার উৎসবের স্মৃতি নিয়ে এই উৎসব গড়ে উঠেছে। এ উৎসব বন্ধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। মহাত্মন, রাজপুরীতে অবস্থান করুন। এক মাস পরে উৎসব থেকে ফিরে এসে আপনার কথা শুনব। রাজপুরীতে যখন যা প্রয়োজন হবে অনুজ্ঞা করবেন—তৎক্ষণাৎ তা পালিত হবে”।

সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—“মহারাজ, আমি সন্ন্যাসী—আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই। আপনি উৎসব থেকে ফিরে আসুন—আমি অপেক্ষা করব”।

সন্ন্যাসী বিদায় নিলেন।

—ওরে বাদ্যকরেরা থেমে রইলি কেন! তোরা সব বোকার মত সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন! বাজা বাজা—ঐ যে রাজা ঘোড়ায় উঠছেন—ঐ যে সাত রাণীর সাত দোলা বাহকেরা কাঁধে তুলে নিল—বাজা বাজা। চোখের এক পলক ফেলতে সোনার জীবন-

কাঠির স্পর্শে যেন সব জেগে উঠল—কাড়া নাকাড়া কাঁসি দামামা রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী মৃদঙ্গ করতাল জয়ঢাক—সব বেজে উঠল কাড়া নাকাড়া ক—র্‌র্‌র্‌ করে' উঠল, কাঁসি খন্‌ খন্‌ করে' উঠল, দামামা ডিম্‌ ডিম্‌ করে' উঠল, মৃদঙ্গ দম্‌ দম্‌ করে' উঠল, করতাল ঝম্‌ ঝম্‌ করে' উঠল, বেণু বীণা রবাব নানা মূর্চ্ছনা তুলল, জয়ঢাক ঢক্কা নিনাদ তুলল। লক্ষ ঘোড়া আবার ঘাড় বাঁকিয়ে মাটির গায়ে খুর ঠুকতে প্রাচির গায়ে লাগল, হাজার হাতী শুঁড় দুলিয়ে তাদের চাঞ্চল্য জানিয়ে দিল—রাজা সাদা ঘোড়ায় সোয়ার হ'য়ে সাত দোলাতে সাত রাণীকে নিয়ে বনোৎসবে যাত্রা করলেন। রাজা সঙ্গীসহচর নিয়ে সিংহদরজা দিয়ে প্রশস্ত রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন ;—রাজপুরীর চার তোরণে নহবতে নহবতে সানইয়ে সানাইয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে বসন্ত-বাহারে সুর উঠতে লাগল—

"গন্ধে উদাস হাওয়ার মত
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।"

রাজা বনে এলেন। রাজার পিছনে সাত দোলায় সাত রাণী, তার পিছনে লক্ষ ঘোড়া, তার পিছনে হাজার হাতী, তার পিছনে বাদ্যভাণ্ড দাসদাসী অনুচর নিয়ে রাজা বনে এলেন, বসন্তোৎসব করবার জন্যে।

বনের অপূর্ব্ব শোভা। বনের বুক একেবারে পুরে উঠেছে—তালে তমালে শালে শিমুলে আমে জামে বকুলে পারুলে অশোকে অশ্বত্থে একেবারে ভরে' উঠেছে। লক্ষ রকমের লক্ষ গাছ তাদের

ঘন পাতার চামর ঝুলিয়ে দিয়েছে ; কেবল সবুজ আর সবুজ আর সবুজ—চোখ-জুড়োন সবুজে সবুজে একেবারে চারদিক জড়িয়ে গেছে, ছাপিয়ে গেছে—সেই সবুজের বুকে বুকে আবার রঙের ঢেউ। সাদা লাল হলুদে গোলাপী বেগুনে নীল জরদ—একেবারে রঙে রঙে রঙ্‌বাহার। তারই মাঝে আবার মত্ত বাতাসের মাতামাতি, বাতাসে বনে নতুন করে' পরিচয়, নতুন করে' চিরদিনের প্রশ্নোত্তর। বাতাস ছুটতে ছুটতে একখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—ঘাড় বাঁকিয়ে প্রশ্ন বর্ষণ করতে থাকে—

কে গো তুমি ? আমি বকুল !
কে গো তুমি ? আমি পারুল !
তোমরা কেবা ? আমরা আমের মুকুল গো—

আবার সেখান থেকে ছুট্ দিয়ে আর একখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—আবার জিজ্ঞেস করতে লেগে যায়—

তুমি কে গো ? আমি শিমুল !
তুমি কে গো ? কামিনী-ফুল !
তোমরা কেবা ? আমরা নবীন পাতা গো—

আবার সেখান থেকে চট্ করে' ছুট্ দিয়ে কোন এক অশ্বত্থ গাছের আগডালে উঠে দোল খেতে খেতে গান ধরে' দেয়—

"এই কথাটাই ছিলেম ভুলে
মিল্‌ব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।'

"অশোকবনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে,
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।"

রাজা সন্ন্যাসীর কথা একেবারে ভুলে গেলেন। লক্ষ গাছের লক্ষ ডালে লক্ষ দোলনা চড়ল—মহানন্দে বনোৎসব আরম্ভ হল।

বনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিচয় ত আজকার নয়, একদিনের নয়; ও পরিচয় সেই আদিম কালেরও আগে হ'তে—সেই কাল, যে-কালে বনের মানুষ ছিল বন-মানুষ। বনের সবুজকে যখন মানুষ হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করে, তখন ত বন কেবল বনই নয়—বনের চাইতেও সে অনেকখানি বেশি। মানুষের হৃদয়ের রঙ যে তখন বনের সবুজকে উজ্জ্বল করে' তোলে। সে তখন নির্জ্জীব নয়, মূক নয়—তখন সে হাসে, খেলে, গান গায়। ওই গানই ত চাঁদনী রাতে হাল্‌কা হাতে আকাশের গায়ে জ্যোৎস্নার আলপনা টানতে টানতে বিদ্যুৎবরণ পরীরা বেণু বনে বনে শুনতে পায়—

"ওগো দখিণ হাওয়া, পথিক হাওয়া
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে!
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া,
পরশ-খানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,"

"আহা এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।"

ওই গানই ত অপ্সরীরা তারা-জাগা ঊষায় তাদের সারা নিশার অভিসার থেকে ফিরবার পথে ঘুমন্ত চোখে ফুলন্ত গাছে গাছে শুনতে পায়—

"ওগো নদী আপন বেগে
পাগল পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।"

ওই গানের সঙ্গে যখন মানুষও গান গাইতে শেখে তখন ত সে মৃত্যুকেই বড় বলে মানতে চায় না। কিন্তু যাক সে কথা!

এক মাস পরে রাজা বন থেকে বসন্তোৎসব শেষ করে' রাজধানীতে ফিরে এলেন। রাজপুরীতে এসেই মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন —"মন্ত্রী সন্ন্যাসী কোথায়? তাঁর কাছে আমায় নিয়ে চলুন।" মন্ত্রী রাজাকে সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে গেলেন।

রাজা সন্ন্যাসীকে দেখে একেবারে চমকে উঠলেন! এই সেই সন্ন্যাসী যাঁকে তিনি মাত্র এক মাস আগে দেখেছিলেন। কোথায় সে

নধর তনু—উন্নত শির তেজভরা চোখ, স্বাস্থ্যভরা দেহ, কাঞ্চনের মত বর্ণ? সে মুখে যেন কে কালি মেখে দিয়েছে—সে চোখে যেন কে কুজ্ঝটিকা ভরে' দিয়েছে—প্রশস্ত ললাটে চাম্‌ড়া কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছে—সারা শরীরটা একেবারে ঝুনো নারকেলের মত চিম্‌সে হ'য়ে উঠেছে। রাজা বিস্ময় প্রকাশ করে' সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করলেন—"মহাত্মন, আপনার একি পরিবর্ত্তন" ?

সন্ন্যাসী তাঁর অত্যন্ত শুষ্ক ঠোঁটে একটু হাসি এনে মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"মহারাজ, গত একমাস আমি অনাহারে আছি"।

ক্রোধে রাজার চোখ দুটো জ্বলে উঠল—শরীর থর্ থর্ করে' কেঁপে উঠল—বুকের উপর রত্নরাজি ঝক্ ঝক্ করে' জেগে উঠল—কোষের অসি ঝন্ ঝন্ করে' বেজে উঠল—রাজা মন্ত্রীর দিকে চোখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কঠোর কণ্ঠে বললেন—"এ কি ব্যাপার মন্ত্রী ? আমার যে রাজ্যে কোনদিন সামান্য একটি পিঁপড়ে পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকে না, সেই রাজ্যে রাজার অতিথি হয়ে রাজপুরীতে অবস্থান করে' একমাস কাল অনাহারে!—মন্ত্রী এর অর্থ কি" ? ক্রোধে রাজার বাক্ রুদ্ধ হয়ে এল, মুখে আর কথা সরল না।

মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর করলেন—"মহারাজ এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। কিন্তু মহারাজ, বনোৎসবে যাবার সময় এ দাস সন্ন্যাসীর নিজ মুখ থেকেই শুনেছিল যে তাঁর কিছুরই প্রয়োজন নেই—তাই এ দাস তাঁর আহারের কোন আয়োজন করে নি। সন্ন্যাসীও কোন অনুজ্ঞা করেন নি"।

রাজা সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে বললেন—"মহাত্মন, আপনার আহার্য্য কি" ?

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"মহারাজ, আমি যখন কুরুবর্ষের রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করছিলেম, তখন প্রতিদিন রাজভাণ্ডারী দশসের করে' দুধ আমার আশ্রমে রেখে যেত"।

রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মন্ত্রী, রাজগোশালায় শ্রেষ্ঠ যে গাভী তিনটি রয়েছে সেই গাভী তিনটি সন্ন্যাসীর সেবায় নিযুক্ত হোক"।

—"যে আজ্ঞা মহারাজ"।

রাজা সন্তপ্ত ও ব্যথিত অন্তঃকরণে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

(২)

প্রশস্ত রাজসভা। রাজা সভা করে' বসে' আছেন। রূপোর ঝালর লাগান চুনি পান্নার চুমকি বসান চন্দ্রাতপ—তারই নীচে সোনার ঝালর লাগান প্রশস্ত রাজছত্র—তারই নীচে সুবর্ণনির্ম্মিত রত্নখচিত রাজসিংহাসন। রাজসিংহাসনে রাজা—মাথায় তাঁর রাজ-মুকুট, হাতে তাঁর রাজদণ্ড। রাজমুকুটে কত কত মণি মরকত প্রবাল—তাদের বুকে বুকে আলো প্রবেশ করে' আবার ছুঁচের মত সূক্ষ্ম আর বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ হ'য়ে বেরিয়ে এসে চারদিকে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে। রাজাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘিরে কত কত পাত্র মিত্র অমাত্য সভাসদ্, কত কত বৈদেশিক রাজ-প্রতিনিধি। সভাসদ্‌দের উষ্ণীষের রত্নরাজিতে আলো প্রতিফলিত হ'য়ে সভামণ্ডপ চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করছে, দ্বারে দ্বারে সদ্যফোটা ফুলের মালা ঝোলানো, তারই মাঝে মাঝে আবার চোখ-জুড়োন আম্র-পল্লবের মঙ্গল ইঙ্গিত। রাজসভা স্তব্ধ নীরব—একটুকু কোনখানে নড়াচড়া নেই। এ যেন

সত্যিকার রাজসভা নয়—এরা যেন সত্যিকারের মানুষ নয়। এ-যেন একখানা নিপুণ তুলিতে পটে-আঁকা ছবি।

ধীরে ধীরে সভামণ্ডপের বাইরে মন্দিরার ঠিনি ঠিনি মিষ্টি শব্দ উঠল—তারপর তারই সঙ্গে সঙ্গে বৈতালিক-কণ্ঠে রাজার মঙ্গলাচরণ গীত উঠল। একবার, দু'বার তিনবার ফিরে ফিরে বৈতালিকেরা রাজার গুণগান করে' রাজার জয়ধ্বনি করে' উঠল, এমন সময়ে সভামণ্ডপের বৃহৎ দ্বার দিয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে উন্নত-শিরে সন্ন্যাসী রাজসভায় প্রবেশ করলেন।

চকিতে রাজসভা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। চক্ষের পলকে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়ালেন। রাজার পাশে রাজমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, অমাত্যেরা উঠে দাঁড়াল, পাত্র মিত্ররা উঠে দাঁড়াল, সভাসদেরা উঠে দাঁড়াল, বৈদেশিক রাজ-প্রতিনিধিরা উঠে দাঁড়াল। সন্ন্যাসী তাঁর আজানুলম্বিত অনাবৃত বাহু উত্তোলন করে' সবার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ বাণী উচ্চারণ করলেন। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এগিয়ে এসে সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করলেন, তাঁকে নিয়ে গিয়ে আপনার সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বের আসনে বসায়ে রাজা সিংহাসনে বসলেন, পাত্রমিত্র আমাত্য সবাই তখন নিজ নিজ আসন গ্রহণ করল।

তারপর রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী রাজ্যের কুশল ত" ?

—"মহারাজ——" মন্ত্রীর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। মন্ত্রীর কথা কেড়ে নিয়ে সন্ন্যাসী উত্তর করলেন—"মহারাজ কুশল কোথায় ? যেখানে রাতদিন ধরে' মিথ্যার পূজো চলছে—আগা থেকে গোড় পর্য্যন্ত অনৃতের লীলা চলছে—সেইখানে কুশল ? মরুভূমির তপ্ত

বালি নিঙড়িয়ে সলিল-বিন্দু মিলবে? বাসনার বহ্নির মাঝে স্নিগ্ধতার আশা? বিষবৃক্ষ কি চন্দন তরু হয়? পঙ্কে ডুবে কি রত্ন আহরণ করা যায়? মহারাজ কুশল নেই—অনৃতের ধ্বংস না করতে পারলে কুশল নেই"।

রাজসভা বিস্মিত হ'য়ে প্রায় রুদ্ধ-শ্বাসে সন্ন্যাসীর কথা শুনতে লাগল। কারো চোখে পলক পড়ল না। কে ইনি? মানুষ,—না স্বয়ং ভগবান মনুষ্যদেহ ধারণ করে' মর্ত্যে এসেছেন!

শুধু মন্ত্রী তাঁর মাথা-ভরা পাকা চুল হেলিয়ে স-সম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করে' বললেন—"মহাত্মন! আমি দার্শনিক নহি, সুতরাং যা আমি দর্শন করি তাকে অদৃশ্য বলে মানতে পারি নে। রাজকার্য্যে আমার চুল পেকে গেল, মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। মহাত্মন! সেই সাহসেই আজ আমি বলতে দ্বিধা করব না যে রাজ্যের কুশল"—তারপর রাজার দিকে ফিরে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—"মহারাজ রাজ্যের সর্ব্বত্র কুশল। রাজ্যে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়েছে, প্রজাদের ঘরে ঘরে প্রচুর অন্ন, রাজা জীবনগুপ্তের নামাঙ্কিত পতাকা উড়িয়ে বানিজ্যতরণীর বহর পৃথিবীর সপ্ত-সমুদ্রের তরঙ্গমালার পরিচয় নিচ্ছে, শিল্পকলার নব নব সৃষ্টিতে সমাজের মনের সৌন্দর্য্যের ও প্রাণের সজীবতার চিহ্ন ফুটে উঠছে, সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনায় সমাজ-জীবন সম্পদশালী উদার হ'য়ে উঠছে। মহারাজ! দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দময়। নরনারীর প্রাণের আনন্দে রাজ্যের আকাশ বাতাস আকুলিত। সেই আনন্দই ত উন্নত সৌধ-ঘেরা নগরীতে নগরীতে, পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীতে পল্লীতে পুলক ছড়িয়ে আনন্দ-আলয় গড়ে'

তুলেছে—সেই আনন্দের আলো লেগেই ত বৃক্ষবাটিকায় তরুশ্রেণী সতেজ হ'য়ে আকাশের পানে আপনাদের মাথা নির্ভয়ে তুলে দেয়, সেই আনন্দেই ত সহস্র কল্লোলিনী সহজ গতি-ভঙ্গিমায় পৃথিবীর বুক কেটে কেটে শ্যামল ক্ষেতে আপনার স্নেহরস অপর্য্যাপ্ত করে' বিলিয়ে সাগরাভিসারিকা। মহারাজ! রাজ্যের সর্ব্বত্র কুশল। রাজরাজেশ্বর জীবনগুপ্তের রাজ্যে সারা বর্ষ ধরে' বসন্তোৎসব চলছে"।

সন্ন্যাসী ব্যথিত কণ্ঠে বললেন—"মহারাজ, মহারাজ! আমরা কেবলই জাল বুন্‌ছি—ঊর্ণনাভের মত আমাদের অন্তর থেকে আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম সুতো বের করে' কেবলই স্বপ্নের জাল বুন্‌ছি। তারই উপরে আবার অজ্ঞানের তুলি চালিয়ে হাওয়ার মত অদৃশ্য রঙ দিয়ে আকাশ-কুসুম আঁকছি—এর শেষ কোথায় মহারাজ? কিসে এর সমাপ্তি মহারাজ? এর শেষ অমৃতে নয়—বিষে, আনন্দে নয়—হতাশায়, হাসিতে নয়—অশ্রুতে; মহারাজ! এর শেষ সংবাদ মৃত্যু। মহারাজ, ইলেকট্রনের মায়া ধ্বংস করতে' না পারলে অমৃতের সাক্ষাৎ মিলবে না"।

মন্ত্রী বিনীত কণ্ঠে বললেন—"মহাত্মন! এর শেষ সংবাদ মৃত্যু হোক্, কিন্তু সেই মৃত্যুকেই বড় করে' দেখব কেন? আমার বয়েস আশী পেরিয়ে গেছে, হয়ত' কাল মৃত্যু হবে। মৃত্যুর পরপারে কি আছে?—হয় অনন্ত জীবন, নয় বিরাট শূন্য; কিন্তু আমার ঐ আশী বৎসরের জীবনকে ছোট করে' এক মুহূর্ত্তের মৃত্যুকেই বড় করে' দেখব কেন? অনন্ত কালের কোলে আশী বছরও যে আমি ছিলেম এইটেই যে আমার গৌরব"।

সন্ন্যাসী মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠলেন—"কে

ছিল, কি ছিল মন্ত্রী?—ছিল শুধু স্বপ্নের বোনা সূক্ষ্ম জাল—ছিল শুধু আকাঙ্ক্ষার বোনা স্থূল জঞ্জাল—ছিল না, যা চরম ও পরম, যা অক্ষয় ও অব্যয়, যা অবিনশ্বর ও ঈশ্বর”—কথা বলতে বলতে সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দু'টি উৎসাহে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠল, তাঁর মুখমণ্ডল অনিন্দ্য সুন্দর জ্যোতিতে মণ্ডিত হয়ে গেল। আজানুলম্বিত দুই বাহু তুলে সমস্ত রাজসভার দিকে তাঁর মহদ্বোজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন—“বল একবার ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা”। তাঁর সে কণ্ঠস্বরে সভামণ্ডপের বিরাট কক্ষ গুম্ গুম্ করে' উঠল, দ্বারে দ্বারে সদ্য-ফোটা ফুলের মালা সব কেঁপে উঠল, রাজছত্রের সোনার ঝালর নড়ে উঠল, চন্দ্রাতপের চুনি পান্নার চুম্‌কি সব ছল্ ছল্ করে' উঠল, আর রাজমুকুটের মধ্যমণি মহামরকতটা যেন নিঃশব্দে একটুকু হেসে উঠ্‌ল, রাজসভার কেউ সন্ন্যাসীর জ্যোতির্মণ্ডিত মুখমণ্ডলের দিক থেকে আর চোখ ফিরাতে পারলে না—যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত সমস্ত রাজসভা সমস্বরে ধ্বনি করে' উঠল—“ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা”।

সন্ন্যাসী রাজ-সিংহাসনের দিকে ফিরে রাজাকে সম্বোধন করে' বললেন—“মহারাজ! আমি আপনার রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচার করতে চাই, অপনার প্রজাবৃন্দকে সত্যের পথে অমৃতের পথে অমরত্বের পথে নিয়ে যেতে চাই—অনুমতি দিন”।

রাজা মন্ত্রীকে সম্বোধন করে' বললেন—“মন্ত্রী, শিপ্রানদীর তীরে সন্ন্যাসীর জন্য বৃহৎ মঠ নির্ম্মিত হোক্। আর রাজকোষ থেকে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সন্ন্যাসীকে দক্ষিণা দেওয়া হোক্”।

পক্ককেশাবৃত মস্তক অবনত করে' মন্ত্রী বললেন—“যে আজ্ঞা মহারাজ”।

(৩)

শিপ্রা অশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। সারা দিনমানে তার অস্থির বুক রোদে চিক্‌মিক্—চাঁদনীরাতে তার তরল হৃদয় জ্যোছ্‌নায় ঝিক্‌ঝিক্, দিন নেই, রাত নেই, শিপ্রা কলকল ছল ছল করে' গান গেয়ে গেয়ে ব'য়ে চলেছে। স্তব্ধ দুপুর বেলা যখন তমাল-তালীর বনে বনে প্রাণ-উদাসকরা ঘুঘুর ডাক থেকে থেকে জেগে ওঠে, তখন সেই নিস্তব্ধতার মাঝে শিপ্রার দু'তীরের ঘন দেবদারু বনেরা তাদের মাথা হেলিয়ে শিপ্রাকে বুঝি জিজ্ঞেস করে—ওগো শিপ্রা, তুমি গান গেয়ে গেয়ে কোথায় চলেছ?—আর শিপ্রা তার উত্তর দেয়—

গান গাহিয়া চল্‌ছি আমি সেই দেশেতে যেথায় গো
আকাশ গায়ে সাগর শুয়ে ঊর্ম্মিমালায় খেলায় গো,
অসীম নভে অগাধ জল
করছে সদাই ছল ছল
চল্‌ছি আমি সেই দেশেতে গান গেয়ে মোর বীণায় গো।

চল্‌ছি আমি সেই দেশেতে দুল্‌তে সুনীল দোলাতে
চল্‌ছি আমি অন্তিমেতে পারব খেলায় ভুলাতে
আমার গীতি আমার গান,
স্নিগ্ধ করি হৃদয় প্রাণ
গগন তলে সিন্ধুবুকে পারব কোথায় মিলাতে।

চল্‌ছি আমি সেই সুনীলে যেথায় সবই পুলক গো
গভীর জলের শান্তশীতল অসীম নভের আলোক গো,
আলোক যেথায় পুলক যেথায়
শব্দ যত স্তব্ধ যেথায়
লব্ধ যেথায় গল্প গীতে এই নিখিলের চালক গো।

গান্‌টী আমায় শিখিয়েছে বিশ্বপতির করুণা
এই গানেতেই ধরিত্রী ও রাত্রি দিবস মগনা
সুরু গানে সাঙ্গ গানে
সৃজন লীলার রঙ্গ গানে
এই গানই গো সজ্জামহীর নইলে মহী নগনা।

ওই গানেতে উঠ্‌বে জাগি আছিস্‌ যারা ঘুমায়ে
মুক্তি বিহীন মর্ম্মহীনের ধর্ম্মখানি জড়ায়ে,
বদ্ধ হয়ে রুদ্ধ ঘরে
মলিন মুখে আঁখির 'পরে
অবিশ্বাসীর হাস্যটুকু দিবস যামি ছড়ায়ে।

উঠ্‌রে জাগি আলোর মাঝে জীবন পথের আনন্দে,
মর্ম্মতলের দেবতা সেই মোহন মধু সু-ছন্দে,
নৃত্যে তারি তালে তালে
হাস্যে তারি ছল ছলে,
উঠ্‌বে জাগি লাস্যে তারি বর্ণে গীতে গন্ধে।

উঠ্‌রে জাগি ঊষায় যখন রক্ত রবি কিরণে,
পৃথ্বী তলের দূর্ব্বারাশি জড়ায় হিরণ বরণে,
উঠ্‌রে জাগি ক্লান্ত সাঁঝে
'দিন্‌টী যখন রক্ত সাজে
অন্ধকারে ধরে যখন লুটায় মহীর চরণে।

উঠ্‌রে জাগি জীবন পথে উঠ্‌রে জাগি মরণে,
উঠ্‌রে জাগি মিলতে হবে বিশ্বপতির চরণে,
উঠ্‌রে জাগি—ছুট্‌তে হবে
উঠ্‌রে জাগি—লুটতে হবে
শিপ্রা যেমন রঙ্গে নাচি' লুটায় সাগর-চরণে।

এমনি করে' শিপ্রা ছুটে চলেছে—লক্ষ পল্লীকে ঘিরে ঘিরে, হাজার নগর নগরীকে বেড়ে বেড়ে নেচে নেচে দুলে দুলে ফুলে ফুলে ফেনা ছড়িয়ে ছড়িয়ে জঞ্জাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে অক্লান্ত গতিতে ব'য়ে ব'য়ে চলেছে—আপন প্রাণের স্নিগ্ধতা কোমলতা শীতলতা অপর্য্যাপ্ত স্নেহরস ধরিত্রীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এমনি করেই শিপ্রা সাগরাভিসারিকা। সেই শিপ্রারই তীরে এক বিরাট মঠ নির্ম্মিত হল—রাজ-আজ্ঞায়—সন্ন্যাসীর জন্য।

বর্ষা শেষ হ'য়ে গেল। শরতের সোনার রঙ জগত্ ভরে' ফুটে উঠল। সন্ন্যাসী তাঁর মঠে যাবার জন্যে রাজপুরী ত্যাগ করে' রাজপথে বেরুলেন। রাজপথে অগণ্য লোকের সারি চলেছে—রাজপথের পাশে পাশে অসংখ্য দোকানে বেচা কেনা চলছে। সন্ন্যাসীকে যে দেখল সেই মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইল। পথিক পথ ভুলে গেল—দোকানে

ক্রেতা বিক্রেতারা বেচা কেনা ভুলল—নাগরিকদের গৃহে গৃহে বন্ধ-জানালা সব খুলে গেল—তা দিয়ে অসংখ্য কুলাঙ্গনারা পলক হীন চোখে সন্ন্যাসীকে দেখতে লাগল। কত কিশোরী তাঁকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করল—কত প্রৌঢ়া বৃদ্ধা তাঁকে পুত্র বলে বাঞ্ছা করল—সন্ন্যাসীর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—তিনি সোজা চলেছেন আপনার গন্তব্য স্থানে। সবাই জিজ্ঞেস করে—কে ইনি? মানুষের মুখে মুখে কথার রঙ চড়ে। কেমন করে' রটে গেল যে কিছু দিন আগে স্বয়ং মহাদেব রাজাকে স্বপ্নে দেখা দেন—দেখা দিয়ে বলেন যে তিনি শীঘ্র মনুষ্য দেহ ধারণ করে' তার রাজ্যে উপস্থিত হবেন—এই সন্ন্যাসীই সেই মহাদেব। সন্ন্যাসী মঠে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে মঠের চারিদিক লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল—সেদিন দিন ফুরুতে না ফুরুতেই সন্ন্যাসী লক্ষ শিষ্য করলেন—মঠের চূড়া থেকে এক প্রকাণ্ড গৈরিক পতাকা উড়ল। বাতাসে সেই গৈরিক পতাকা সারা দিনমানে পত্ পত্ করে উড়ে উড়ে যেন বলতে লাগল—"মি—তথ্যা"—"মি—তথ্যা"।

সন্ন্যাসীর লক্ষ শিষ্য পঙ্গপালের মত সমস্ত শাকদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ল—ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে। ধনীর অট্টালিকায়, বণিকের বাণিজ্যালয়ে, গৃহস্থের গৃহে, দরিদ্রের কুটিরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা।" নগর নগরীর কোলাহলের মাঝে, শান্ত পল্লীর নীরবতার মাঝে, সবুজ বনের শ্যামলতার মাঝে কেবল ঐ রব ধ্বনিত হতে লাগল—"ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা।" শাকদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যেন গৈরিক হ'য়ে উঠল—রোদের রঙ্ যেন গৈরিক রেণুতে ভরে' উঠল—বাতাস যেন গৈরিক গন্ধে পূর্ণ

হয়ে গেল—নীল আকাশ যেন গৈরিক রাগিণীতে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"। ওরে কি আছে?—কিছুই নেই, আমি নেই, তুমি নেই, জগত নেই—কিছুই নেই। ওরে এসব কিসের জন্যে—এই পরিশ্রম, এই কর্ম্ম এই ভোগ? থামাও থামাও সব মূর্খের দল যদি মঙ্গল চাও। এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। দিনে দিনে মাস কাটল—মাসে মাসে বছর কাটল—বছরে বছরে কত বছর কেটে গেল—ধীরে ধীরে নর নারীর প্রাণের অস্থি শিথিল হ'য়ে এল—ক্রমে ক্রমে জীবনের অমৃত স্বাদহীন হ'য়ে উঠল—এ সৃষ্টির শব্দ গন্ধ রূপ রস অর্থহীন বোঝা হ'য়ে পড়ল—ধনীর ভোগসামর্থ্য লয় পেয়ে গেল—মানুষের কর্ম্মসামর্থ্যে বাজ পড়ল—বণিকের বাণিজ্যালয় বিশৃঙ্খলায় ভরে' উঠল—কৃষকের লাঙ্গলের মুটো ঢিলে হ'য়ে পড়ল। সবার মুখেই ঐ এক বাণী—জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। কত কত ধনীর অট্টালিকায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল—কত কত বণিকের বাণিজ্য তরণী বিনা ঝড়ে মারা পড়ল—কত কত গৃহস্থের বাসস্থান অমনি অমনি জ্বলে' উঠল—ক্ষেতে ক্ষেতে হালের বলদ অমনি অমনি মারা পড়ল। মানুষের অস্বীকারে সব অকৃতার্থ হ'য়ে উঠল। মন্ত্রী গিয়ে রাজসমীপে নিবেদন করলেন—"মহারাজ রাজ্যের ভীষণ অমঙ্গল উপস্থিত। দুর্ভিক্ষ আসন্ন।"

"দুর্ভিক্ষ আসন্ন? সে কি মন্ত্রী! দুর্ভিক্ষ আসন্ন! আমার রাজ্যে—যে রাজ্যে প্রতি বৎসর তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হয়—সেই রাজ্যে দুর্ভিক্ষ! মন্ত্রী, আপনার ভুল হ'য়ে থাকবে—আপনার অবসর গ্রহণের কাল উপস্থিত বুঝি।"

দুঃখের হাসি হেসে মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"আমার ভুল হয় নি—

আমি সত্য সংবাদই রাজ সমীপে নিবেদন করছি। রাজ্যে প্রকৃতই দুর্ভিক্ষ আসন্ন। দেশের নর নারীরা জীবনে আস্থা হারিয়েছে, জীবনের আনন্দকে তাড়িয়েছে। কৃষক আর তেমন উৎসাহে তেমন করে, লাঙ্গল ধরে না—তার লাঙ্গলের মুঠো শ্লথ হ'য়ে আসে, মাতা ধরিত্রীকে আর সে তেমন চোখে দেখে না, সে আজ তার কাছে প্রাণহীন অস্তিত্ব-হীন, এই অবজ্ঞার বিনিময়ে সে আগে যে শস্য পেত তার দশমাংশের এক অংশ পায়, বাণিজ্যের শিল্পের অবনতি ঘটেছে, বণিকের চোখে এ জগৎটা তার কারাগার, অসুখের জায়গা অমঙ্গলের স্থান, তার বাণিজ্য-তরণী আজি কেবল কাঠের ভেলা, তার মধ্যে মানুষের প্রাণ নেই মন নেই আনন্দ নেই। বণিকের প্রাণের পুলকে আজ সপ্তসিন্ধুর তরঙ্গমালা কল্ কল্ ছল্ ছল্ করে না, তাঁর জীবনের অবজ্ঞায় তার বিশাল বুক আজ ফুলে ফুলে উঠছে, তার কল্ কল্ ছল্ ছল্ অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে, তাই তার বাণিজ্য-তরণী বিনা ঝড়ে মারা পড়ে। দার্শনিকেরা সূর্য্যের আলোকে নাকচ করে দিয়ে অমাবস্যার অন্ধকারের বুক চিরে স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টায় ব্যস্ত। সাহিত্যে কেবল পরলোকে বাঁচবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মহারাজ—”

রাজা বিচলিত হলেন, মন্ত্রীর কথা শেষ না হতেই বললেন, “মন্ত্রী আমি পরিদর্শনে বের হব, প্রস্তুত হও।”

রাজা ও মন্ত্রী দু'জনে ছদ্মবেশে রাজপুরীর গুপ্তদ্বার দিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজা ও মন্ত্রী রাজপথ ধরে' চলতে লাগলেন। রাজপথের দু'ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায় নরনারী চলছে। সব যেন লক্ষ্মীহীন শ্রীহীন। রাস্তার দু'ধারের সৌধমালার ভিতর থেকে

যেন একটা নিঃশব্দ ক্রন্দনের রোল ঘুরে ঘুরে উঠে আকাশে মিশে যাচ্ছে, নর-নারীরা সব যেন অর্দ্ধমৃত, তাদের সে উৎসাহদীপ্ত আনন নেই, তড়িতোজ্জ্বল চোখ নেই, যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে আপনাদের নিরেট দেহটাকে বোঝার মত ব'য়ে নিয়ে চলেছে আর ভাবছে কবে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবে। দোকানে দোকানে বেচা কেনা চলছে, যেন কলের দোকানে কলের মানুষেরা কলের সাহায্যে হাত পা নাড়ছে, চারিদিক মৃত্যুর ছায়াতে সব কদর্য্য হ'য়ে উঠেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা—যেন তার মধ্যে বাস করছে সব "মমি" রা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাণিজ্যালয়—যেন সেখানে বসে' রয়েছে সব প্রেতাত্মারা, বাহির থেকে সেই সবই আছে, নেই কেবল সেই ভিতরের প্রাণের তড়িৎ—যে তড়িতের স্পর্শে সব সুন্দর হ'য়ে উঠবে সার্থক হ'য়ে উঠবে, অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজা সব দেখলেন, তাঁর চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হ'য়ে এল। রাজা রাজধানী ছাড়িয়ে জনপদ ছাড়িয়ে পল্লীতে প্রবেশ করলেন।

রাজা দেখলেন পল্লীর সে চোখ-জুড়োন চেহারা আর নেই। পত্রবহুল বৃক্ষরাশি যেন সব কৃপণ হ'য়ে উঠেছে, যা নেহায়ৎ না হলে নয় সেই কটা পাতা গায়ে জড়িয়ে তারা কঙ্কালের মত ডাল মেলে দিয়ে জড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে, ক্ষেতে ক্ষেতে আর সে শ্যামল শোভা আপনার মায়া বিস্তার করে হাসে না। দীঘির জলে আর মরাল মরালীরা সে আনন্দে সাঁতার কাটে না, পল্লী-আকাশ আর তেমন শিশুদের হাস্য কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে না, স্তব্ধ দুপুরে ছায়ায় ঢাকা বটগাছের তলে আর রাখাল বালকের বাঁশীতে তেমন সুর ফোটে না—আর সে পল্লীদেবালয়ে সান্ধ্য আরতির কাঁশর বেজে

ওঠে না। ভরা-জ্যোছনায় আর সে ঠাকুরমায়ের মুখে রূপকথার স্বপ্নের জাল বোনা নেই, সে সাধ আহ্লাদ সুখ সম্পদ যেন কোন্ এক যাদুকরের মায়া প্রভাবে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। দূর্ব্বাবিরল মাঠে মাঠে হাড় বের-করা গাভীর দল প্রাণপণে তাদের আহার্য্য আদায় করবার চেষ্টায় ধুকছে, পল্লীপাশ দিয়ে শীর্ণা নদী দীনা ভিখারিণীর মত থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে আপনার প্রাণহীনতার পরিচয় দিয়ে দিয়ে অস্ফুট ক্রন্দনে চলছে। রাজা যেখানেই যান সেখানেই কেবল শোনেন—"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কি হবে রে ভাই মিথ্যার জঞ্জাল বাড়িয়ে কোনরকমে দুটো দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই ভাল"। রাজা সব দেখলেন, সব শুনলেন, তারপর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মন্ত্রী এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি"?

মন্ত্রী উত্তর দিলেন—"মহারাজ! মানুষ ধরিত্রীকে অস্বীকার করেছে, নিজেও তাই নিরর্থক হ'য়ে উঠেছে। মানুষের প্রাণহীনতায় তার চতুষ্পার্শের প্রকৃতি নির্জ্জীব আনন্দহীন হয়ে উঠেছে, মহারাজ! আপনার জীবনের প্রতি মানুষ প্রেম হারিয়েছে তার বিনিময়ে সে লাভ করেছে কেবল মৃত্যু। এরা আজ মনে করতে শিখেছে যে ইহলোকের দুঃখ পরলোকের সুখ হয়ে দেখা দেবে, ইহলোকের অক্ষমতা পরলোকে সামর্থ্য হয়ে ফুটে উঠবে, এদের ধারণা মহারাজ, ইহলোকে নরক ভোগ করাই পরলোকে স্বর্গ লাভের সহজ ও সত্য উপায়"।

রাজা বিরাট দুঃখের ভার বুকে করে' রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

ধীরে ধীরে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অন্ন বস্ত্র অগ্নিমূল্য হয়ে উঠল! যেখানে এক টাকায় আট মণ চাল মিলত সেখানে আট

টাকায় এক মণ চাল মেলে না। যেখানে তাঁতির বাড়ীতে চার আনা পয়সা ফেলে দিয়ে এলে এক জোড়া কাপড় মিলত সেখানে চার টাকায় একখানা কাপড় পাওয়া যায় না। চারিদিকে হতাশা নিরাশা, কেবল হাহাকার। দেশের কত লোক একবেলা খেয়ে থাকল, কত লোক আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে লাগল। আর কত লোক মরে গেল। কিন্তু দেশের লোকের এ দুর্দ্দশা প্রাণে প্রাণে অনুভব করবারও শক্তি নেই—এমনি তারা প্রাণহীন। সবাই মনে করতে লাগল যে এ পৃথিবীর বুঝি এই রকমই ধারা। তখন দ্বিগুণ জোরে নরনারী-কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হতে লাগল "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"। এই মিথ্যার কাছ থেকে যত শীঘ্র বিদায় নেওয়া যায় ততই ত সুবিধা। ঘরে ঘরে আরও পরিধেয় বস্ত্র গেরুয়া রঙে রঙিন হয়ে উঠল।

(৪)

এই রকম যখন শাকদ্বীপের অবস্থা তখন এ সংবাদ গুপ্তচর-মুখে জম্বুদ্বীপের রাজা হুনেশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছিল।

রাজা হুনেশ্বর সিংহাসনে বসে ছিলেন, সংবাদ শুনে একেবারে সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। "কি বললে, কি বললে গুপ্তচর? এই রকম অবস্থা? জম্বুদ্বীপের রাজা হুনেশ্বর তার পিতা মুঘলেশ্বর, তার পিতা বাণেশ্বর, তার পিতা চণ্ডেশ্বর এমনি সাত পুরুষ ধরে' শাকদ্বীপ জয় করবার চেষ্টা করেছে; আর বার বার পরাভূত হয়ে ফিরে এসেছে। আজ শাকদ্বীপের এইরকম অবস্থা! সেনাপতি, সাজাও সাজাও, সৈন্য সাজাও"। রাজা হুনেশ্বর সেনাপতিকে যুদ্ধ যাত্রার জন্যে সৈন্য সাজাতে আদেশ করলেন। তুরী ভেরী বেজে উঠল,

অসি ঝন্‌ঝনা জেগে উঠল, বর্মফলক চিকমিক করে উঠল। পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য, দশ হাজার হাতি, বিশ হাজার ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে রাজা হুনেশ্বর শাকদ্বীপের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন।

রাজা জীবনগুপ্ত খবর পেলেন, হুনেশ্বর আসছে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দশ সহস্র হাতি বিশ সহস্র ঘোড়া নিয়ে শাকদ্বীপ জয় করতে মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—"মন্ত্রী রাজ্যের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে পরোয়ানা জারি কর যে স্বদেশরক্ষার্থে আবার আজ অস্ত্র ধারণ করতে হবে, শাকদ্বীপের চিরশত্রু জম্বুদ্বীপের রাজা আজ সসৈন্যে আবার সমাগত। দেশের সমস্ত সমর্থ লোক সমবেত হোক, জম্বুরাজ যেন আবার পরাজয়-পুরস্কার নিয়ে ফিরে যায়"।

রাজ অনুচর ছুটল দিকে দিকে রাজার পরোয়ানা নিয়ে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে, দেশের যুবক দলকে আহ্বান করতে। রাজ অনুচরেরা সমস্ত নগর নগরীতে প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে রাজার পরোয়ানা জারি করলে, রাজ-আহ্বান জানিয়ে দিলে, তার পর তারা এমনি এমনি রাজপুরীতে ফিরে এল, তাদের সঙ্গে কেউ এলো না।

সেনাপতি নিজে বেরুলেন—সমস্ত দেশবাসীকে ডেকে ডেকে বললেন, "স্বাধীনতা হরণের জন্যে শত্রু আগত, ওঠো জাগো, যার বাহুতে কিছুমাত্র বল আছে, ধমনীতে বিন্দুমাত্র শোণিত আছে, দস্যুর হাত থেকে দেশ রক্ষার্থে, দাসত্বের কবল থেকে স্বাধীনতা রক্ষার্থে, বেরিয়ে এসো অগণ্য পল্লীর অসংখ্য কুটীর থেকে, সংখ্যাহীন নগরীর উচ্চ সৌধমালার ভিতর থেকে, অগণিত মানুষের দল, অদম্য অপরাজেয় অরিন্দম। সেনাপতির বাণী কারো প্রাণে কোন ঢেউ তুললে না, সে

নাগী আকাশে অমনি মিশিয়ে গেল। সেনাপতি একাকী রাজপুরীতে ফিরে এলেন, সঙ্গে কেউ এলো না।

রাজা নিজে বেরুলেন। তাঁর প্রজাদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "এসো শাকদ্বীপের বীরের দল, আমাদের পিতৃপিতামহরা যেমন করে' জম্বুরাজগণকে, তাদের বাহিনীকে বার বার পরাজিত করে পৃষ্ঠ করে নষ্ট করে শাকদ্বীপের প্রত্যন্ত দেশ থেকেই বিতাড়িত করেছিলেন, তেমনি করে আজ আমরা হুনেশ্বর আর তার বিশাল চমূকে বিধ্বস্ত করে তাড়িয়ে দেব। পরধনলোলুপ হুনেশ্বরের দু'চোখ আজ শাকদ্বীপে নির্ম্মিত বর্শাফলকের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করুক, তার সৈন্যেরা আজ শাকদ্বীপের বীরবৃন্দের তরবারীর ধার অনুভব করুক, এস বীরের দল, আর সময় নেই, শত্রু দ্বারে সমাগত"। রাজার কথা সবার এক কান দিয়ে প্রবেশ করে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাজা ফিরে এলেন, কেউ এল না।

রাজা হুনেশ্বরের জয়ধ্বনি নিকট থেকে নিকটতর হ'তে লাগল। শাকদ্বীপের চারিদিকে কোথায়ও মৃদুকণ্ঠে কোথাও মৃতের কণ্ঠে, কেবল রব উঠতে লাগল—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"।

রাজা হুনেশ্বর দ্রুতবেগে শাকদ্বীপের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন, স্বচ্ছন্দ গতিতে, কোনখানে কোন বাধা নেই, কোথাও একখানি তরবারী তাঁর পথ আগলে বসে নেই, কোনখান থেকে একখানি বর্শা তাঁর সৈন্যের আরে এসে পড়ল না। রাজা জীবনগুপ্ত মাথায় করাঘাত করে' সিংহাসনে বসে' পড়লেন। "কি হবে মন্ত্রী, কি হবে! আপন স্বাধীনতা রক্ষার্থে একটি লোক অগ্রসর হোল না। দেশরক্ষা কে করবে? লোক নেই। রাজকোষে কুবেরের ধন সঞ্চিত,

কি হবে ? লোক নেই। অস্ত্রাগারে অপর্য্যাপ্ত অস্ত্র মজুত, কি হবে ? লোক নেই—লক্ষ সৈন্যের বর্ষব্যাপী রসদ্ মজুত, কি হবে ? লোক নেই”। নিরাশায় রাজার চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল।

রাজা হুনেশ্বর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। গৃহে গৃহে সমস্ত দরজা জানালা রুদ্ধ, রাজপথে পথে আর সেদিন বাতি জ্বলল না, একটি লোক চলল না, চারদিক স্তব্ধ মৃত্যুর মত নীরব, যেন কোন এক প্রেতপুরী। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার গভীর কালো হ'য়ে উঠল, হুনেশ্বর তাঁর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দশ হাজার হাতি বিশ হাজার ঘোড়া নিয়ে এসে রাজপুরীর উত্তর দ্বারে হানা দিলেন, সেই সময় সেই আঁধারে রাজা জীবনগুপ্ত তাঁর সাত রাণীর হাত ধরে' চোখের জল মুছতে মুছতে দক্ষিণ দ্বার দিয়ে রাজপুরী ত্যাগ করে গেলেন।

(৫)

রাজা জীবনগুপ্তের সিংহাসনে রাজা হুনেশ্বর বসে'। রাজা গুপ্তচরকে আহ্বান করে' জিজ্ঞেস করলেন—“গুপ্তচর, প্রবল প্রতাপান্বিত এই শকজাতি, যাদের কত শতাব্দী ধরে আমার পুর্ব্বপুরুষেরা জয় করতে পারে নি, সেই শকজাতির আজ এ দশা কেন ?”

গুপ্তচর বললে—“মহারাজ ! এই রাজ্যে দশ বৎসর পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী আসেন, তিনি প্রচার করেন যে, তিনি অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই আবিষ্কার করেছেন যে এই জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। সেই শিক্ষাকে অবলম্বন করে শকজাতি এ জগতটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে

দিয়ে আপনাদের আনন্দহীন প্রাণহীন করে তুলেছিল, তারই প্রতিশোধ এই দুর্দ্দশা"।

রাজা হুনেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—"সে সন্ন্যাসী এখন কোথায়" ?

গুপ্তচর উত্তর দিলে—"তিনি এখন শিপ্রাতীরে তাঁর মঠে অবস্থান করছেন"।

রাজা বললেন—"তাঁকে আমার সমীপে নিয়ে এস"।

সন্ন্যাসী রাজা হুনেশ্বরের সমীপে নীত হ'ল। রাজা হুনেশ্বর, আপনার গলা থেকে বহুমূল্য মণিহার খুলে নিজ হাতে সন্ন্যাসীর গলায় পরিয়ে দিলেন। বললেন—"মহাত্মন, আমার পিতৃপিতামহরা সাত পুরুষ ধরে' অস্ত্র দিয়ে যা করতে পারেন নি, আপনি এক পুরুষে শাস্ত্র দিয়ে তাই করেছেন, সম্রাট হুনেশ্বরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ও এই যৎকিঞ্চিৎ উপহার গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করুন"।

তারপর সম্রাট তাঁর সেনাপতির দিকে চেয়ে বললেন--"সেনাপতি, সন্ন্যাসীকে আমার সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে রেখে আসবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক, তার জন্যে এক মাস সময় দিলেম, সন্ন্যাসীকে জানিয়ে দেওয়া হোক, ঐ এক মাস পর থেকে তাঁকে কোন দিন আমার সাম্রাজ্যের সীমানায় দেখতে পেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে"।

সেনাপতি তরবারি কোষমুক্ত করে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন—"যে আজ্ঞা মহারাজ"।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দৃষ্টি।

——:*:——

শরতের একমুঠা রৌদ্ররে জমায়ে
যে পদ্ম উঠেছে বেড়ে, তাই দিয়ে গড়া
দু'খানি মধুর আঁখি,—দু'টি পক্ষ্মছায়ে
সুগভীর স্বচ্ছলতা কূলে কূলে ভরা।
তারি মাঝে দৃষ্টিখানি করুণ-কাতর,
বাহুপুটে আলিঙ্গন মেলিয়াছে তার
বেপমান দৃষ্টি-বাহু—আত্মার অধর
পাঠায়েছে চুম্বনের চারু পুষ্পাধার!
ব্যাকুল বক্ষের দোরে আসন্ন উদ্যত,
অসমাপ্ত চিরন্তন দৃষ্টির চুম্বন—
বিদ্যুৎপ্রবাহে চিত্ত মুগ্ধ মন্ত্রহত ;
এত বল কোথা পেল ও ভীরু নয়ন!
দু'টি আঁখি—একখানি দৃষ্টি—তারি মাঝে
নিখিল বিশ্বের লীলা নিঃশেষে বিরাজে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার।

—:*:—

(৩)

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

তোমাদের একটা কথা বলা ভাল, যে পায়ের চিহ্ন দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া যায় ; চিতাদের সম্বন্ধেও একথা খাটে। বাঘের দাগ অনেকটা চৌকাগড়ণের, বাঘিনীর তা নয়। গোল বাধে কখন জান ?—বাচ্চাদের বেলায়। তাদের পায়ের দাগ দেখে বাঘ কি বাঘিনী বুঝে নেওয়া দায়। কিন্তু একটি সহজ উপায়ে এ সমস্যার মীমাংসা করা যেতে পারে, পায়ের একটা দাগ হতে অন্য দাগের ব্যবধান কতখানি, দেখলে সেটা সহজে বোঝা যায়। পায়ের দাগের আকার দুয়েরি সমান, খোকা-বাঘের পায়ের ফাঁদ খাট, আর খুকির লম্বা। এটা নজর করে দেখা ভাল, কোনও জীবেরই শিশুহত্যা করা ভাল নয়। এদের বেঁচে বর্ত্তে বড় হতে দেওয়া উচিত, এতে যদি তোমার হাতের শীকার ফসকে অন্যের হাতে গিয়ে পড়ে তবুও এ স্বার্থ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বাঘ কিম্বা চিতা কি করে গরু মোষ মারে, এ খবরটা জানতে সবারই কৌতূহল হয়। এ ব্যাপার স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য যদিও আমার ঘটে নি, তবে হত্যাকাণ্ড সমাধা হবার অব্যবহিত পরেই আমি উপস্থিত

হয়েছি। হত জন্তুটির পিঠে কিম্বা ঘাড়ের পাশেই আক্রমণকারীর দাঁতের দাগ দেখা যায়, আর যে ভাবে ঘাড়টি ভেঙে ঝুঁকে পড়ে, তা দেখলে বোঝা যায় শত্রুপক্ষ নিরীহ জন্তুটির উপর ব্যাঘ্র-ঝম্পনে এসে, সম্মুখের পায়ের থাবা দিয়ে ধরে' তার ঘাড় মটকে ভেঙে দেয়। মারবার পরেই তাকে মুখে করে, কিছু দূর টেনে নিয়ে কোন ঝোপের অড়ালে কিম্বা তলায় রাখে, শকুন হাড়গিলে কিম্বা মাংসাশী জন্তুদের মুখ হতে তাকে রক্ষা করবার জন্যেই এই কাজ করে। অনায়াসে এ ভার সে বহন করে। আমি একবার মস্ত একটা মোষকে এম্নি করে টেনে তিন ফুট চওড়া একটা নালার অন্য পাড়ে রাখতে দেখেছিলাম। এম্নি অবলীলাক্রমে এই বিপুল ভার বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলে যে, সে দিকে যে মাটীর ঢিবি ছিল তাহ'তে এক আঁজল ধুলোও খসে পড়ল না। পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘটি প্রকাণ্ড, আর সে অতবড় মোষটিকে বেড়াল যেমন তার ছানা-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেম্নি সহজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এতে তার গায়ে কি পরিমাণ সামর্থ্য ছিল, তা অনায়াসেই অনুমান করতে পারো।

এসম্বন্ধে আমাদের দেশে সাধারণত অজ্ঞতা এতদূর যে, অনেকেই গম্ভীর ভাবে বলেন, "কাপ্‌ড়া চাই মেম্ সাহেব" বলে যে ফেরি-ওয়ালারা সহরের অলি গলিতে ফেরে, ব্যাঘ্রবীরও তাদেরই মত তার শীকারের বোঝা পিঠে করে বয়ে' নিয়ে যায়। আর একটি হাস্যকর ধারণা এই যে, বাঘ গিয়ে মোষ কিম্বা গরুর ল্যাজে কামড় দিয়ে ধরে, দুটোতে খুব খানিকটে টানা হিঁচড়া চলে, তারপর সুযোগ বুঝে চতুর বাঘ মোষের ল্যাজের টানটা আলগা করে দেয়, আর সে যেম্নি মুখ থুবড়ে পড়ে আর অম্নি ইনি গিয়ে তার ঘাড়ের উপর চেপে বসেন।

এই হচ্ছে মামুলি বিশ্বাস, আর তুমি যদি এর বিপরীত কিছু বল, তা হলে সেটা তোমারই অজ্ঞতা বলে' প্রতিপন্ন হবে। এখানে আর একটা গল্প না বলে' এগিয়ে চলাটা ঠিক হয় না। একবার সুন্দরবনে বাঘে একজন নাপিতকে দিনে দুপুরে আক্রমণ করেছিল, ধূর্ত্ত নাপিত ভয় পাবার পাত্র নয়, সে করলে কি জান?—তার পুঁটুলি হতে নরুণটি না বার করে বাঘের গলায় বসিয়ে দিলে, আর যাবে কোথা? বাঘ আর পালাবার পথ পায় না, কিন্তু পালাবার যো কি? চতুর নরসুন্দর ততক্ষণ তার লেজ ধরে আটক করেছে; ফলে কি দাঁড়াল জান?—থলের মুখ ফাঁক পেলে ইঁদুর যেমন পালায়, বাঘটি তেমনি করে দে চম্পট, কিন্তু আলাঙ্গুল ডোরাকাটা বাঘছাল খানি, বিজয়ী নাপিত ভায়ার হাতেই রয়ে গেল! দুঃখের বিষয় এমন অপূর্ব্ব ঘটনা অতঃপর আর ঘটবার সম্ভাবনা নেই। সেরূপ নাপিত একটি মাত্র ভূভারতে জন্মেছিল, মরণ কালে এমন অসম্ভব বীরত্ব সে সঙ্গে করেই নিয়ে চলে গেছে। যে ভদ্রলোক এ গল্পটি আমায় বলে ছিলেন, তিনি পরে জর্ম্মান দেশে অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করতে যেয়ে মারা গিয়েছেন, কিন্তু গল্পটি অমর হয়েই আছে।

চিতার শীকার পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন, সে ঘাড়ে গিয়ে পড়ে না, গলায় কামড় দিয়ে ধরে থাকে, জন্তুটি মরে পড়ে গেলে, তবে তাকে ছাড়ে। লোকে বলে রক্ত শুষে খাবার জন্যে সে এমনি করে, কিন্তু এটাকে মেনে নেওয়া চলেনা, কেননা এসম্বন্ধে প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নি।

আমি যতদূর জানি, তাতে বলতে পারি, চিতা আহার্য্য সম্বন্ধে অনেকটা সাত্ত্বিক, বাঘের মত অমন তামসিক নয়। সে উচ্ছিষ্ট কিম্বা পর্য্যুসিত আহার করে না, আর তা ছাড়া চিতা পরের শিকার-করা

জন্তু আহার করে না। বাঘের অত বাচ-বিচার নেই, যা পায় তাই খায়, তবে ক্ষুধার তাড়নায় সুবোধ স্বভাবের জন্যে নয়! আমি দেখেছি একটি ছোট অথচ পূর্ণবয়স্ক বাঘ একবার বাঘিনীর শিকার-করা একটি মোষ অধিকার করে বসে ছিল, তারপর যার সম্পত্তি, সে আসবামাত্র "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতিবাক্য শিরোধার্য্য করে অবিলম্বে পলায়ন করলে। এ ব্যাপার যেখানে ঘটেছিল শুনেছি সেইখানেই এক বাঘিনী পরের শীকার চুরি করে খেয়ে বেড়াত, কিন্তু যখন বন্দুকের গুলিতে মারা পড়ল, তখন দেখা গেল তার দেহখানি একেবারে অস্থি চর্ম্মসার। কারণ অনুসন্ধান করে আবিষ্কার হল যে, তার টাকরায় অনেকগুলো সজারুর কাঁটা আটকে রয়েছে, আর কতকগুলো বিঁধে তার চোয়াল ফুটো হয়ে গিয়েছে, মুখের চারিদিকে মৌচাকের মত ঘায়ের সমষ্টি, এ অবস্থায় চুরি করে খাওয়া ত দূরের কথা, মুখের গোড়ায় খাবার এগিয়ে এলেও, খাওয়া তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বহুদিনের উপবাসে দেহখানি হাড়ের মালায় পরিণত। একজন মস্ত শীকারী আমায় বলেছেন, তিনি একবার একটা বাঘ মারার পর দেখেছিলেন তার সম্মুখের হাতে মস্ত একটা সজারুর কাঁটা বিঁধে আটকে ছিল।

বাঘ আর চিতা দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কত বড় হতে পারে, সে কথা অনেক শীকারের বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু নানা শীকারীর নানা মত, তাই মাপ করবার নিয়ম সবার সমান নয় বলে' এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়! বাঘ বন্দুকের গুলি খেয়ে মরবার অব্যবহিত পরেই, তার লম্বাই চওড়াই কতখানি সেটা মাপা উচিত; কেননা দেরি হলে দেখা যায় তার শরীর সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। আমি

একবার দশফুট লম্বা একটা বাঘ শীকার করি, জঙ্গল হতে তাঁবুতে বয়ে নিয়ে আসা, এই সময় টুকুর মধ্যে পাঁচ ছয় ইঞ্চি কমে গিয়েছিল। এতে আমার বন্ধুদের ভারী আমোদ বোধ হয়েছিল, ব'লে রাখা ভাল যে সে দিন তাঁদের ভাগ্যে কোন শীকারই জোটে নি! মৃত্যুর পর সব জন্তুর শরীরই শক্ত হয়ে ওঠে, তবে বাঘদের দেহে এই কাঠিন্য যত শীঘ্র দেখা দেয়, অন্য পশুর শরীরে তা হয় না। চামড়া ছাড়িয়ে নিলে বাঘটা যে কত বড় ছিল তার কোন খবরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতি-মাতা এ জাতীয় জন্তুদের যে পোষাকটি পরিয়ে দেন, তা' তাদের দেহে এঁটে বসে না, আলগা থাকে। এর উদ্দেশ্য এদের দেহে যে ক্ষত হয়, সেটা চামড়াতেই আটক থাকে, মাংসে গিয়ে না পৌঁছয়, তা হলে প্রাণ হানির সম্ভাবনা অধিক। এদের গায়ে আঘাত-ক্ষত সর্ব্বদাই হচ্ছে—সেটা যাতে চামড়ার উপর দিয়েই যায়, বেশি সংঘাতিক না হয়, এই নিয়ত বিপদ নিবারণের জন্যেই প্রকৃতি তাদের দেহের আচ্ছাদনটি ঢিলে রেখেছেন। বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে নেবার পর দু'ফিট আন্দাজ বেড়ে যায়, চিতাবাঘের এর অর্দ্ধেক বাড়ে। একই দৈর্ঘ্য এবং আয়-তনের বাঘ ও চিতা কিন্তু ওজনে সমান হয় না। একটা বড় বাঘের ভারে একখানি বড় শক্ত চারপাই মড় মড় করে ভেঙে পড়তে আমি দেখেছি। চিতা ওজনে একমণ ৩৫ সেরের বেশি হতে প্রায় দেখা যায় না, একটি বড় বাঘ কিন্তু সাড়ে সাত মণ পর্য্যন্ত হতেও পারে, এমনটা যদিও সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে ছিল। সেই কথা মনে পড়ে গেল, একটা বাঘের গায়ে গুলি লাগে নি, পালাবার সময় যেখানটিতে শীকারীরা ঘেরাও করে-ছিল, সে সেই দিকে ছুটে যেতেই আর সবাই পালিয়ে গাছে উঠে

পড়ল, এক বেচারী তাড়াতাড়ি উঠতে না পেরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল, তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, সে সেই খানটিতে পড়ে মরে আছে, ঘাড়টি মটকান, নখের কিম্বা দাঁতের কোন চিহ্ন শরীরের কোথাও ছিলনা। পলায়নতৎপর ব্যাঘ্ররাজ হয়ত একবার সন্তর্পণে তার ঘাড়ে হাত রেখেছিলেন (প্রণয়ীর সলজ্জ প্রথম সম্ভাষের মত!) তাতেই তার এই দশা, একেবারে "পপাত চ-মমার চ"। এ হ'তেই জন্তুটির ওজন যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সামর্থ্য আর নিষ্ঠুরতায় আর কেউ বাঘের সমান না হ'লেও, এরা কিন্তু বুনো কুকুরকে ভারী ডরায়। বনচর জন্তুদের মধ্যে এই কুকুরদের মত ঘৃণ্য স্বভাবের আর কোন পশু নেই। এরা একবার যে বনে এসে দেখা দেয়, আর সবাই আতঙ্কে সেখান হ'তে সুদূরে পলায়ন করে। ব্যাঘ্ররাজও এই "যেনগতা পন্থার" অনুসরণ করেন। আর একটা কারণও থাকতে পারে, শীকারই যদি সব পালান, তবে শীকারী আর সেখানে বসে কি করবে বল? ভালুক আর পাহাড়ি-চিতা বুনো কুকুরকে তেমন ডরায় না, তার কারণ এরা সহজে গুহা গহ্বরে আশ্রয় নিতে পারে। আমার একবারকার শীকার এদের উপদ্রবে একেবারেই মাটী হয়ে গিয়েছিল।

বাঘ, সাম্বর, অন্য মৃগপাল সব কোথায় অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল, আমি পথ চেয়ে চেয়ে বসে যখন ফিরে এলাম তখন শুনলাম, তার দু'দিন পরে বাঘ ভালুক হরিণ নীলগাই সবাই বাসায় ফিরে এসেছিল। এই বুনো কুকুরের দল ভারী চালাক; এক জায়গায় জড় হয়ে না থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, একই জন গিয়ে, এক একটা পাহাড়ের চূড়ায়

ওঠে, আর অন্যরা শীকার তাড়িয়ে তাদের দিকে নিয়ে যায়। সাম্বর-হরিণ প্রায়ই এদের ফাঁদে পড়ে, কারণ প্রকাণ্ড ডালপালাওয়ালা শিং নিয়ে এরা বনের মধ্যে দিয়ে শীগ্‌গির দৌড়ে পালাতে পারে না। এই কুকুরের দলের এক আধটিকে মেরে ফেললেও আর গুলোকে ভয় খাওয়ান যায় না, কিন্তু ঘায়েল করে যদি চলচ্ছক্তি রহিত করতে পারা যায়, তাহলে কাজ কতকটা হয় বটে। এরা কিন্তু মানুষের কোন হানি করে না। এই শয়তানদের কথা শেষ করবার আগে এক জন স্কচ (Scotch) শীকারী তাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা সর্ব্ব সাধারণে জ্ঞাত করান কর্ত্তব্য। তিনি বলেন—"জন্তুদের মধ্যে এদের মত খেঁকী, বেয়াদব, পাজী জানোয়ার আর দুটি নেই" (The most snarling, ill-mannered and detestable of beasts). এমন সকল শব্দের উপযোগীতা ততক্ষণই আছে, যতক্ষণ না তার অপব্যবহার হয়। এম্নি একটি দুর্দ্দশাগ্রস্থ শব্দ (d-d) নিশ্চয়ই আদিম মানব-প্রবর "আদমের" মুখ হতে রাগের মাথায় প্রথম জন্মলাভ করেছিল,—আর এ রাগটার উৎপত্তি যে ইবা-র (Eve) ব্যবহারে হয় নি এ কথা কে সাহস করে বলতে পারে? আইন যাঁদের পেশা, তাঁরা বলবেন এম্নি আর একটি বহু প্রাচীন প্রথা তাঁহাদের ব্যবসায়ে প্রচলিত আছে—সেটা হচ্ছে alibi, এটাও নিশ্চয়ই আদিম-পাপের মতই পুরাতন। আদম যিহোবার বিচার কালে এই alibi গরহাজিরের অছিলা, করেছিলেন—কিন্তু বিফলে।—আমাদের জজ সাহেবরাও যদি এ কথাটা জানতেন, তাহলে তাঁদের হাতে কি জবর নজিরই থাকত!

একবার একটা চিতা, হঠাৎ কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান হ'ল তা আর কারো বোধগম্য হল না বলে, (এর কথা পরে আরো

শুনতে পাবে) আমরা সবাই শীকারী, লাঠিয়াল বরকন্দাজ তার অনুসন্ধানে বের হ'লাম। জায়গাটির পাশে এক টুকরা জঙ্গল ছিল, সেটা কারো নজরে পড়ে নি, কেননা সেখানে গাছপালা, কি ঘন ঘাস, এমন কিছুই ছিল না যার আড়ালে আবডালে কোন জন্তু, এমন কি একটা বেড়ালও, লুকিয়ে থাকা সম্ভব! আমরা একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিনবার এর চারিদিক উটকে পাটকে দেখে যখন কোনই কিনারা করতে পারলাম না, তখন এরই পাশে যে আখের ক্ষেত ছিল, সেই দিকে খুঁজতে যাব মনস্থ করলাম। লাঠিয়ালরা সবে মাত্র দু'পা এগিয়েছে, কার কি কর্ত্তব্য সে বিষয়, আমার তাদের সব কথা বলা তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় আমি দেখতে পেলাম সেই জঙ্গলটার মধ্যে কি যেন নড়ছে, তারপর দেখি কিনা, চিতাটি বুকে হেঁটে মস্ত একটা টিক্‌টিকির মত এগিয়ে চলেছে। ভাগ্যিস আমার বন্দুকটা আমার কাঁধের উপর তৈরি ছিল। আচমকা শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠল, আর মনে করলে সেটা হঠাৎ ফস্‌কে আওয়াজ হয়েছে, কিন্তু যখন বাঘটাকে ভূমিসাৎ হয়ে পড়তে দেখলে, তখন আর তাদের বিস্ময়ের পারাপার রইল না। আমরা যখন তার খোঁজে চারিদিক তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিলাম, তখন সে কেমন করে নিঃশব্দে লুকিয়ে ছিল, আর অতবার আনাগোনা করা সত্বেও যে আমাদের চোখে পড়ে নি, এটা ভারী আশ্চর্য্যি মনে হয়।

বাঘ শীকারের একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের কথা তোমাদের এখানে বলা ভাল, তার মধ্যে একটু মজার কথা আছে। গেল-বৎসর ঘটনাটা ঘটেছিল। গল্পটা আমার আর K. G. B-র কাছে তোমরা অনেকবার শুনেছ। একটি বাঘিনী আমার নির্ঘাত গুলির

ঘায়ে মরে পড়েছে, আমরা সবাই মিলে, চারিদিক ঘিরে তার ডোরা-কাটা সুন্দর চামড়া খানির, আর নধর দেহের প্রশংসাবাদ করছি, জনবিশেক লাঠিয়াল কাছাকাছি, আর বেশির ভাগ পাহাড়ের, মাথার উপর রয়েছে, আমাদের কাছে পৌঁছতে হলে, তাদের অনেক খানি পথ নেমে আসতে হবে, বাঘিনী-নিধন বার্ত্তা, লাঠিয়ালরা চীৎকার করে তাদের বলছে, তারা মহানন্দে পাহাড় হতে দৌড়ে নেমে আসছে, কাছাকাছি যারা ছিল তারাও ভিড় করে ঘিরে এসেছে, আমি আমার বন্দুকটি বাক্সবন্দী করেছি, এমন সময় প্রকাণ্ড এক ভল্লুক দম্পতির হুপ হুপ শব্দ আমার কাণে এসে পৌঁছল। K. G. B. বন্দুক হাতে এগিয়ে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করলেন, স্বাগত সম্ভাষণের মাহাত্ম্যে একটি ত তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হল, ইহজীবনের মত আর তার বাক্য নিঃসরণ হয় নি। অন্যটি চারিদিকে লাঠিয়াল শীকারীর গোলযোগে, বাঘ ভালুক মারা পড়বার বিভ্রাটের সুযোগে পলায়ন দিলে, সুখের বিষয় কারো কোন হানি করে যায় নি। আমি বাক্স হতে বন্দুকটি বার করে নেবার দু'এক মিনিটের মধ্যেই এত খানি কাণ্ড হয়ে গেল।

আর বেশি দূর না এগিয়ে, এলোমেলো ভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে এখন কাজের কথায় মন দেওয়া ভাল। বাঘ আর চিতা শীকারের গল্প আমি প্রকৃত ঘটনা হতেই বলব। এ ব্যাপারে যেখানে সম্ভব, পায়ে হেঁটে শীকার করাই সব চেয়ে নিরাপদ উপায়, এ কথা জোর করে বলতে আমি একটুও দ্বিধা বোধ করছি নে—এ বিষয়ে প্রথম স্থান দিতে হবে Still Hunting-কে, অর্থাৎ এক স্থানে স্থির হয়ে বসে শীকার করাকে। এ কাজে প্রচুর অভ্যাস আর অলৌকিক ধৈর্য্যের আবশ্যক। এ ব্যাপারে অনেক সময় দেখা যায়, সেটা বিরক্তি-

জনক লুকোচুরি খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শীকারী শুধু খুঁজেই মরে, কিন্তু অভীষ্ট লাভ হয়ত ভাগ্যে সহজে ঘটে না। লম্বা ঘাসে ভরা জঙ্গলে এমন ভাবে শীকার করা সম্ভব নয়—পাহাড়ে যায়গায় এ সুযোগ খোঁজা দরকার আর সুবিধাও পাওয়া সহজ। বৃহদাকার জন্তু বিশেষকে তার আপন জমিদারীর এলেকায়, এ ভাবে হাত করতে পারাই শীকারীর মৃগয়া-কৌশলের পরাকাষ্ঠা। যদি মৃগয়ার নিদর্শন, ব্যাঘ্ররাজের ডোরাকাটা আঙরাখা, ভাল্লুকের লোমশ কোমল কম্বল খানি, হরিণের শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড শৃঙ্গ যুগল, মহিষাসুরের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শৃঙ্গ-ফলক, বরাহ অবতারের খড়্গের মত যুগ্মদন্ত, সংগ্রহ করে গৃহের শোভা, আর আপনার বীর্য্য গৌরব স্মরণীয় করতে চাও তাহলে পরিশ্রম করতে হবে, যে মানুষ এগুলি অর্জ্জন করতে চায়, বিনিময়ে তাকে আপন জীবনের অনেক খানি অংশ, আর শ্রেষ্ঠ অংশই দান করতে হবে।

মধ্য-প্রদেশে অনেক পাহাড়তলী আছে, কিন্তু শীকারী সেখানে কমই যায়। কেননা সেখানে সহজ গতিবিধি, সৌখীন চালচলন চলে না। শীকার প্রত্যাশায় মৃত জন্তুর পাশে পাহারা দিয়ে বসে থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। টোপ গেথে মাছ ধরবার জন্যে চুপ করে বসে থাকতে হয়, বাঘকে ভুলিয়ে আনবার জন্যে পাঁঠা কি ভেড়া বনে বেঁধে রাখতে হয়, তাকে আকর্ষণ করে আনবার জন্যে এইটি সব চেয়ে ভাল উপায়। আর যদি তার কাছাকাছি কোন জন্তু বাঘের আক্রমণে মারা গিয়ে পড়ে থাকে, আর সেখানে জনসমাগম বিরল হয়, তাহলে বাঘটিকে তার মৃত-শীকারের কাছাকাছি নাগাল পাবার খুবই সম্ভাবনা। এই সব মৃত-শীকারের কাছে পৌঁছবার

জন্যে শীকারীর বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। কান-কথার চেয়ে জোরে কোন কথা বলা চলে না, আর শীকারীও তাঁর অনুচরদের নিঃশব্দ পদ সঞ্চার পাওয়া আবশ্যক। প্রায়ই দেখা যায় এর কাছাকাছি কাক চিল গাছের ডালে বসে গলা বাড়িয়ে সতৃষ্ণ ই দিকে চেয়ে আছে। তোমায় আসতে দেখে শেয়াল-গুলো মনভারী করে নিতান্ত অনিচ্ছায় অন্যত্র সরে পড়ছে। ময়ূরের কেকা ধ্বনি, যতক্ষণ বাঘ সেখান হতে অদৃশ্য না হচ্ছে, ততক্ষণ আর কিছুতেই নীরব হচ্ছে না, এই সব লক্ষণ হতেই বাঘটি যে কোথায় আস্তানা নিয়েছে, তা বোঝা যায়। এখন তার কাছাকাছি পৌঁছতে হলে, গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, আস্তে আস্তে এগোন ভাল, সম্ভব হলে মাঝে মাঝে দু'এক চক্র ঘুরে ঘুরে যাওয়া মন্দ নয়, কিন্তু কখনই নালা কিম্বা নদীর শুক্‌ন খাল কিম্বা ঘন ঘাসে ঢাকা মাঠ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

ময়ূর জাতের কেন কে জানে বাঘ সম্বন্ধে ভারী একটা মোহ আছে—কি যে মায়ামন্ত্র ব্যাঘ্রবীরের জানা আছে কিনা জানিনে, কিন্তু ময়ূর এদের কাছাকাছি থাকতে পারে দূরে যেতে চায় না। জঙ্গলবাসী শীকারীরা দেখে শুনে এই গুণ-[illegible] ঠিক খবর জেনে নিয়েছে, আর শীকার করবার সময় এই দুর্বলতার বিশেষ সুবিধা নিয়ে থাকে। আমি একবার শীকার করতে গিয়ে বনের মধ্যে তাঁবুতে বসে ছিলাম, এক ঝাঁক ময়ূর কাছাকাছি চরছিল, দেখলাম একজন শীকারী বাঘের মত ডোরা-কাটা একটা [illegible] রঙের পর্দা নিজের সম্মুখে আড়াল করে ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ময়ূর স্বভাবত ভারী ভীরু আর লাজুক, কিন্তু বাঘের মত এই ডোরা-টানা পর্দা দেখে

তারা ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠল, পর্দ্দা যতই এগোয় ময়ূরগুলি ততই স্ফূর্ত্তি করে, বিচিত্র কলাপ আর পাখা মেলে আনন্দে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। গ্রাম্য শীকারীটি পঁচিশ গজের মধ্যে গুলি করে একটিকে হাত করলে, কিন্তু তবুও অন্যেরা তখনও নিরাপদ হবার জন্যে পালিয়ে গেল না। পাগলের মত কলরব করে সেই পর্দ্দারই আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল, ইত্যবসরে শীকারী আরো একটিকে গুলি করে মেরে সামনের পর্দ্দা ফেলে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে। এই পর্দ্দাকে তারা বলে 'বাঘিনী'—মোহিনী শক্তির আধিক্যবশত বোধ হয় স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার চলেছে। সে যাই হোক, অনেকবার এ কথা শুনেছিলাম কিন্তু চোখে না দেখা অবধি বিশ্বাস করি নি। অমন সুন্দর পাখী মেরে ফেলা ভারী নিষ্ঠুরতা, তবে অমন নিষ্ঠুরতা যে আমার চোখের সমুখে ঘটতে দিয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ, শোনা-কথার সত্য পরীক্ষা। আমি মনে করেছিলাম যে তার বড়াই নিতান্তই গাল-গল্প, কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল অন্য রকম। সে বল্লে ময়ূর শীকার করা যে শীকারীদের ব্যবসা, তাদেরি কাছে এই বাঘিনীর চাতুরিটা সে শিখে নিয়েছে। এই শীকারীরা তীর ধনুকে ময়ূর শীকার করে থাকে। কোন কোন বন্য প্রদেশে যেখানে চারিদিক গুল্ম কিম্বা ঘন তৃণ-সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বালুকার স্তূপ আর জলহীন নালার প্রাদুর্ভাব, সেখানে শীকারী হাতী পাঠিয়ে, বাঘকে তাড়িয়ে তার হত-শীকারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বলা বাহুল্য, যে হাতী এ বিষয় বিশেষ রূপে শিক্ষা পেয়েছে সেই কাজে লাগে, আর এমন একটি হাতী সহজে বড় একটা পাওয়া যায় না।

হাতীর উপর হাওদা দেওয়া হয় না, জিন-সওয়ারীর মত বসতে

হয়, পা রাখবার জন্যে দু'টি জায়গা থাকে, এটা বীরাসন সন্দেহ নাই কিন্তু নিরাপদ নয়, বিশেষত পথে এগবার সময় বার বার ডাল পালার বাধা অতিক্রম করতে হয়। এর উপর যদি দ্বীপেন্দ্রটি বীরেন্দ্র না হয় তাহলে সমূহ বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। এমন একটি বিপুল বপু অনাহূত আগন্তুককে অকস্মাৎ আসতে দেখে বাঘ কিম্বা চিতা, এম্নি স্তম্ভিত হয়ে যায় যে প্রথম গুলি মারবার বিষয়ে কোন বাধা দেয় না। সম্বর হরিণও ঘন ঘাস-বনের মধ্যে ঠিক একই ব্যবহার করে। আর অযোধ্যায় যেখানে বহু চিত্রক হরিণের বসতি, স্বচ্ছন্দ আহার বিহারে প্রকাণ্ড আয়তনের হয়ে ওঠে, তাদেরও আমি অনেক বার অনেক গুলিতে এই উপায়ে শীকার করেছি।

এই রকম হাতীর উপরে বসে শীকার করতে গেলে, একটি বিষয়ে তোমাদের বিশেষ করে সাবধান হতে হবে। যে মুহূর্ত্তে বনের মধ্যে প্রবেশ করবে আর যতক্ষণ না বনের বাহিরে আসবে ততক্ষণ কিছুতেই নিজের বন্দুকটি হাত ছাড়া করবে না, তা সে যতই ভারী হোক না কেন? হঠাৎ যে পথে কখন কার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটবে বলা কঠিন, বিপদ যে এসে দেখা দিয়ে যাবে না এ কথা কে বলতে পারে? না যদি আসে, সে ত ভাল কথা কিন্তু বনের মধ্যে হাতীর পিঠে চড়ে, শীকারের খোঁজে বেরতে হলে, আগে হতে সাবধান হওয়াই ভাল, জান ত কথায় বলে "সাবধানে বিনাশ নাই"। আর তা ছাড়া নিজের বন্দুকটির সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয় ততই ভাল, তাকে যখন তখন কাঁধে পিঠে করে নিয়ে বেড়ালে তার সঙ্গে এমনি বন্ধুত্ব জন্মায় যে বিপদের মুখে সে সহায় হয়ে নিশ্চয়ই দাঁড়ায়, আর অনায়াসে তার সাহায্যে শত্রু বিনাশ হয়ই হয়। যারা ক্রিকেট,

হকি, টেনিস খেলে তারা জানে, ব্যাটের সঙ্গে ভাব রাখলে সময়ে কাজ দেখে !

P.—একবার জঙ্গলে মাচান বাঁধা ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখতে গিয়েছিলেন, আমি বার বার বলা সত্বেও বন্দুকটি নিলেন না, রেখে গেলেন। একটা সরু নালা পার হয়ে যাচ্ছিলেন, তার দু'ধারে খাড়াই পাড়, ঝোপ ঝাড়ে একেবারে ঢাকা, বেশি দূর যেতে না যেতেই একটা মস্ত বাঘ একেবারে কানের কাছ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে গজেন্দ্র-গমনে চলে গেল। P.—যে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁর পায়ের শব্দ কিম্বা পাথর গড়িয়ে পড়বার শব্দে সে চমকে উঠে থমকে,—পালিয়ে গেল। উভয় পক্ষেই কি সুযোগ হারালে বল দেখি! P.—কে তোমাদের মনে আছে ত? Bisley আর অন্যত্র কত প্রাইজ আর মেডাল সে পেয়েছিল, শেষ কালে একটা জ্বলন্ত বাড়ী হতে বসন্ত রোগী ছোট্ট একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে, সেই রোগে বেচারী দু'চার দিনের মধ্যে নিজেই মারা গেল।

সেই জঙ্গলেই আমি একদিন চিত্তলের খোঁজে খোঁজে বহুদূর বিস্তৃত ঘন বাঁশবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। থেকে থেকে ময়ূরের কর্কশ কেকা ধ্বনি কিম্বা কপোতের মৃদুগান ছাড়া আর কিছুতে চারিদিকের পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অরণ্য-সুলভ দু'একটি অপরিচিত অশ্রুত পূর্ব্ব শব্দ কানে আসছিল, তার, কোথা কিম্বা কেন কিছুই বোঝা যায় না। এই বিরল শব্দগুলিই যেন নিস্তব্ধতাকে আরো গাঢ়তর ও অস্বস্তিকর করে তোলে। কখনো কোন মৃত্তিকার স্তূপ ডিঙিয়ে, শুকনো গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে কেবলি এগিয়ে চলেছি, একবার মনেও হয় নি, যে কোন কিছু হঠাৎ আমার

সম্মুখে এসে পড়বে কিন্তু তবুও চোখ যদিও কিছু দেখতে কিম্বা কান কিছু শুনতে পায় নি, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, কি যেন একটা আসছে, তারপর চোখ তুলেই দেখলাম—প্রায় চল্লিশ হাত দূরে একটা প্রকাণ্ড হাতী, কুলোর মত কান দুটো খাড়া করে, শুঁড়, গুটিয়ে তুলে সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিচার বিবেচনার সময় ত আর তখন ছিল না, আমি তাড়াতাড়ি একটা ঘন বাঁশ ঝাড়ের মধ্যেই লুকিয়ে পড়লাম, যদিও আমার পিছু পিছু আসবার কোন পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাই নি, তবুও সেদিকে কি ঘটছে দেখবার জন্যে আস্তে আস্তে মুখ ফেরালাম—দেখলাম পর্ব্বত-প্রমাণ একটি হস্তিনী শুঁড় তুলে হুঙ্কার করতে করতে দ্রুত অন্তর্ধান হল—গজেন্দ্র গমনে নয়। যদি আমি আর দু'চার হাত এগিয়ে যেতাম, বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে না আশ্রয় নিতাম, তাহলে কি যে ঘটত সে সম্বন্ধে অধিক না-ভাবা আর না-বলাই ভাল। আমার হাতে শুধু 12 bore Nitro Paradox ছিল, আর তোমরা ত জান হাতী মস্ত বড় জানোয়ার হলেও কেমন অনায়াসে অতি অল্প পরিসর স্থানে সত্বর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করতে পারে। তাই Paradox আর আমার পদযুগলের সম্মিলিত চেষ্টাতেও প্রাণ রক্ষা হত না, সেটা সুনিশ্চিত !

ক্রমশ—

বিসর্জ্জন।

——:•:——

তার নামটি ছিল টুলু; সে ছিল আমার বাল্য-সহচরী। তার সম্পর্ক, পৃথিবীর আকাশ এবং পৃথিবীর বাতাস সম্পূর্ণরূপ পরিহার করে' আমারই প্রাণে—আমার মর্ম্মের গভীর বেদনাতেই নিমগ্ন হয়ে রয়েছে।

সে থাকত আমাদের পাড়ার রায়দের বাড়ীতে। কিন্তু রায়দের দেহের যে শোণিত-প্রবাহ, তার সঙ্গে তার রক্তের যোগ ছিল না; আবার প্রীতি বা স্নেহের কোন যোগসূত্রে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে তার যে কোন বন্ধন পড়েছিল, এমনও নয়। ঐ ক্ষুদ্র একটি বালিকা যেন ছিল রায়-পরিবারের মস্ত একটা দায়।

টুলুর এক মামি-মা ছিল রায়দের ঘরের ঝিয়ারী, সে যখন বিধবা হয়ে তার বাপের বাড়ী এল, তখন অনাথা ভাগিনেয়ীটিকেও সে তার সঙ্গে আনল। বিধবা-মেয়ের অস্তিত্বের গুরুভার আর রায়দের বেশি দিন বইতে হল না, কিন্তু মৃত্যুকালে একটি অনাথা বালিকাকে লালন পালন করবার দায় সে তার মা বাপের ঘাড়েই চাপিয়ে গেল।

জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার একটা সুযোগ টুলু পেয়েছে, কিন্তু রায়দের বাড়ীতে যে অবস্থায় তার দিন কেটেছে,—পশু-প্রদর্শনীর পশুর যে দশা, তার তুলনায় তা ছিল আরো দুর্ব্বহ। বাড়ীর লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে এবং তাদের মনের যোগ ছিন্ন করে বালিকার

ক্ষুদ্র প্রাণ-পাখীটি মুক্তির অবাধ আকাশে আনন্দে যে ডানা মেলবে, অমন অবকাশ তার খুব অল্পই ছিল ; নিরন্তর তাকে পর্য্যবেক্ষণ করে' আতিপাতি করে' তার দোষগুলো বের করবার এবং নানাভাবে তাকে গঞ্জনা দেবার উদ্যম'ও উৎসাহ বাড়ীসুদ্ধ লোকের একান্তরূপেই ছিল। টুলু যে তাদের আপনার কেউ নয়, অথচ তাকে পালন করবার দায় তাদেরই, এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মরণ হতে না পেরে তাকে নিয়ে তাদের কারুর আর স্বস্তিবোধ ছিল না। অনাথা বালিকাটির মুখের অন্ন তুলে ধরে তারা তার জীবন রক্ষা করেছে বটে, কিন্তু তার প্রতি তাদের অন্তরের যে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ভাব, তার বদ্ধ হাওয়াতে শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটি নিরন্তর গুমরে মরেছে।

আমার বিধবা-মায়ের আমিই ছিলুম একমাত্র সন্তান। তাঁর হৃদয়ের অজস্র স্নেহরাশি আমার ক্ষুদ্র প্রাণ-পাত্রটি কাণায় কাণায় ভরে' তুলে' আরো যেন উপছে পড়েছে, আর তার বিভিন্ন ধারার একটি ধারা ঐ অনাথা বালিকাকে আশ্রয় করেই বেগে প্রবাহিত হয়েছে। টুলুর কচি হৃদয়খানি কষাঘাতে নিরন্তর জর্জ্জরিত হয়েছে, থেকে থেকে দু'এক মুহূর্ত্তের ফাঁকে বালিকার অন্তরের ঐ ক্ষত স্থানে আমার মা-ই তাঁর স্নেহের হাতখানি বুলিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বাড়ী টুলু যে এসেছে, তার দরুণ তাকে ঢের কথা শুনতে হয়েছে। রায়দের বাড়ীর দৃষ্টি গুপ্তচরের মত অলক্ষ্যে তাকে অনুগমন করে' সদাসর্ব্বদা তার গতি বিধি নিরীক্ষণ করেছে। ভালমন্দ সামগ্রী যখন যা-কিছু আমাদের বাড়ীতে হয়েছে, মা হয় ত হেঁসেল ঘরের এক কোণে বসিয়ে তাকে খাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু রায়দের দৃষ্টি সেখানে গিয়েও পৌঁচেছে। টুলুকে তারা কত গালিগালাজ করেছে,—এক

রতি মেয়ে, কিন্তু তার উদরখানি যেন কুম্ভকর্ণের মত, বাড়ীতে এত যে খায় তবু কি তৃপ্তি আছে, আবার এবাড়ী ওবাড়ী গিয়ে পাত না পাতলে মেয়ের দিন আর যায় না। কিন্তু, অত যে বিড়ম্বনা, তবু টুলুর আমাদের বাড়ী আসা ক্ষান্ত হয়নি; দু'বেলা অন্তত দু'টিবার সে আমাদের বাড়ীতে প্রতিদিনই এসেছে।

আমি তখন গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলে নীচের এক ক্লাশে পড়তুম; ইস্কুলে যারা ছিল আমার সহপাঠী, ইস্কুলের বাইরে আমি তাদের সম্পর্ক বড় একটা রাখতুম না। আমি ছিলুম বিধবা-মায়ের একমাত্র সন্তান; মায়ের অঞ্চলখানি আমাকে সদাসর্ব্বদা আকস্মিক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছে। ইস্কুলের ক'টি ঘণ্টা ব্যতীত বাড়ীর বার হবার, এবং অন্যান্য ছেলেপিলেদের সঙ্গে দৌড় ধাপ ও ছুটোছুটি করবার অবকাশ আমি খুব অল্পই পেয়েছি; অধিক সময় আমার কেটেছে অন্তঃপুরেই। ঐ সময় টুলু যখন একটু ফাঁক পেয়েছে আমাদের বাড়ীতে এসেছে, একটি নিঃসঙ্গ বালকের হৃদয়ের কারবার দিনে দিনে তাকে নিয়েই জমেছে।

ইস্কুল থেকে আমি বাড়ী ফিরেছি; তার অল্পক্ষণ পরেই টুলু আমাদের বাড়ীতে এল; সেদিন বালিকার কচি প্রাণের পল্লব আরো যেন নেতিয়ে পড়েছিল। আমার সুমুখে চুপটি করে এসে সে দাঁড়ালে, যেন নীরব মনোবেদনার জ্যান্ত একটি সাকার রূপ। বালিকার তাপ-দগ্ধ চিত্তে যে মুহূর্ত্তে একটি বালক-হৃদয়ের স্নিগ্ধ ও সুশীতল স্পর্শখানি লাগল, তার অন্তরের যে একটা নিবিড় বেদনা, তার পারিপার্শ্বিক হাওয়ার উত্তাপে এখনও অশ্রু হয়ে ঝরবার অবকাশ পায় নি; সেই নিমেষে তার দুটি ডাগর আঁখির পাতায় বিন্দু বিন্দু হয়ে

দেখা দিল। বালিকার প্রাণে সেদিনের একটি বিশেষ ঘটনা অতি নিদারুণভাবে আঘাত করেছিল।

টুলুকে ত বাড়ীসুদ্ধ লোক তাড়নাই করেছে, তাদের কাছে তার চিত্ত সদাসর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েই রয়েছে, সেখানে যার সাহচর্য্যে বালিকার হৃদয়খানি ঈষৎ মেলেছে, সে হচ্ছে তার প্রিয় সুহৃদ একটি বিড়াল। অবজ্ঞা ও অনাদরের পাঁচিল অলক্ষ্য হয়ে যেখানে উঠেছে, বালিকার অন্তরাত্মা থেকে থেকে যেন ঐ একটি ক্ষুদ্র জানলার অল্প একটু ফাঁকে মুখখানি বাড়িয়ে আলো-আকাশের আনন্দ-মূর্ত্তির ঈষৎ পরিচয় পেয়েছে।

টুলু বিড়ালটিকে বড় ভাল বেসেছে; বাড়ীর লোকদের বিষ-দৃষ্টির অন্তরালে কোন একটি নিরাপদ স্থানে কখনো সে যদি তার সাক্ষাৎ পেয়েছে, তাকে কোলে করে গায়ে তার কত হাত বুলিয়েছে, তাকে কত সোহাগ কত আদর করেছে; তার ব্যথায় কত সমবেদনা জানিয়েছে। আবার বিড়ালটিও ছিল এমনিতর যে বাড়ীর আর আর ছেলেপিলে যদি তার গায়ে হাত দিয়েছে, অমনি সে হয় ত দৌড়ে পালিয়েছে, অথবা হিংস্র একটি জীবের মতই ধারালো নখের সাহায্য নিয়েছে; আর টুলু যখন গিয়েছে, শান্তশিষ্ট শিশুটির মত তার কোলে এসেছে। বিড়ালটার সঙ্গে টুলুর যে অতটা সৌহার্দ্য ভাব, ওটা যাতে ব্যক্ত না হয়, সেদিকে ঐ ক্ষুদ্র বালিকার যদিও বিশেষ সাবধানতা ছিল, তবু বেশি দিন আর তা গোপন রইল না। আর যখন প্রকাশ পেল যে, বিড়ালটা টুলুরই একান্ত অনুরক্ত, তখন ঐ বিড়ালের সম্বন্ধে বাড়ীর লোকদের মনোভাব বিষ হয়েই উঠল। সেদিন টুলুর বড়ই আদরের ঐ যে বিড়ালটি, তার বিষাদঘন চিত্তে, সুদূর আনন্দ-লোকের একটি

ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বহন করে এনেছিল, তাকেই—ঐ বালিকার যারা নিষ্ঠুর বিধাতা, তার প্রাণের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি নদীর পারে 'অন্তরীণ' করেছিল; আর বালিকা, তার অন্তরে নিদারুণ একটা আঘাত পেয়ে, আমারই কাছে এসেছিল তার সে বেদনা জানাতে।

অশ্রুভরা দুটি চোখের দৃষ্টি আমার মুখের দিকে তুলে ধরে টুলু আর্দ্রকণ্ঠে যখন জানালে, "তারা আমার বিড়ালটাকে নদীপার করে দিয়েছে"। বালকের মন তখন যেন একেবারে উদ্ধত হয়ে উঠল,—বালিকার প্রাণে তারা অন্যায়রূপে যে নিষ্ঠুর ব্যথা দিয়েছে, তার একটা প্রতিবিধান করবার উদ্দেশে। আমি সান্ত্বনা দিয়ে তাকে বললুম, "আমাদের বিশুকে কালই ওপারে পাঠাব, এবার তোমার বিড়ালটিকে আনিয়ে আমাদের বাড়ীতেই রেখে পুষব, দেখব কে আবার তাকে নদীপার করে"।

বিশু আমাদের বাড়ীর একটি চাকর, আমার সকল আবদার ঐ বিশুই শুনত। সেদিন বিশু বাড়ীতে উপস্থিত ছিলনা, নতুবা আমি তাকে সেই মুহূর্ত্তেই পাঠাতুম; সময়ের অপেক্ষা আমারই সইছিল না। বালিকার দুঃখ সেই দণ্ডে ঘুচিয়ে তার প্রীতিসাধন করবার জন্য একটি বালকের অন্তর বড়ই উদ্বেল হয়ে উঠল। নদীটি আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় একপোয়া মাইল দূরে ছিল; টুলুকে সঙ্গে করে' আমিই গেলুম, যদি বিড়ালটার কোন সন্ধান করতে পারি। যখন পাড়ের উপর এসে আমরা দাঁড়ালুম, শুনলুম, ওপারের একটা ঝোপের আড়ালে বসে বিড়ালটা মিউ-মিউ করে কাঁদছে। বিড়ালের কান্না শুনতে পেয়ে, টুলু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল; "আয় আয় পুষি আয়, আয় আয় পুষি আয়"।

বিড়ালটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে, জলের একেবারে কিনারাতে এসে দাঁড়াল, কিন্তু নদীতে সাঁতার দিতে সে আর সাহস করল না; আবার পাড়ের উপরে উঠে গিয়ে এবার আরো বেশি কাত্‌রাতে লাগল। টুলু হতাশ হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল,— তার ঐ চোখের চাহনি অন্তরের দারুণ কাতরতাই জ্ঞাপন করছিল। বালিকার প্রতি আমার অন্তরের সহানুভূতি আমাকে জানিয়ে দিল, যে বিড়ালটিকে যদি ঐখানে ঐ অবস্থাতে রেখেই আজ বাড়ীতে ফিরি, সারা রাত তার বেদনা-বিদ্ধ হৃদয় অশ্রু হয়েই ঝরবে। বালিকার ঐ অশ্রু নিবারণ করবার আগ্রহ বালকের স্বাভাবিক ভীরুতার অন্তরে একট দুঃসাহস জাগিয়ে তুললে।

নদীর এক ঘাটে ছোট একখানি ডিঙ্গি-নৌকো বাঁধা ছিল, আমরা দু'জনেই গিয়ে ঐ নৌকোতে উঠলুম। নদীর গভীরতা তেমন ছিল না, কষ্টে শ্রেষ্টে নৌকা আমি পাড়ে নিলুম; কিন্তু নৌকাখানি সিধে ভাবে না গিয়ে এদিক ওদিক করতে করতে, স্রোতের টানে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়ল। সেখানে একটি জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে রেখে, দুজনেই পাড়ের উপর এসে দাঁড়ালুম; টুলু আবার ডাকল, আয় আয় পুষি আয়, আয় আয় পুষি আয়'। পুষি এবার বালিকার গলার আওয়াজ পেয়েই, দৌড়ে তার সামনে এসে উপস্থিত হল।

যখন ওপারে আমার নৌকাখানি ভিড়েছিল তখনই সন্ধ্যা; এবার ফিরবার কালে যখন আমরা নদীর বুকে, তখন সাদা মেঘের টুকরোর মতই দিবাভাগের নিষ্প্রভ চাঁদ, জগৎ-মায়ের কপালে একটি রজতের টিপ হয়ে জ্বলে উঠেছিল। প্রকৃতি তার অঙ্গের ধূম্র-ধূসর বসনখানি উন্মোচন করেছিল, তার দেহ থেকে আলোর উৎস ছুটে

ছিল। আর নদীটির যেদিক পানে গতি তার বিপরীত দিকে, দিগন্তের তরুশ্রেণীর মাথার উপরে,—নিবিড় একখানি মেঘ, একটি বিরাট বিহগের মতই পক্ষ বিস্তার করেছিল। আকাশ যেন উতলা হয়ে এদিক ওদিকে ছুটেছিল; তার ত্রস্ত-পদক্ষেপে নদীর বুক থেকে থেকে বিষম চাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল। টুলু,—নৌকোর আগ-গোলুয়ের দিকে একটি জায়গায় বিড়ালটিকে কোলে করে বসে, নদীর দিকে একবার ঝুঁকে পড়ে দেখছিল যে যাদুকরের হাতের একটি রজত-মুদ্রার মত নদীর গর্ভে আকাশের একটি চাঁদ থেকে থেকে দশটি হচ্ছে, কখন বা একটি মশালের মত জ্বলে উঠছে, আবার এক একবার নদীর বক্ষে—চন্দ্রমা যেন সোনার একখানি মাদুর হয়ে বিছিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ীর পুকুরঘাটে মা আমাকে অল্প বয়সেই সাঁতার শিখিয়ে-ছিলেন, কিন্তু আমার বড় বেশি ভয়-ভাবনা হতে লাগল টুলুর জন্যে। টুলুকে আমি বার বার সাবধান করলুম; কিন্তু বালিকার অন্তরের সাবধানতা সেদিন কি ছিল? হারিয়ে-যাওয়া যে অমূল্য নিধি, তার স্নেহানুরক্ত একটি বালকের প্রয়াস তাকে মিলিয়ে দিয়েছিল, বালিকা তার ঐ ফিরে-পাওয়া ধন বুকে ধরে, রাক্ষস-পুরীর যে রাজ-কন্যা রাক্ষসদের সহবাসে অতি দুঃখে যার দিন অতিবাহিত করেছে, তারই মত প্রণয়-পাশে বদ্ধ একটি রাজপুত্রেরই যেন অনু-সঙ্গিনী হয়ে, স্রোতে তার ডিঙ্গা ভাসিয়েছিল। রূপকথার কৌটো-টির মতই যেন একটি কৌটো—ঐ একটি অনাথা বালিকার অন্তরে, এতকাল তার দুঃখ বিড়ম্বনার পাথর-চাপা হয়ে পড়েছিল, সে দিন ক্ষণকালের অবকাশে তার ঐ কৌটোর ডালাখানি যেন সরেছিল।

বালিকার প্রাণে আনন্দের হাট বসেছিল। নৃত্য-শীলা পরীদের সুস্বর-সম্বলিত উল্লাস-সঙ্গীতে তার হৃদয়ের দিক-দিগন্ত যেন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। নদীর এ-পারে ও-পারে যে আলো, প্রিয়জনের সহস্র চুম্বন-বর্ষণের মত অজস্র ধারায় এসে গাছের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় পড়েছিল, ঐ আলোকের মদে সেদিন টুলু তার অন্তরের শূন্য পেয়ালাটি ভর্ত্তি করেছিল। যে বাতাস দশাগ্রস্ত ভক্তের মত, নদীর তীরে, ধানের ক্ষেতের সোণার প্রাঙ্গনে আনন্দে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, সেই হাওয়াতে বালিকার চিত্ত যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছিল। তাকে কত আমি সতর্ক করলুম, তবু তার অস্থিরতা কিছুতে গেল না; এক একবার জলের দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে, বালিকা উল্লসিত চিত্তে নদীর বুকে চাঁদের খেলা দেখতে লাগল। একটা হাওয়ার বেগ একবার উদ্দাম হয়ে এসে, আমার নৌকোখানিকে জোরে ধাক্কা দিয়ে জেলেদের একটা বাঁশের সঙ্গে লাগিয়ে দিলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লগি ঠেলছিলুম, সে ধাক্কাটা সামলে উঠতে না পেরে জলের ভিতর ডিগবাজি খেয়ে পড়লুম। তারপর আবার যখন আমি জেগে উঠলুম; দেখি যে হাওয়ার প্রবল বেগ আমার নৌকোখানিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, আর অন্য একখানি নৌকো বেয়ে কারা যেন আমার দিকেই আসছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্ক ও ত্রাসে আড়ষ্ট হয়ে আসছিল; জেলেদের বাঁশটি নিকটে পেয়ে, সেইটে ধরে আমি নেয়েদের ডাকাডাকি করতে লাগলুম।

টুলুর বিড়ালটাকে পার করে' নেবার উদ্দেশ্যে ছোট্ট একখানি ডিঙ্গিতে উঠে, আমি টুলুকে সঙ্গে করে ও-পারে গিয়েছি, মায়ের কানে কি করে যেন এ-সংবাদ পৌঁচেছে। মা বড়ই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে

দু'জন লোক আমার খোঁজে পাঠিয়েছেন। তারাই একখানি নৌকো-বেয়ে আমার দিকে আসছিল। যখন কাছে এসে তারা আমাকে তাদের নৌকোতে তুললে, তখন দেখলুম আমার ডিঙ্গিখানি খানিকটা দূরে গিয়ে, পাড়ের উপ্‌ড়ে-পড়া একটা গাছের সঙ্গে বেধে রয়েছে। টুলু সে নৌকোতে নেই। বালিকার কোলে তার আদরের যে বিড়ালটি ছিল, সাঁতার দিয়ে সেটি তীরে উঠেছে ও সেখানে এক জায়গায় বসে মিউ মিউ করে' ডাকছে। অবোধ জন্তু জানেনা যে, সে যার প্রতীক্ষায় আছে সে আর কখনো আসবে না, তার ভালবাসার ধনকে বাঁচাতে গিয়ে সে আজ নিজে প্রাণ হারিয়েছে।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।